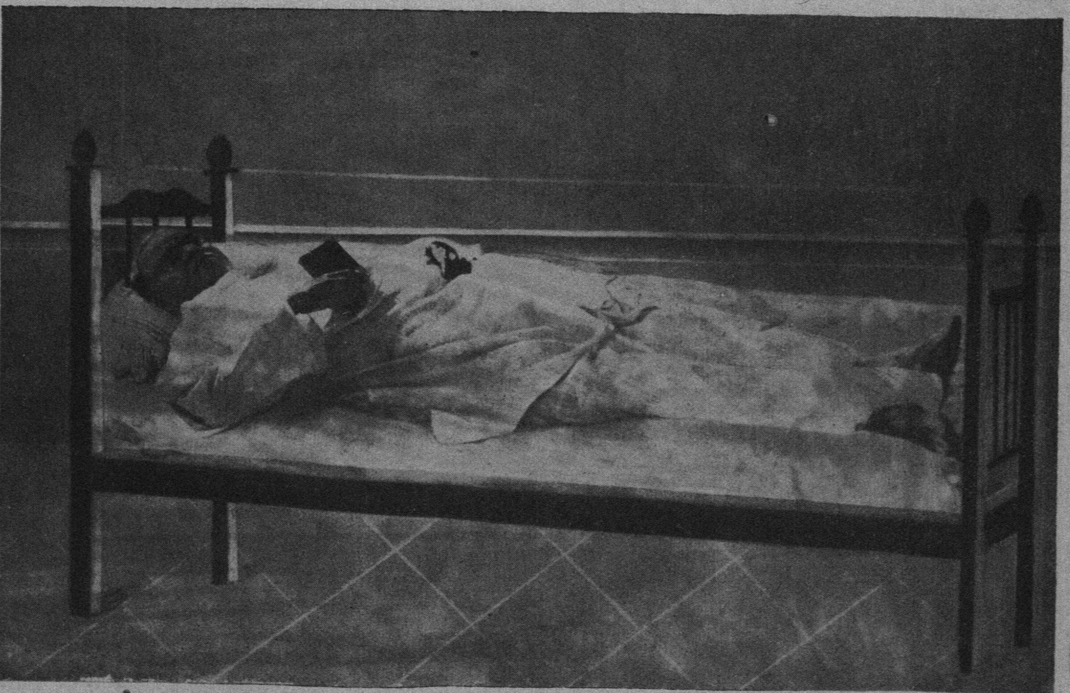
প্রকাশক :
দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ জন্মশতবর্ষপূর্তি
স্মারক গ্রন্থ কমিটির পক্ষে
শ্রীবসন্তকুমার দাস
৩২।২০, চণ্ডী ঘোষ রোড,
কলিকাতা-৪০

প্রথম প্রকাশ :
আশ্বিন, ১৩৬৬

মুদ্রক :
শ্রীনিশিকান্ত হাটই
তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৬, বিধান সরণি
কলিকাতা-৬



অন্তিম শয়নে বীরেন্দ্রনাথ



কেওড়াতলা মহাশ্মশানে চিতার উপর উর্দ্ধশিরে স্থাপিত
বীরেন্দ্রনাথের মরদেহ

সূচীপত্র

দেহের বলে জাতি বড় হয় না। জাতি বড় হয় জ্ঞানের বলে, হৃদয়ের মহত্ত্বে, প্রাণের অদম্য অপরাজেয় শক্তিতে। বাহুবল নয়, মনুষ্যত্ব হারিয়ে এ-দেশ অধঃপতিত হয়েছে।

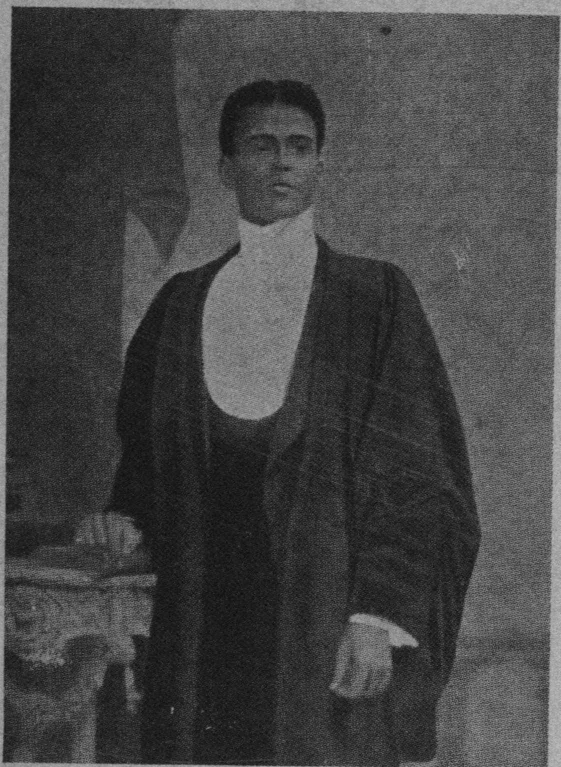
—দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ

রাজা রামমোহন রায়ের মধ্যে যে স্বাধীন ও বিপ্লবী চিন্তার সূত্রপাত তাহা পূর্ণমাত্রায় বলিষ্ঠ রূপে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবে প্রকট, পরে উহার বেগবান প্রকাশ স্বামী বিবেকানন্দে, তৎপরে মায়াবী মানবেন্দ্রনাথ রায়, দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ও মহামনীষী বিনয়কুমার সরকারের মধ্যে। আরও পরে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জীবনে।

শ্রীপ্রমথনাথ পাল


বীরেন্দ্র জননী ৺আনন্দময়ী দেবী


কলেজের ছাত্র বীরেন্দ্রনাথ



বিলাতে ব্যারিষ্টার বীরেন্দ্রনাথ



বিলাত প্রত্যাগত ব্যারিষ্টার বীরেন্দ্রনাথ

স্রোতের তৃণ

ডক্টর রমা চৌধুরী, এম. এ., পি-এইচ. ডি. (অক্সফোর্ড)
প্রাক্তন উপাচার্য্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যখন কলিকাতায় জাতীয় কংগ্রেস বা ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসমিতির অধিবেশন বসে, তখন সেই উপলক্ষে সমগ্র দেশের সর্বত্র ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয় উদার উদাত্ত সুরে কংগ্রেসের সেই মহাহ্বান—ত্যাগ করুন; দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করুন; নিজের পেশা ও নেশা ত্যাগ করে উন্মুক্ত রাজপথে এসে দাঁড়ান সকলের পার্শ্বে; আইনব্যবসায়ীগণ, ব্যবসায় ত্যাগ করুন; ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচিত হতে যাঁরা ইচ্ছুক, তাঁরাও সেই কামনাকে দমন করুন ইত্যাদি।

এই পরম আহ্বান, জানি না, কোন মঙ্গলময়ের বিধানে সোজা গিয়ে আঘাত করল মহাধনী সুবিখ্যাত আইনবিদ্ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের মনে; এক নিমেষেই বেজে উঠল তাঁর সমস্ত হৃদয়তন্ত্রী, তাঁর মনোবীণার সমস্ত তার সুমধুর সুর-তান-লয়-মূর্ছনায়। এল তাঁর নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন নির্মেঘ জীবনে এক নূতন সমস্যা—"শ্যাম রাখি, কি, কুল রাখি"। এক দিকে অত্যন্ত সম্মানজনক অত্যন্ত অর্থোপার্জক অত্যন্ত উচ্চস্তরস্থিত আইন ব্যবসায় এবং তার ফলে, সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, বিলাস-ব্যসন আরাম-আদর, নিশ্চিন্ত-নির্বিঘ্ন ধনী সুখী সমাদৃত জীবন—অন্যদিকে দুঃখ-দারিদ্র্য, দুর্দশা-দুর্গতি রাজরোষ-কারাবাস, এমন কি, প্রাণসংশয় পর্যন্ত। এই মহাযুগসন্ধিক্ষণে বীরেন্দ্রনাথ পড়লেন এই মহামুস্কিলে যে, অতি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তাঁকে গ্রহণ করতে হবে এই মুহূর্তেই, তার জন্য কার নিকট তিনি যাবেন পরামর্শ করতে—কার উপদেশ তিনি করবেন গ্রহণ, কার নির্দেশ শিরোধার্য? উত্তরে শুনুন তাঁর নিজেরই কথা:

"অন্য কেউ হলে হয়ত এ সময়ে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-কুটুম্বের নিকট উপদেশের জন্য ছুটে যেত। কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই আমি এ্যা যে কার্যে বিজড়িত, অর্থাৎ যে কাজের দ্বারা আমার একার ক্ষতি-বৃদ্ধি সুনাম-দুর্নামের সম্ভাবনা আছে সে কাজের জন্য বড় একটা কাহারো উপদেশ আমি কখনো লই নাই। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, সকলের অসম্মতিতে আমার বিলাত যাওয়া, আমার মেদিনীপুরের ভাল ব্যবসায় পরিত্যাগ করে আমার হঠাৎ কলকাতায় আসা ইত্যাদি। আমার জীবনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ে আমিই আমার জীবনের একমাত্র উপদেষ্টা ছিলাম। আজ আমি আমার সেই বহু পুরাতন কিন্তু নিতান্ত আপনার উপদেষ্টাকেই এই নূতন কথা নূতন করে জিজ্ঞাসা করলাম—পারব কি?"—(বীরেন্দ্রনাথ শাসমল প্রণীত "স্রোতের তৃণ", পৃঃ ৩)

অসীম সাহসী পুরুষ অপূর্ব শৌর্যবীর্যপ্রদীপ্ত পুরুষ অনন্তশক্তি কঠিন পুরুষ বীরেন্দ্রনাথের অপরূপ অভিনব অত্যাশ্চর্য জীবনদর্শনের এই ত আমরা অতি সুন্দর আভাস পেলাম—তাঁর এই আত্মবিশ্বাস, আত্মশক্তি, আত্মনির্ভরশীলতার মাধ্যমেই।

এইভাবে তিনি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করে নিজেই নিজেকে কি উত্তর দিলেন? পুনরায় শুনুন, সেই অতুলতেজ প্রতুলপ্রতাপ বিপুল-বিক্রমমণি বীরেন্দ্রনাথের অমৃতবাণী:

"ভালমন্দ জানিনে। হয়ত ভালমন্দ বিচার করবার এখনো সময় হয়নি—তবে আমার উপদেষ্টা আমাকে পূর্বের মতই স্পষ্ট স্বরে জবাব দিয়েছিলেন। তাতে এতটুকু দ্বিধা বা সন্দেহ ছিল না। এতটুকু ভীতি বা আশঙ্কা পরিলক্ষিত হয়নি। তিনি জলদগম্ভীর স্বরে বলেছিলেন:"—(ঐ, পৃঃ ৩)

পড়ে আমরাও হলাম বিশেষ মুগ্ধ ও উদ্বুদ্ধ—যেমন শক্তি, যেমন দৃঢ়তা, যেমন নির্ভীকতা প্রশ্নকর্তা "আমি"র, ঠিক তেমনিই শক্তি, দৃঢ়তা, নির্ভীকতা, উদারতা সেই "আমি"র। প্রথম "আমি"র পূর্ণ

বিশ্বাস আছে দ্বিতীয় "আমি"র প্রতি—আমার নিজেরই পূর্ণ বিশ্বাস আছে আমার নিজেরই প্রতি—আর কি চাই ?

মনে পড়ল সেই সঙ্গে, আত্মশক্তিতে চিরবিশ্বাসী স্বামী বিবেকানন্দের উদাত্ত ঘোষণা :

"We can see that all the difference between man and man is owing to the existence and non-existence of faith in himself. Faith in ourselves will do everything. I have experienced it in my own life, and am still doing so and as I grow older, that faith is becomi.ig stronger. He is an atheist who does not believe in himself. The old religions said that he was an atheiet who did not believe in God. The new religion says that he is an atheist who does not believe in himself.—(Works of Swami Vibekananda. Vol. II. p. 301)

অর্থাৎ, "আমরা দেখতে পাই যে, মানুষে মানুষে ভেদের কারণ হ'ল আত্মবিশ্বাস অথবা তার অভাব। আত্মবিশ্বাস সব কিছুই করবে। আমার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতাই হ'ল এই,—অতীতেও এবং বর্তমানেও—এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, আমার এরূপ বিশ্বাস দৃঢ়তরই হচ্ছে। যিনি নিজেকে নিজে বিশ্বাস করেন না, তিনিই হলেন 'নাস্তিক'। প্রাচীন ধর্মানুসারে যিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না, তিনিই হলেন 'নাস্তিক'। কিন্তু নবীন ধর্মানুসারে, যিনি নিজেকে বিশ্বাস করেন না, তিনিই হলেন 'নাস্তিক'।—(ঐ)

তারপরে, এইভাবে সাহস ভরে, নিজের আত্মাকে জিজ্ঞাসা করে, সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাসী বীর বীরেন্দ্রনাথ কি উত্তর পেলেন ? শুনুন সে-কথা, তাঁরই অনবদ্য ভাষায় :

"তুমি কে ? তোমার করবার বা না করবার, পারবার আর না পারবার আছে কি ? দেখছ না, তুমি যে "স্রোতের তৃণ"।

তোমার না বলবার উপায় নেই, ভালমন্দ বিবেচনা করবার ক্ষমতা নেই। তোমাকে চিরদিনই স্রোতের সঙ্গে ভেসে চলতে হয়েছে ও ভেসে চলতে হবে। তুমি কখনো হেলবে, কখনো দুলবে, কখনো ডুববে, কখনো ভাসবে। তুমি আজ কোনো নদীতীরবর্তী দেবালয়ে দেবতার পদতলে শোভাবর্দ্ধন করতে পার। কিন্তু কাল তোমাকে হয়ত আবার সমুদ্রতীরবর্তী শ্মশানে কোনো মৃতের পদতলে লুটিয়ে পড়তে হবে। তোমার চন্দন-বিষ্ঠা, স্বর্গ-মর্ত্য, শুভ-অশুভ কোনো কিছু বিচার করবার অধিকার নেই। তোমার উর্ধ্বে স্রোত, নিম্নে স্রোত, তোমার বামে স্রোত, দক্ষিণে স্রোত। তুমি এক বিরাট বিশ্বব্যাপী স্রোতোরাশির মধ্যে ক্ষুদ্র নিতান্ত অগণ্য তৃণখণ্ড মাত্র। তুমি সে স্রোতোরাশির গতিরোধ করতে পারবে কেন? এ জগতে কেহ কখনো পারেনি—কেহ কখনো পারবেও না।"—("স্রোতের তৃণ", পৃঃ ৩)

কি অপূর্ব সুন্দর এই বর্ণনা। কিন্তু আমরা ত পড়লাম মহা মুস্কিলে। কারণ যে প্রচণ্ড প্রখর আত্মবিশ্বাস নিয়ে প্রচণ্ড প্রখর সাহসী বীর বীরেন্দ্রনাথ আরম্ভ করেছিলেন, তার এই কি পরিণতি—একটী "ক্ষুদ্র নিতান্ত নগণ্য তৃণখণ্ড মাত্র" হওয়া, যা' কেবল স্রোতের বেগে অসহায়ের মত "হেলবে দুলবে ডুববে, ভাসবেই" মাত্র সেই "বিরাট বহু বিশ্বব্যাপী স্রোতোরাশির মধ্যে?" আমরা ত বরং তাঁর নিকট থেকে এর বিপরীত ব্যাপারই আশা করেছিলাম। অর্থাৎ, সংসারের স্রোতের মুখে অসহায় ভাবে তৃণের মত ভেসে না গিয়ে তিনি সেই স্রোতকে রোধ করে, জয় করে, সর্বজয়ী হবেন। তাহলে, তাঁর এই আত্মবাণীর প্রকৃত অর্থ কি? একদিকে তিনি অদম্য সাহসী বীরপুরুষ—কাউকেও তোয়াক্কা না করে কেবল নিজের মতানুসারেই চলেন নির্ভয়ে সর্বদা, অন্যদিকে কিন্তু তিনি অত্যন্ত দুর্বল জনের মতই সংসারের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন নিতান্ত নিরুপায় হয়েই—এই দুটী ব্যাপার কি তাঁর স্ববিরোধদোষদুষ্ট নয়?

হঠাৎ ত তাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু না, এরূপ তেজস্বী পুরুষের মধ্যে এরূপ স্ববিরোধদোষ থাকবে কিরূপে? তাহলে তাঁর উপরে উদ্ধৃত "স্রোতের মুখে তৃণ" বিষয়টীকে আরেকবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, তার অন্তর্নিহিত প্রকৃত অর্থ বের করা অত্যাবশ্যক।

বিশেষ করে, উপরে উদ্ধৃত অত্যাশ্চর্য অভিনব অপরূপ অংশটীর শেষে, তিনি তাঁর আত্মবাণী বা আত্মনির্দেশরূপে যা বলেছেন—তাও এই প্রসঙ্গে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য :

"বস্তুতঃ, স্রোতের টানে যেমন তোমার প্রাণ, স্রোতের গতিতে যেমন তোমার শক্তি, তেমনি স্রোতের বর্তমানতায় জগৎ বর্তমান, স্রোতের অভাবে জগতের অভাব। দিব্যচক্ষে চেয়ে দেখ, দেখতে পাবে, স্রোতেই তোমার সৃষ্টি হয়েছে, স্রোতেই তোমার লয় হবে; স্রোতই তোমার স্বর্গের দেবতা এবং স্রোতই তোমার মর্ত্যের সংসার। এই শিবসুন্দর অনন্ত স্রোতোরাশির মধ্যে আকণ্ঠনিমজ্জিত হয়ে অবগাহন কর—তোমার প্রত্যেক অণুপরমাণুর ভিতর স্রোতোরাশির অপূর্ব মহিমা ফুটে উঠুক। তখন কর্ম ও ধর্মের মাদকতায়—প্রেম ও ত্যাগের অমৃতপানে তুমি উন্মত্ত হয়ে উঠবে।"—("স্রোতের তৃণ", পৃঃ ৪)

তাহলে, বলতে হবে যে, বীরেন্দ্রনাথের মতে, সংসারস্রোত এমনিই একটী প্রচণ্ড শক্তিশালী বস্তু যে, তাকে অবহেলা করা কোনো কাজের কথাই নয়, বুদ্ধিমানের মত কাজই নয় একেবারেই, বরং তাকে আমাদের মেনে নিতেই হবে—মেনে নিতেই হবে যে, সেই প্রবল জলোচ্ছ্বাসে আমাদের ভেসে বেড়াতেই হবে, তাকে বাদ দিয়ে ত আমাদের জীবন নয়, জীবন চলতে পারে না কোনোক্রমেই। সেজন্য সেই সংসারের স্রোতের বেগে ভাসতে-ভাসতে আমরা আমাদের কর্মানুসারে "দেবালয়ে" অথবা "শ্মশানে" উপনীত হতে পারি, লাভ করতে পারি "স্বর্গের দেবতা" অথবা "মর্ত্যের সংসার", ধন্যাতিধন্য হতে পারি "কর্ম ও ধর্মের মাদকতায়", "প্রেম ও ত্যাগের অমৃতপানে।"

সেজন্য আপাতদৃষ্টিতে যাই মনে হোক না কেন, বীরেন্দ্রনাথ ছিলেন সুদৃঢ় কর্মবাদী, দুর্বল অদৃষ্টবাদী নন। দুর্দান্ত সংসার-স্রোতকে স্বীকার করে নিয়েও, আমরা ঐ কথা অনায়াসেই বলতে পারি যে, তাঁর মতে তার মধ্যেও, আমাদের স্বীয় কর্মেরও স্থান আছে এবং সেই সংসারস্রোতের মুখে ভাসতে-ভাসতেও আমরা যে বিভিন্ন স্থানে উপনীত হচ্ছি—"আজ দেবালয়ে দেবতার পদতলে" "কাল সমুদ্রতীরবর্তী শ্মশানে কোনো মৃতের পদতলে"—তাও ত নিশ্চয় আমাদের কর্মেরই ফল। এর প্রমাণ হচ্ছে নিম্নোদ্ধৃত তাঁর আরেকটী স্বীকারোক্তি :

"সর্বদাই মনে হচ্ছিল, তবে কি আমিও আমার দায়িত্ব অনুভব করে এক্ষেত্রে কার্য করি নাই—আমারও কি সব কেবল কথার কথা ? যখনই এই ভাব মনে উদয় হত, তখনই দেখতাম বনমাঝে আমার সেই চির-পুরাতন অথচ চির-নবীন উপদেষ্টা অসংখ্য অনন্ত চক্ষু বিস্তার করে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন এবং ইঙ্গিত করে বলছেন—তরী ভাসিয়ে দিয়ে কূলের দিকে তাকালে কি হবে ? যদি সময় থাকতে খেয়াঘাটের ঘাটমাঝির কাছে পৌছতে চাও, তবে এখন থেকে পথের পাথেয় সঞ্চয় কর।"—("স্রোতের তৃণ", পৃঃ ৫)

এইখানেই ত আছে স্বতন্ত্র স্বাধীন কর্মের অবকাশ ; এইখানেই ত আছে স্বীয় শৌর্যবীর্যের প্রকাশ ; এইখানেই ত আছে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আত্মনির্ভরশীলতার মহিমময় বিকাশ। বীরেন্দ্রনাথের সুধন্য জীবনে যে অতুল তেজ, প্রতুল প্রতাপ, বিপুল বিক্রমের পরিচয় আমরা পেয়েছি আদ্যোপান্ত, তাদের মূল ত এইখানেই। সেই পুরুষসিংহ দেশপ্রাণকে শতসহস্র কোটী প্রণাম। ওঁ শান্তিঃ ॥

শ্রদ্ধাঞ্জলি

শ্রীশংকরপ্রসাদ মিত্র

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি

দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর উদ্দেশে বহু রাজনৈতিক নেতা ও স্বদেশপ্রেমিক এবং অসংখ্য স্বাধীনতা-সংগ্রামী শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছেন। তাঁদের কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মেলাবার যোগ্যতা আমার নেই, তবুও এই উৎসব উপলক্ষে কয়েকটি স্থানে, এমন কি, তাঁর পৈতৃক বাস্তুভিটাতেও উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য ঘটেছিল। দেশপ্রাণ তাঁর জীবনে একটি মূল আদর্শকে চিরদিন অনুসরণ করে গেছেন। সে আদর্শ হলো যদি তিনি দেশবাসীর সেবায় সতত নিয়োজিত না থাকেন তবে তাঁর জীবিত থাকার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, তিনি স্বদেশবাসীর স্বার্থরক্ষার জন্য জন্মগ্রহণ করেছেন; তাঁর স্বদেশবাসী তাঁকে বিশ্বাস করে এবং তাঁর স্বদেশবাসীদেরই জন্য তিনি আত্মবিসর্জন দেবেন।

অনেকের একটা ধারণা আছে যে, ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের কলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনে প্রথম ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী উত্থাপিত হয় এবং ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের লাহোর অধিবেশনে সেই সংক্রান্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইতিহাসের বিচারে এ-তথ্য সঠিক নয়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় শ্রীঅরবিন্দ সর্বপ্রথম এই দাবী উত্থাপন করেছিলেন এবং গান্ধীজী ১৯২১ খৃষ্টাব্দে যখন প্রথম অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করেন তখন বীরেন্দ্রনাথ শাসমল পরিষ্কার ভাষায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে বলে দেন যে, আমরা ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস চাই না—"ইকোয়াল পার্টনারসিপ"ও চাই না, আমরা চাই ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা।

এই স্বাধীনতা অর্জনকল্পে তিনি মহাত্মা গান্ধীর অনুগামী হন এবং গান্ধীজীর প্রতি তাঁর অখণ্ড শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বার বার ব্যক্ত করেছেন। তিনি চেয়েছিলেন যে, স্বাধীনতা আসুক একটা অহিংস গণবিপ্লবের মাধ্যমে ; যে-বিপ্লবে ভারতের সকল শ্রেণীর মানুষ, বিশেষতঃ শ্রমিক ও কৃষক সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। এই সংগ্রাম যে কিরূপ আকার ধারণ করতে পারে তা বীরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে কাঁথি মহকুমা এবং মেদিনীপুর জেলার অন্যান্য অংশের অধিবাসীগণ একাধিক বার স্বচক্ষে দেখেছেন। তাঁরা এমন সংগ্রাম দেখেছেন, যে-সংগ্রামে ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ হয়ে গেল, সরকারী পুলিশ এসে আসবাবপত্র ও তৈজসপত্রাদি ক্রোক করলো, সেগুলিকে রাস্তায় বার করে নীলামে বিক্রী করার চেষ্টা করলো ; কিন্তু একটি মাত্রও ক্রেতা পাওয়া গেল না। এ এক অভূতপূর্ব সংগ্রাম। সত্য ও অহিংসাভিত্তিক যে গণসত্যাগ্রহের স্বপ্ন গান্ধীজী দেখেছিলেন এবং যে গণসত্যাগ্রহকে আজকের পৃথিবীর অন্যান্য অংশেও অনুসরণ করা হচ্ছে সেই সত্যাগ্রহের বাস্তব রূপায়ণের অভিজ্ঞতা দেশপ্রাণের মাধ্যমে মেদিনীপুরবাসী লাভ করে ধন্য ও স্তম্ভিত হয়েছিলেন। দেশপ্রাণ শুধু ভারতের রাজনৈতিক মুক্তির জন্য এই সত্যাগ্রহের কথা ভাবেননি, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ার পরেও সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য তিনি একই প্রকারের গণবিপ্লবের কথা চিন্তা করেছিলেন।

আইন ব্যবসায়ে বীরেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব ও সাফল্য সুবিদিত। বহু রাজনৈতিক বন্দীর সপক্ষে তিনি কোন প্রকারের অর্থ না নিয়ে বিভিন্ন আদালতে অসংখ্য বার হাজির হয়েছেন। কোন মামলা হাতে নিলে তাতে অর্থ উপার্জিত হচ্ছে কিনা সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করতেন না। পরম নিষ্ঠার সঙ্গে আইনজীবীর কর্তব্য তিনি সম্পাদন করেছেন ; সুতরাং বিচার বিভাগেও তাঁর অবদানের কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করা উচিত।

বীরেন্দ্রনাথ একজন নির্ভীক রাজনীতিবিদ ছিলেন। তাঁর বিবেক এবং বিচারবুদ্ধি তাঁকে যখন যেদিকে পরিচালিত করেছে সেইদিকেই তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে অগ্রসর হয়েছেন। কমিউন্যাল য়্যাওয়ার্ড বা সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদকে তিনি মেনে নিতে পারেননি। কংগ্রেসের "নাইদার য়্যাক্সেপ্ট নর রিজেক্ট" প্রস্তাবের তিনি বিরোধী ছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি গান্ধীজীর সঙ্গেও একমত হতে পারেননি। সে-কারণে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের নেতৃত্বে গঠিত কংগ্রেস ন্যাশন্যালিস্ট পার্টিতে তিনি যোগ দেন এবং এই দলের প্রার্থী হিসাবে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তিনি কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নির্বাচনে বিপুল ভোটে তিনি জয়লাভও করেছিলেন।

তাঁর অকাল এবং আকস্মিক মৃত্যু এই দেশের উপরে একটা মারাত্মক বজ্রাঘাত, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিনি জীবিত থাকলে দেশবিভাগে প্রাণপণে বিরোধিতা করতেন এবং তার ফলাফল কি হ'ত তা বলা সম্ভব নয়।

বীরেন্দ্রনাথ জীবনে কখনও কোনদিন কারো কাছে মস্তক অবনত করেন নাই এবং তিনি নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন, যেন তার মৃতদেহকেও উন্নতমস্তক অবস্থায় দাহ করা হয়। তাঁর অনুগামীগণ তাঁর মৃত্যুর পর সেই নির্দেশ পালনও করেছিলেন।

বীরেন্দ্রনাথের পৈত্রিক বাস্তুভিটা এখন ভগ্নাবস্থায়। তাঁর গ্রামে তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে এই বাস্তুভিটার পুনরুদ্ধার ও পুনর্নির্মাণ একান্ত প্রয়োজন। তা ছাড়া তাঁর স্মৃতিকে বিশেষ করে বাঙালীর হৃদয়ে চিরদিন জাগ্রত রাখার উদ্দেশ্যে বিবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। এ বিষয়ে সকল দেশপ্রেমিক এগিয়ে এসে সাহায্য করবেন এই আশা প্রকাশ করে তাঁর উদ্দেশে অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি।

স্বাধীনতা আন্দোলনে মেদিনীপুর ও দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ

বিনয়জীবন ঘোষ

মেদিনীপুর কলেজের ইতিহাসের প্রাক্তন অধ্যাপক ও কলিকাতা
করপোরেশনের প্রাক্তন কর্মসচিব

প্রথমেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বা আন্দোলনের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু বিশ্লেষণের প্রয়োজন। তুলনাত্মক বিচারের দ্বারাই এই বিশ্লেষণ সম্ভব।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার শাসক ইংরেজের সেনাবাহিনীকে সমরাঙ্গনে পর্যুদস্ত ও পরাজিত করে তার স্বাধীনতা অর্জন করে। আমেরিকার নজীর ভারতের বেলায় আদৌ প্রযোজ্য নয়।

আয়ারল্যাণ্ডের রোমান ক্যাথলিকরা কয়েক শতাব্দী ধরে বিচ্ছিন্ন সশস্ত্র আঘাত হেনে শাসক ইংরেজ শক্তির উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করে। এরই ফলস্বরূপ ইংরেজ অবশেষে বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে এক সন্ধিপত্রের মাধ্যমে আইরিশদের স্বাধিকার স্বীকার করে নেয়।

আয়ারল্যাণ্ড ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের গতি-প্রকৃতিতে কিছুটা মিল আছে। বহু-বিতর্কিত ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের অভ্যুত্থানকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম রূপে যদি গণ্য নাও করা হয়, তা' হ'লেও বর্তমান শতকের আরম্ভ থেকে প্রায় অর্ধশতাব্দী ভারতবাসী নানা প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, আন্দোলন ও সশস্ত্র আঘাতের মধ্য দিয়ে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উপর ক্রমান্বয়ে ক্রমবর্ধমান চাপ সৃষ্টি করে চলে। অবশেষে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের আগষ্টে গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস হুঙ্কার ছাড়ে—"ইংরেজ! ভারত ছাড়"। সেই রণহুঙ্কার ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হ'ল সারা ভারত জুড়ে বিরাট ব্রিটীশবিরোধী গণ-আন্দোলনের ভিতর দিয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের

অবসানে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ভারতকে দ্বিধা বিভক্ত করে শাসনভার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগকে হস্তান্তরের পর ভারত ত্যাগ করে। ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি ও আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধিকারলাভ দুই-ই ইংরেজের সহিত আপোষ-রফার ফলশ্রুতি।

আয়ারল্যাণ্ড ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য থাকলেও এই দুই-এর স্বরূপে প্রভেদ গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে দুটি পৃথক অথচ সমান্তরাল ধারা দৃষ্ট হয়—একটি সশস্ত্র বৈপ্লবিক কর্মধারা, অপরটি অহিংস সত্যাগ্রহী গণসংগ্রাম। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি এই দুই প্রচেষ্টার যৌথ ফল। ইহাই ঐতিহাসিক সত্য। কোনও কোনও রাজনৈতিক সাথী ও সহকর্মীকে বলতে শুনেছি "ভারতের স্বাধীনতা লাভ ঘটেছে গান্ধীজী-পরিচালিত অহিংস সংগ্রামের দ্বারাই, সশস্ত্র বিপ্লবীরা এই স্বাধীনতা আন্দোলনে শুধু বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে।" ইতিহাসকে মুছে না ফেললে, এরূপ ভ্রান্ত ও একদেশদর্শী অভিমত পোষণ সম্ভব নয়।

গান্ধীজীর অহিংস সত্যাগ্রহী সংগ্রামের আরম্ভ ১৯২১ খৃষ্টাব্দে। এখন প্রশ্ন করা যেতে পারে ১৯২১ খৃষ্টাব্দের পূর্বে ভারতবর্ষে কি স্বাধীনতা আন্দোলন বলে কিছুই ছিল না। ইতিহাস বলে—নিশ্চিতই ছিল এবং ভারতের কয়েকটি প্রদেশে এই আন্দোলন খুব জোরদার হয়ে উঠেছিল। মহারাষ্ট্রে লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক ও শিবরাম মহাদেব পরাঞ্জপে, বীর বিনায়ক দামোদর সাভারকার, তাঁর ভ্রাতা গণেশ দামোদর সাভারকার প্রভৃতি নেতার নেতৃত্বে ব্রিটীশবিরোধী আন্দোলন ব্যাপক ও প্রবল আকার ধারণ করে। লোকমান্য তিলকের নির্ভীক বাণী ছিল—Swaraj is my birthright, and I will have it—স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার এবং তা আমি আদায় করবই। তাঁর ভাষণ ও রচনায় তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়েছিলেন যে, তাঁর এই জন্মগত অধিকার তিনি যে-কোনও উপায়ে প্রতিষ্ঠিত করবেন। পাঞ্জাবেও লালা লজপত রায়, হরদয়াল প্রভৃতি নির্ভীকচেতা

নেতাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে খুব জোরালো স্বাধীনতা-আন্দোলন গড়ে উঠে। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বাংলায় রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র পাল ও অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বে প্রচণ্ড স্বাধীনতা-আন্দোলন ব্রিটীশ শাসকদের দম্ভ চূর্ণ করে জনগণের দাবী জয়যুক্ত করে।

ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে উল্লিখিত দুই ধারা—বিপ্লবীদের সশস্ত্র আঘাত ও জনগণের অহিংস প্রতিরোধ দেখা যায়। বাংলার স্বদেশী আন্দোলন ও গান্ধীজীপ্রবর্তিত ১৯২১ খৃষ্টাব্দের অসহযোগ আন্দোলন প্রায় একই প্রকারের। স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান কর্মসূচী ছিল বিলাতী পণ্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার। গান্ধীজী তাঁর ১৯২১ খৃষ্টাব্দের অসহযোগ আন্দোলনে বিদেশী বস্ত্র বর্জনের সঙ্গে সরকারী বিদ্যালয়, আদালত ও আইনসভা বর্জনের ডাক দেন।

গান্ধীজীর জীবনী পর্যালোচনা করলেও আমরা দেখি যে, ১৯২১ খৃষ্টাব্দের পূর্বেও ভারতবর্ষে শক্তিশালী স্বাধীনতা আন্দোলনের অস্তিত্ব ছিল। মনে রাখতে হবে, দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজী বর্ণ বৈষম্য বা বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন—সাম্রাজ্যবাদের বিপক্ষে নয়। বুয়র-যুদ্ধের সময় তিনি ইংরেজের পক্ষেই সেবাব্রত নিয়েছিলেন এবং ইংরেজের প্রশংসা পেয়েছিলেন। কী এমন ঘটল যাতে ইংরেজ-ভক্ত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ইংরেজ শাসনের কঠোরতম সমালোচক এবং ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদের চরম বৈরী মহাত্মা গান্ধীতে পরিণত হলেন। সেই ঘটনাগুলি হল—ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের শায়েস্তা করবার মানসে ব্রিটীশ গভর্ণমেন্ট কর্তৃক রাউলাট আইন পাশ, সেই আইনের বিরুদ্ধে পাঞ্জাবে প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও আন্দোলন এবং সর্বোপরি ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল ইংরেজ জেনারেল ও'ডায়ার কর্তৃক জালিয়ানওয়ালাবাগের নারকীয় হত্যালীলা। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে গান্ধীজী যখন একটি আবেগপূর্ণ ভাষণ দিচ্ছিলেন তখন স্বকর্ণে তাঁর

এই কটি কথা শুনেছিলাম—"Crawling we have buried for ever in a narrow lane at Amritsar." জালিয়ানওয়ালাবাগের রক্তস্রোতই ভারতকে দিয়েছিল তার ভবিষ্যৎ পরিত্রাতা।

ইতিহাসের নিরিখে সশস্ত্র বিপ্লববাদের ধারাই প্রথমে চোখে পড়ে। আরম্ভ মহারাষ্ট্রের পুনে শহরে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুন রাত্রে। তিন ভাই—দামোদর হরি, বালকৃষ্ণ ও বাসুদেব চাপেকার এবং মহাদেব বিনায়ক রাণাড়ে—এই চারজন বীর দেশপ্রেমিকের দ্বারা নিহত হলেন ছ'জন ইংরেজ রাজকর্মচারী—মিঃ র‍্যাণ্ড ও মিঃ আয়ারষ্ট। তারপর থেকে পূর্ণ অর্দ্ধশতক এই ধারা ভারতের নানা স্থানে নানা সময়ে স্বাধীনতা আন্দোলন জাগ্রত রেখেছিল। এই প্রবাহের প্রকাশ ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল সন্ধ্যায় বিহারের মজঃফরপুর শহরে দুই বাঙালী যুবক—ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র চাকী (আসল নাম দীনেশ চন্দ্র রায়) কর্তৃক শক্তিশালী বোমা নিক্ষেপে; প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলার সময়ে রাসবিহারী বসু কর্তৃক সামরিক বিদ্রোহ ঘটানোর ব্যর্থ প্রচেষ্টায়; এবং যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) ও তাঁহার সহকর্মীদের দ্বারা ঐ যুদ্ধের মধ্যেই জার্মান অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের নিষ্ফল প্রয়াসে; ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল রাত্রে অমর শহীদ সূর্য সেনের নেতৃত্বে বীর বিপ্লবী বাঙালী যুবকগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত বাংলার বিপ্লবীদের শ্রেষ্ঠ কীর্তি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে; নেতাজীপরিচালিত আজাদ হিন্দ বাহিনীর গৌরবময় যুদ্ধপ্রচেষ্টায়। এই ধারার শেষ প্রকাশ ১৯৪৬ এর ফেব্রুয়ারীতে ভারতীয় নৌসৈন্যদের বিদ্রোহে।

পরিশেষে, আমায় যদি প্রশ্ন করা হয়—এইরূপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সশস্ত্র আঘাত হেনে কি কোনও কালে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যশক্তিকে বাধ্য করা যেত ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করে নিতে, তাহলে আমি উত্তর দেব—নিশ্চিতই যেত। আইরিশরা যদি এই পথে তাদের স্বাধিকার আদায় করতে পেরে থাকে তাহলে ভারতবাসীরাও নিশ্চিতই পারত। হয়ত ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তিতে আরও কিছু বিলম্ব হত।

অপরপক্ষে কিছু-কিছু সাথী ও সতীর্থকে গান্ধীজী-প্রবর্তিত অহিংস সত্যাগ্রহকে কঠোর ব্যঙ্গবিদ্রূপ করতে ও অহিংস আন্দোলনকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে শুনেছি। এও অতিশয় ভ্রান্ত একদেশদর্শিতা। গান্ধীজীর অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন আসমুদ্রহিমাচল ভারতের আপামর জনসাধারণকে আলোড়িত ও উদ্দীপিত করেছিল। ভারতের জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার সঞ্চার করেছিল, তাদের মধ্যে স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষা প্রজ্জ্বলিত রেখেছিল। তাঁরই ডাকে ভারতের লক্ষ-লক্ষ নরনারী বার বার স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপ দিয়েছে।

স্বাধীনতা আন্দোলনের উল্লিখিত দুই ধারাই বঙ্গদেশে, বিশেষতঃ মেদিনীপুর জেলায় প্রবলরূপে প্রকাশ পায়। অহিংস গণ-আন্দোলনে মেদিনীপুর বার বার বিশাল ভারতভূমিতে শীর্ষস্থান অধিকার করে। মেদিনীপুরের সশস্ত্র বিপ্লবী কর্মকাণ্ডও সারা ভারতের বিস্ময় উৎপাদন ও প্রশস্তি অর্জন করে। বিংশ শতকের সূচনাতেই এই দুই ধারার স্বাধীনতা আন্দোলন মেদিনীপুরে প্রচণ্ডভাবে আরম্ভ হয়ে যায়।

অরবিন্দ ঘোষ ও তাঁর সহকর্মী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিপ্লব প্রচারে বরোদা হতে বাংলায় আগমনের পূর্বেই ঋষি রাজনারায়ণ বসুর দুই ভ্রাতুষ্পুত্র—জ্ঞানেন্দ্রনাথ ও শহীদ সত্যেন্দ্রনাথ এবং অগ্নিযুগের দ্রোণাচার্য হেমচন্দ্র দাস কানুনগো মেদিনীপুর শহরে একটি বিপ্লবী গুপ্তসমিতির পত্তন করেন।

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বাংলায় যে প্রচণ্ড স্বদেশী আন্দোলন গড়ে উঠে তাও মেদিনীপুরে প্রবল ও ব্যাপক রূপ নেয়। বিলাতী বস্ত্র বর্জন ও তৎসঙ্গে দোকানে-দোকানে বিলাতী বস্ত্র বিক্রয় বন্ধের জন্য পিকেটিং, বিরাট সভা ও মিছিলেরও অভাব ছিল না। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর শহরের বেলী হল (Bailey Hall—এক্ষণে ঋষি রাজনারায়ণ পাঠাগার)-এ এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় বিলাতী পণ্য বর্জনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। মেদিনীপুর জেলার পল্লীতে-পল্লীতেও বহু প্রতিবাদ সভা

আহূত হয়। মেদিনীপুরে বঙ্গবিভাগের চূড়ান্ত খবর পৌঁছলে ৪ঠা অক্টোবর (১৯০৫) শহরে প্রায় দুই সহস্র লোক নগ্নপদে এক সভায় এসে তাদের বিলাতী পণ্য বর্জন প্রতিজ্ঞা পুনরায় গ্রহণ করে। স্বদেশী দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য একটি ছাত্রভাণ্ডার এবং স্বদেশী বস্ত্র বয়নের জন্য একটি তাঁতশালাও শহরে খোলা হয়।

শহরের যুবকদের বলশালী ও সাহসী করার উদ্দেশ্যে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে স্বয়ং ভগিনী নিবেদিতা মিঞাবাজার মহল্লায় একটি আখড়ার উদ্বোধন করেন কুস্তি, লাঠিখেলা, অসিচালনা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য। স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ারে শহরের নানা স্থানে আরও আখড়া স্থাপিত হয়—যেমন, পাহাড়ীপুরে "স্বদেশ সমিতি", নবীনাবাগে "বসন্ত মালতী"। এই "বসন্ত মালতী" আখড়ার শিক্ষক ও পরিচালক ছিলেন যোগজীবন ঘোষ। লাঠিখেলা ও অসিচালনায় সে-যুগে তিনি খুব খ্যাতিলাভ করেন। যোগজীবন ঘোষ আমার পিতৃব্য।

৭ই ডিসেম্বর (১৯০৬) শহরে মেদিনীপুর জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন হয়। এই সম্মেলনে নিমন্ত্রিত হয়ে তদানীন্তন বাংলার প্রায় সব বড় নেতাই—যথা, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, অরবিন্দ ঘোষ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রভৃতি মেদিনীপুর আগমন করেন। এইখানেই প্রথম নরমপন্থী ও গরমপন্থীদের মধ্যে তীব্র বিরোধ বাধে। এজন্য সম্মেলন ভেঙে দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। "এই গোলযোগ সুরাটের যজ্ঞভঙ্গেরই পূর্বাভাস। কংসাবতী নদীতীরের দৃশ্য পশ্চাতে তাপ্তী-তীরস্থ সুরাটনগরে প্রবল ও ব্যাপকভাবে পুনরভিনীত হয়।" (হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—"ভারতের বিপ্লব কাহিনী", প্রথম ভাগ)

দেশপ্রাণ শাসমল ঐ বছরেই কলিকাতা হাইকোর্ট ছেড়ে মেদিনীপুর শহরে আইন ব্যবসায়ের জন্য বসবাস আরম্ভ করেন। তিনিও এই সম্মেলনে একজন প্রতিনিধি ও উৎসাহী কর্মীরূপে যোগ দেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ও তিনি জেলার নানা স্থানে সভা ডেকে আন্দোলনের কর্মসূচী প্রচার করেন।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল সন্ধ্যায় বিহারের মজঃফরপুর শহরে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীর নিক্ষিপ্ত বোমায় মিসেস ও মিস কেনেডী নিহত হন। বগুড়া-রংপুরের প্রফুল্ল ও মেদিনীপুরের ক্ষুদিরাম—এই দুই নিঃশঙ্ক বিপ্লবী যুবক প্রেরিত হয়েছিল মজঃফরপুরে সেখানের দায়রা জজ মিঃ কিংসফোর্ডকে হত্যার উদ্দেশ্যে। স্থানীয় একজন ব্যবহারজীবী মিঃ কেনেডীর গাড়ীকে মিঃ কিংসফোর্ডের গাড়ী মনে করায় ঐরূপ মারাত্মক ভুল ঘটে যায়। ১লা মে প্রফুল্ল চাকী পুলিশের দ্বারা গ্রেপ্তার এড়াতে গিয়ে নিজের রিভলভারের গুলিতে আত্মহত্যা করে। ঐদিনই সকালে ক্ষুদিরাম বসু মজঃফরপুর হতে চব্বিশ মাইল দূরে ওয়েনী রেলষ্টেশনে গ্রেপ্তার হয়। মজঃফরপুর আদালতের বিচারে ক্ষুদিরামকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১১ই আগষ্ট প্রত্যূষে মজঃফরপুর জেলে অমর ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়।

ক্ষুদিরামের ফাঁসি সারা ভারতে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। লোকমান্য তিলক তাঁর 'কেশরী' পত্রিকায় দুইটি তেজোদৃপ্ত প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাতে তিনি ক্ষুদিরামের নির্ভীক দেশপ্রেমকে অভিনন্দিত করেন। এজন্য লোকমান্যের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা আনে ব্রিটীশ সরকার। বিচারে তিলকের ছয় বছরের দ্বীপান্তর বাস ও এক হাজার টাকা জরিমানা হয়।

দেশমাতৃকার চরণে ক্ষুদিরামের আত্মবলি বাংলার জনমানসে গভীর রেখাপাত করে। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি যখন মেদিনীপুর শহরের উপর ব্রিটীশ রাজরোষ তুঙ্গে উঠেছিল, তখন একজন অন্ধ ভিক্ষুককে মেদিনীপুর ষ্টেশনেই গাইতে শুনেছি :

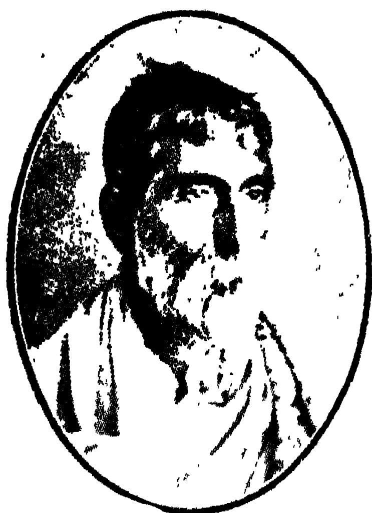
একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি ;
আমি হাসি-হাসি পরবো ফাঁসি,
দেখবে সবে জগৎবাসী।

শহীদ ক্ষুদিরাম মেদিনীপুরের অক্ষয় গরিমা।



পুত্রকন্যাসহ বীরেন্দ্রসহধর্মিনী হেমন্ত কুমারী দেবী

(১৯৩৯ খৃঃ)



আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়



পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য



গান্ধীজী

মজঃফরপুরের ঘটনার পর ২রা মে কলকাতায় এবং ৩রা মে মেদিনাপুর শহর বহু বিপ্লবীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। কলকাতায় মেদিনীপুরের দু'জন—হেমচন্দ্র দাস কানুনগো ও পূর্ণচন্দ্র সেন ধৃত হন। সত্যেন্দ্রনাথ বসু পরে মেদিনীপুর হতে কলকাতায় আনীত হন এবং হেমচন্দ্রের সহিত আলিপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলার আসামীভুক্ত হন।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও চন্দননগরের কানাইলাল দত্ত বিশ্বাসঘাতক রাজসাক্ষী নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে নিহত করেন। বিচারে উভয়েরই প্রাণদণ্ড হয়। শহীদ সত্যেন্দ্রনাথ ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করেন ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ২১শে নভেম্বর। শহীদ সত্যেন্দ্রনাথ মেদিনীপুরের অন্যতম বরণীয় ও স্মরণীয় সুসন্তান।

বাকী রইলেন মজঃফরপুরে নিক্ষিপ্ত বোমার বিশ্বকর্মা, অগ্নিযুগের অস্ত্রগুরু হেমচন্দ্র দাস কানুনগো। বহুখ্যাত আলিপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের দণ্ড হয়। হেমচন্দ্র মেদিনীপুরের গৌরব ও গর্ব।

ব্রিটীশ সরকার ও পুলিশ মেদিনীপুরে আলিপুর বোমা মামলার যমজ মেদিনীপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলা (সম্রাট বনাম যোগজীবন ঘোষ ও অন্যান্য) খাড়া করে। আসামীসংখ্যা ছিল ১৫৪। এদের মধ্যে ছিলেন নাড়াজোলের রাজা নরেন্দ্রলাল খান এবং জেলার আরও ২১ জন বড় জমিদার, মেদিনীপুরের শ্রেষ্ঠ আইনজীবী উপেন্দ্রনাথ মাইতি ও আরও ১৪ জন উকিল, ৬ জন ডাক্তার ও ২০ জন ছাত্র। মোকর্দমার শেষ অঙ্কে মাত্র তিন জন বিপ্লবী তরুণ আসামীর কাঠগড়ায় ছিলেন। মেদিনীপুরের বিচারক তিনজনকেই দণ্ড দিলেন—যোগজীবন ঘোষ ও সন্তোষকুমার দাসকে দশ বছরের দ্বীপান্তর, সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে সাত বছরের দ্বীপান্তর। আপীলে কলিকাতা হাইকোর্ট তিনজনকেই বেকসুর খালাস দেন।

এরপর ১৯২০ খৃষ্টাব্দে—উপরে যে দুই বিপ্লবধারার উল্লেখ করেছি তাদের প্রয়াগ-সঙ্গম। ঐ বছরেই সর্বভারতীয় রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলেন গান্ধীজী। মেদিনীপুরের অসীম সৌভাগ্য যে, সেই মাহেন্দ্রক্ষণে জেলার তথা বঙ্গদেশের রাজনৈতিক কর্ণধাররূপে এগিয়ে এলেন দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল।

পাঞ্জাবকেশরী লালা লজপত রায়ের সভাপতিত্বে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে গান্ধীজী তাঁর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব করেন। দেশপ্রাণ শাসমল এই প্রস্তাব সমর্থন করেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বিরোধিতা করেন। ঐ বছরের শেষে নাগপুরে কংগ্রেসের অধিবেশনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ প্রস্তাব মেনে নেন।

বাংলার আইন ব্যবসায়ীদের মধ্যে বীরেন্দ্রনাথই প্রথম বহু টাকা আয়ের আইন ব্যবসায় ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। বীরেন্দ্রনাথের সুহৃদ ও সহকর্মী মেদিনীপুরের আর এক স্বনামধন্য সুসন্তান জাড়ার বিখ্যাত রায় পরিবারের য়্যাডভোকেট সাতকড়িপতি রায়ও কলিকাতা হাইকোর্ট বর্জন করেন। মেদিনীপুর শহরে সাতকড়িপতির দাদা উকিল কিশোরীপতি রায়, অতুল বসু প্রভৃতি তমলুকের সেরা প্রবীণ সর্বজনমান্য উকিল মহেন্দ্রনাথ মাইতি ও অন্যান্য কয়েকজন উকিল আদালত বর্জন করেন। জেলার বহু শিক্ষক ও মেধাবী ছাত্র সরকারী বিদ্যায়তন হতে বেরিয়ে আসেন। বিদেশী বস্ত্র ও মাদকদ্রব্যের দোকানগুলিতে পিকেটিং চলে। স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও মৌলানা আজাদ সহ মেদিনীপুর শহরে আগমন করেন এবং কলেজ ময়দানে এক জনসমুদ্রের সম্মুখে অহিংস অসহযোগের বাণী প্রচার করেন। মেদিনীপুর জেলায় অসহযোগ আন্দোলন বেশ শক্তিশালী রূপ নেয়।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে এক অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য দেশপ্রাণের নিজের জীবনে ও মেদিনীপুরের ইতিহাসে ১৯২১ খৃষ্টাব্দ

চির-উজ্জ্বল। ঐ বছর বাংলা গবর্নমেণ্ট বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্বশাসন আইন অনুযায়ী মেদিনীপুর জেলায় ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনে উদ্যোগী হন। বীরেন্দ্রনাথের দৃঢ় প্রত্যয় ইউনিয়ন বোর্ডের দ্বারা দেশের কোনও উপকার হতে পারে না। বরং দীন-দরিদ্র ব্যক্তির নানা উপদ্রব সৃষ্টি হতে পারে। নিজের একক দায়িত্ব ও নেতৃত্বে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে দেশপ্রাণ কাঁথি মহকুমায় ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অপূর্ব তাঁর কর্মকুশলতা, অদ্ভুত তাঁর সাংগঠনিক প্রতিভা। তাঁর সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় পেল সমগ্র ভারতবাসী তাঁর এই আন্দোলন পরিচালনার মাধ্যমে। সর্বপ্রথমে নিজেই ট্যাক্স দেবেন না ঘোষণা করে', কাঁথিবাসীকে ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করতে আহ্বান জানান। যতদিন কাঁথিতে ইউনিয়ন বোর্ড থাকবে ততদিন তিনি পাদুকা ব্যবহার করবেন না বলে প্রকাশ্য সভায় প্রতিজ্ঞা করে বীরেন্দ্রনাথ পাদুকা ব্যবহার ত্যাগ করেন। কাঁথিবাসী এই আন্দোলনে অপূর্ব একতা, সাহস ও সহনশীলতা প্রদর্শন করেন। ট্যাক্স অনাদায়ের জন্য তাঁদের অস্থাবর সম্পত্তি বিনাবাধায় ক্রোক করতে দিলেন অকাতরে। কিন্তু সেই মাল বহন করে আনবার জন্য গবর্নমেণ্ট কুলি, মজুর, গরুর গাড়ী কাঁথিতে যোগাড় করতে পারেনি। ঐসব সম্পত্তি নীলামে ডাক দেওয়ার জন্য কোন একজনও এগিয়ে আসেননি।

অবশেষে গবর্নমেণ্ট একদিনে মেদিনীপুর জেলা হতে ২৩৫টি ইউনিয়ন বোর্ড উঠিয়ে নেন। মালপত্র কিছুমাত্র নীলাম না হওয়ায় সরকারী কর্মচারীরা প্রত্যেক মাল-মালিকের বাড়ীতে সমূহ মাল ফিরিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। পূর্ণসাফল্যমণ্ডিত ভারতের এই প্রথম কর-বন্ধ আন্দোলনের তথা কৃষক আন্দোলনের কৃতিত্ব একক দেশপ্রাণের, আর সেই সঙ্গে তাঁর সহকর্মী কাঁথিবাসীদের।

এই সময়ে মেদিনীপুর জেলায়, বিশেষতঃ কাঁথি-তমলুকে ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে অতিশয় মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ দুটি কাজ করেছিলেন বীরেন্দ্রনাথ। ঈশ্বরচন্দ্র মাল ও অন্যান্য কয়েকজন সঙ্গীসহ

দেশপ্রাণ প্রত্যহ ৮।১০ মাইল হেঁটে দু' মাস কাল কাঁথি মহকুমার গ্রাম হতে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ান। একজন জমিদার বাড়ীর ছেলে, ব্যারিষ্টার সাহেব কাদা-জল ঘেঁটে, পায়ে হেঁটে গ্রামবাসীদের কাছে এসেছেন, তাদের সঙ্গে দেশের কথা, তাদের সুখ-দুঃখের কথা বলছেন, সকলকে একসঙ্গে নিয়ে আহার ও শয়ন করছেন—এতে তারা নিজেদিগকে গৌরবান্বিত বোধ করেছে। এই পদযাত্রার ফল সুদূরপ্রসারী। এতে কাঁথিবাসীর মনে স্বাধীনতার বাণী গভীরভাবে নিহিত হল; কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের বনিয়াদ ঐ অঞ্চলে দৃঢ় হল এবং দেশপ্রাণের প্রতি কাঁথিবাসীর আনুগত্য হল অটুট, অক্ষয়।

কাঁথি সহরে তাঁর নিজের বাটীতে বীরেন্দ্রনাথ একটি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করেন। প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বসন্তকুমার দাস এবং আরও কয়েকজন ত্যাগী পুরুষ এই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। কলাগেছিয়ার জমিদার জগদীশচন্দ্র মাইতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আর একটি জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন নিকুঞ্জবিহারী মাইতি। উল্লিখিত জাতীয় বিদ্যালয়গুলিই পরবর্তী গণ-আন্দোলনের স্নায়ুকেন্দ্র স্বরূপ ছিল। দেশপ্রাণের উপরোক্ত মন্ত্রশিষ্য ও সহচরগণ কাঁথি মহকুমায় পরবর্তী স্বাধীনতা আন্দোলনের সারথি হন।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে বীরেন্দ্রনাথ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস সভাপতি হন। ঐ সালের ১৭ই নভেম্বর ইংলণ্ডের যুবরাজ ভারতে আগমন করেন। ভারতীয় কংগ্রেসের নির্দেশে ঐদিন সমগ্র ভারতে হরতাল পালিত হয়। দেশবন্ধু, দেশপ্রাণ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অক্লান্ত পরিশ্রমে বাংলায় এই হরতাল সম্পূর্ণ সফল হয়। ১০ই ডিসেম্বর (১৯২১ খৃঃ) ব্রিটিশ সরকার দেশবন্ধু ও দেশপ্রাণকে গ্রেপ্তার করে। বিচারে উভয়েরই ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়।

এর পর ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে আমরা দেখি দেশপ্রাণকে মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যানরূপে। বীরেন্দ্রনাথ যে তিন বছর জেলা বোর্ডের

সভাপতি ছিলেন সেই তিন বছরের কাজকেও মেদিনীপুরের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি বিশিষ্ট অধ্যায় বলা চলে। অনলসভাবে সমগ্র জেলা পরিভ্রমণ করে, জনগণের সহিত মেলামেশা এবং তাদের সুবিধার্থে কূপ ও পুষ্করিণী খনন, বিদ্যালয়ের গৃহনির্মাণ ইত্যাদি কার্য দ্বারা তিনি সমগ্র জেলার জনমানসে কংগ্রেসের প্রভাব ও ভাবমূর্তি সুদৃঢ় করেন। তদানীন্তন বাংলার গবর্নর লর্ড লিটনের মেদিনীপুর আগমন উপলক্ষে অভিনন্দনের প্রস্তাব নাকচ করে এবং জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত এ বিষয়ে সকল যোগাযোগ প্রত্যাখ্যান দ্বারা দেশপ্রাণ যে নির্ভীক তেজস্বিতা প্রদর্শন করেন তাতে তাঁর সহকর্মীগণ ও জেলাবাসী বিশেষ অনুপ্রাণিত হন। ১৯২৬-এর শেষে পুনরায় মেদিনীপুরের জেলাবোর্ড ও লোক্যালবোর্ডগুলির সদস্য নির্বাচন হয়। লোক্যালবোর্ডগুলির ৭৮ জন নির্বাচিত সদস্যের মধ্যে ৭৭ জন এবং জেলাবোর্ডের ২২ জন নির্বাচিত সদস্যের সকলেই কংগ্রেসী। বীরেন্দ্রনাথের অসাধারণ প্রভাব ও নেতৃত্বই এই অসামান্য সাফল্যের কারণ। অবশ্যই দেশপ্রাণ দ্বিতীয় বার বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন। কিন্তু তাঁর ক্রিয়াকলাপে সন্ত্রস্ত ইংরেজ সরকার তাঁর নির্বাচন অনুমোদন করতে অস্বীকার করল। মেদিনীপুরবাসীর পক্ষে ইহা এক অপূরণীয় ক্ষতি।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতাই ভারতের দাবী বলে ঘোষণা করা হল এবং এই দাবী আদায়ের জন্য প্রয়োজন হলে কর-বন্ধ ও আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করতে হবে বলেও প্রস্তাব গৃহীত হল।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ২৬শে জানুয়ারী সর্বপ্রথম সারা ভারতে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হয়।

সমুদ্রতীরবর্তী ডাণ্ডিতে লবণ প্রস্তুত করে লবণ আইন ভঙ্গের উদ্দেশ্যে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ১২ই মার্চ সকালে গান্ধীজী সবরমতী আশ্রম থেকে একদল কর্মীসহ পদব্রজে রওনা হলেন। আরম্ভ হয়ে গেল ভারতব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলন।

এই আন্দোলনে মেদিনীপুরবাসী অপূর্ব নির্ভীক তেজস্বিতা প্রদর্শন করে। তারা এমন অকাতরে অসীম, অবর্ণনীয় অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করে অবিচলিত চিত্তে সমূহ সম্পত্তি, এমন কি, নিজ নিজ প্রাণ বিসর্জন দেয় যে, আমরা বলতে পারি এই আন্দোলনে মেদিনীপুর জেলা ভারতের শীর্ষস্থান অধিকার করে।

কাঁথি শহরের অদূরে পিছাবনীতে লবণ-আইন ভঙ্গের বিরাট ছাউনী পড়ে। পুরুলিয়া হতে নিবারণ দাসগুপ্ত সদলে, বাঁকুড়া হতে কমলকৃষ্ণ রায় ও তাঁর বিরাট বাহিনী, সুদূর কুমিল্লা হতে অভয় আশ্রমের ডাঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এবং তাঁদের সহকর্মীবৃন্দ জমায়েত হলেন নাড়াজোলের কুমার দেবেন্দ্রলাল খানের মেদিনীপুর শহরস্থ বিরাট কাছারি বাড়ীতে। সেখানে অষ্ট প্রহরব্যাপী নেতৃবৃন্দ জনসমক্ষে কয়েকদিন দিবারাত্র আন্দোলনের বিষয় ব্যাখ্যা করলেন। লবণ আইন সম্পর্কে নিবারণ দাসগুপ্ত বললেন: "আমরা ভারতবাসী আহারের প্রতি গ্রাসে পরাধীনতার গ্লানি গলাধঃকরণ করি।" তারপর বিরাট অহিংস সত্যাগ্রহীবাহিনী মেদিনীপুর শহর থেকে পদব্রজে রওনা হলেন কাঁথির পিছাবনী অভিমুখে।

পিছাবনীতে দীর্ঘদিন ধরে একদিকে হিংস্র, সশস্ত্র ইংরাজ সরকারের কর্মচারী ও পুলিশ এবং অন্যদিকে অহিংস লবণ-সত্যাগ্রহীদের মধ্যে খণ্ড প্রলয় চলল। পুলিশ নির্মমভাবে লাঠি-বুট চালাল। নারীরাও অকথ্য লাঞ্ছনার হাত থেকে রেহাই পেল না। শত-শত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে জেলে ভর্তি করা হল। ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বসন্তকুমার দাস ও অন্যান্য বহু নেতা গ্রেপ্তার হলেন। ঝাড়েশ্বর মাঝি কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের ভোজনের জন্য তাঁর সঞ্চিত বিপুল শস্যভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। ক্রোধে পুলিশ ঝাড়েশ্বর মাঝির হামার বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে আট হাজার মণ ধান ভস্মীভূত করেছিল এবং আরও বহু লোকের গৃহ, এমন কি, গবাদি পশুও পুড়িয়ে মেরে ছাই করে দিয়েছিল।

সদর মহকুমার কেশপুরের জমিদার কালী রায় ও কেদার রায়ের নেতৃত্বে কর-বন্ধ আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে। মেদিনীপুর শহরেও ১৪৪ ধারা অমান্য এবং পুলিশের লাঠির আঘাত সহ্য করে ৭৮টি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। মন্মথনাথ দাস, রামসুন্দর সিংহ, শৈলজানন্দ সেন প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের কারাবাস হয়।

তমলুক মহকুমার নরঘাটে সতীশচন্দ্র সামন্ত, অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কর্মীদের নেতৃত্বে হাজার হাজার মানুষ লবণ-আইন ভঙ্গ করে। জেলার নানা স্থানে পুলিশের নির্মম লাঠি ও বেত্রাঘাতে এবং গুলিবর্ষণে বহু মেদিনীপুরবাসী প্রাণ হারান।

ঘাঁটাল মহকুমার দাসপুর থানার চেচুয়াহাটে পুলিশের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে এক ক্ষিপ্ত জনতা দারোগা ভোলানাথ ও তাহার সহকারী অনিরুদ্ধকে হত্যা করে। প্রতিশোধে কয়েকদিন পরে চেচুয়াহাটে পুলিশ নিরস্ত্র জনগণের উপর নির্মমভাবে গুলিবর্ষণ করে চৌদ্দজন নিরপরাধ কৃষককে হত্যা করে। পরে ঐ দারোগা-হত্যা মামলায় বারোজনের দ্বীপান্তর হয়।

এগরা থানার চোরপালিয়া গ্রামে আতঙ্কে একটি পানাপুকুরে পতিত এগারজনকে পুলিশ লাঠির আঘাতে নিহত করে।

এই আন্দোলনে রামনগর থানার বিপ্রদাস বেরা ও বীরনারায়ণ বাগড়ী প্রাণ দেন। ক্ষিরাই পুকুরের পাড়ে পুলিশের গুলিবর্ষণে পনর জন সত্যাগ্রহী নিহত হন।

"শাসমল ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন নাই।" (প্রমথনাথ পালের 'দেশপ্রাণ শাসমল', দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ১৫৮) তথাপি মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ বছর ১লা নভেম্বর দেশপ্রাণকে এক আদেশ দেন যে, তিনি দুই মাস ঐ জেলায় প্রবেশ করতে পারবেন না। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁর এই আদেশের কারণস্বরূপ লেখেন—"বর্তমান সময়ে মেদিনীপুর জেলার যে-কোন স্থানে মিঃ শাসমলের উপস্থিতিতে জনসাধারণের শান্তি

বিপন্ন হবে।" পরে কলিকাতা হাইকোর্ট এই আদেশ বাতিল করে দেয়।

এই আন্দোলনের সময় মেদিনীপুর জেলায় জনসাধারণের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়, তার তদন্তের জন্য কলকাতার এক জনসভায় একটি তদন্ত-কমিটি গঠিত হয়। বিখ্যাত এটর্নী যতীন্দ্রনাথ বসুকে এই কমিটির সভাপতি করা হয়। বীরেন্দ্রনাথও এই কমিটির অন্যতম সভ্য ছিলেন। এই তদন্ত কমিটির কার্যে দেশপ্রাণ খুব পরিশ্রম করেছিলেন। ব্রিটীশ সরকার এই কমিটির বিবরণ বাজেয়াপ্ত বলে ঘোষণা করে।

মেদিনীপুরে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের আন্দোলন দমনকল্পে ব্রিটীশ সরকার যে দানবীয় দমননীতি চালু করে তার প্রধান হোতা ও অধিনায়ক ছিলেন জেলাশাসক মিঃ জেম্‌স পেডী, আই. সি. এস। দেশবাসীর উপর অবর্ণনীয় অত্যাচারে মেদিনীপুরের সশস্ত্র বিপ্লবী তরুণদল খুব উত্তেজিত হন এবং তাঁদের রোষদৃষ্টি স্বভাবতঃই মিঃ পেডীর উপর পড়ে।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ৭ই এপ্রিল সন্ধ্যায় মেদিনীপুরের দুই নির্ভীক বিপ্লবী যুবক—বিমলকুমার দাসগুপ্ত ও যতিজীবন ঘোষ (আমার তৃতীয় কনিষ্ঠ সহোদর) মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের একটি কামরায় মিঃ পেডীর উপর বার বার রিভলভার হতে গুলিবর্ষণ করে। গুরুতর আহত হয়ে মিঃ পেডী পরদিন মেদিনীপুর সদর হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করেন। যতিজীবনকে পুলিশ শেষ পর্যন্ত পেডী হত্যা মামলায় জড়াতে পারেনি। কলিকাতায় মিঃ ভিলিয়ার্সকে হত্যা প্রচেষ্টার অপরাধে বিমলের দশ বছর দ্বীপান্তরবাসের সাজা হয়। এরপর তাকে কলিকাতা হাইকোর্টে পেডীকে হত্যার অভিযোগে আসামী করে মামলা আরম্ভ হয়। কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে বিমল বেকসুর খালাস পায়। যতিজীবনকে পরে দীর্ঘ ছয় বছর রাজবন্দীরূপে আটক রাখা হয়।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ১৬ই সেপ্টেম্বর খড়গপুর শহরের উপকণ্ঠে হিজলী বন্দীশালায় রাজবন্দীদের উপর অমানুষিকভাবে গুলি চালানো হয়।

রাজবন্দী সন্তোষকুমার মিত্র ও তারকেশ্বর দস্তিদার নিহত এবং প্রায় বিশজন রাজবন্দী গুরুতররূপে আহত হন।

মেদিনীপুরের তেজস্বী বিপ্লবী তরুণেরা হিজলীর এই অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে মিঃ পেডীর স্থলাভিষিক্ত জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রবার্ট ডাগলাস, আই. সি. এস.-কে নিধনের শপথ নেয়। মেদিনীপুর জেলা-বোর্ডের সভাকক্ষে মিঃ ডাগলাস চেয়ারম্যানরূপে সভা পরিচালনা করছেন ৩০শে এপ্রিল, ১৯৩২, বিকাল ছ'টা নাগাদ। সহসা দু'জন অসমসাহসী যুবক বীরদর্পে সভাকক্ষে প্রবেশ করে মিঃ ডাগলাসের উপর রিভলভার থেকে গুলি নিক্ষেপ করলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই মিঃ ডাগলাস মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। মেদিনীপুরের এই দু'জন বীর বিপ্লবী সন্তান—প্রদ্যোতকুমার ভট্টাচার্য ও প্রভাংশুশেখর পাল—কার্য সমাধা করে দৌড়াতে আরম্ভ করলেন—একজন উত্তর-পূর্বমুখো, অন্যজন উত্তর-পশ্চিমমুখো। প্রভাংশু গুলি ছুঁড়তে-ছুঁড়তে নিরাপদে অন্তর্ধান করল। কিন্তু কী দুর্ভাগ্য! প্রদ্যোতের অস্ত্রটি অকেজো হয়ে পড়ায় সে কিয়দ্দূর যাওয়ার পর অনুসরণকারী পুলিশের হাতে ধরা পড়ল।

ডাগলাস হত্যা মামলায় মাত্র একজন আসামী—প্রদ্যোতকুমার ভট্টাচার্য। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ প্রদ্যোতের পক্ষে বিনা পারিশ্রমিকে কৌঁসুলী দাঁড়ান। স্মরণযোগ্য যে, বীরেন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল নিজের খরচে অর্থাৎ বাড়ী ভাড়া, পাচক-পরিচারকের ব্যয় বহন করে বিনা পারিশ্রমিকে চট্টগ্রাম ষড়যন্ত্র মামলা পরিচালনা করেন।

বিচারে প্রদ্যোতকে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হয়। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ১২ই জানুয়ারীর উষায় মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে দৃপ্ত বীরের পদক্ষেপে ফাঁসীর মঞ্চে উঠলেন মৃত্যুঞ্জয় প্রদ্যোতকুমার ভট্টাচার্য।

মিঃ ডাগলাসের পর মেদিনীপুরের জেলাশাসক হলেন মিঃ বি. ই. জে. বার্জ, আই. সি. এস। তাঁর অধীনেও ট্যাক্সবন্ধকারীদের উপর চলল অবাধ জুলুম। মেদিনীপুরের সিংহবিক্রম বিপ্লবীরা জনগণের

উপর অত্যাচারের নীরব দর্শকরূপে থাকতে পারল না। ২রা সেপ্টেম্বর (১৯৩৩) বিকালে একটি ফুটবল ম্যাচে মিঃ বার্জ পুলিশ ময়দানে খেলতে নামলেন। সঙ্গে সঙ্গে মেদিনীপুরের দুই দুর্দান্ত বীর যুবক—মৃগেন্দ্রকুমার দত্ত ও অনাথবন্ধু পাঁজা গুলি ছুঁড়তে-ছুঁড়তে মিঃ বার্জের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মিঃ বার্জ সেই স্থানেই তৎক্ষণাৎ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। মিঃ বার্জের দেহরক্ষীরা ঝাঁকে-ঝাঁকে গুলিবর্ষণ করে মৃগেন্দ্রকুমার ও অনাথবন্ধুকে নিহত করল।

ব্রিটিশ সরকার বার্জ-হত্যা ষড়যন্ত্র মামলা খাড়া করে। এই মামলায় শহীদ ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, শহীদ রামকৃষ্ণ রায় ও শহীদ নির্মলজীবন ঘোষ (আমার পঞ্চম কনিষ্ঠ সহোদর)-এর মৃত্যুদণ্ড হয়। কামাখ্যা ঘোষ, সনাতন রায়, নন্দদুলাল সিংহ, সুকুমার সেনগুপ্ত ও শান্তিগোপাল সেনের দণ্ড হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাস। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর উষায় ব্রজকিশোর, রামকৃষ্ণ এবং ২৬শে অক্টোবর উষায় নির্মলজীবন মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে বীরদর্পে দৃঢ় পদক্ষেপে ফাঁসীর মঞ্চে আরোহণ করেন।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর শহীদ নির্মলজীবনের দাদা—শহীদ নবজীবন ঘোষ (আমার চতুর্থ কনিষ্ঠ সহোদর) ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ থানা-গৃহে পুলিশী নির্যাতনে প্রাণ হারান। এই "জীবন ঘোষ" পরিবারও মেদিনীপুরের একটি বিশেষ গৌরব। কোনও একটি বংশে কী দুই পুরুষ ধরে এতজন শহীদ ও বিপ্লবী জন্মগ্রহণ করেছে?

পর পর তিন বছরে তিনজন ইংরেজ সিভিলিয়ান জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে ধরাধাম হতে অপসারণ ভারতের বিপ্লবী ইতিহাসে মেদিনীপুরের অনন্য কীর্তি।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দে এল মেদিনীপুরের তথা ভারতের শেষ ও প্রবলতম স্বাধীনতা আন্দোলন। এর আট বছর পূর্বে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ২৪শে নভেম্বর দেশপ্রাণ চিরনিদ্রামগ্ন হন। তবু মনে রাখতে হবে

মেদিনীপুরে অহিংস গণ-আন্দোলনের ভগীরথ দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ। তাঁরই প্রস্তুত-করা মেদিনীপুরের মাটিতে, তাঁরই নিকটে দীক্ষিত তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরীরা তমলুকে উড্ডীন করলেন মেদিনীপুরের বিজয়-বৈজয়ন্তী সমগ্র ভারতবর্ষকে বিস্মিত-স্তম্ভিত করে।

গান্ধীজী ও অন্যান্য সর্ব-ভারতীয় নেতাদের গ্রেপ্তারের সংবাদ পৌঁছানো মাত্র মেদিনীপুরে প্রচণ্ড রূপ নিল "ভারত ছাড়" বা আগষ্ট আন্দোলন। কাঁথি-তমলুকে উত্তাল জনসমুদ্র গর্জে উঠল। অপর পক্ষে "ব্রিটিশ সরকার তার চিরাচরিত নারকীয় দমননীতির পথে নামল। জনগণের উপর লাঠি ও গুলি চালনা, নারীধর্ষণ, ঘর-বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি পৈশাচিক ক্রিয়াকলাপ চলল।

মেদিনীপুরে, বিশেষতঃ কাঁথি-তমলুকে আন্দোলন ছিল সুপরিকল্পিত, সুনিয়ন্ত্রিত ও অপ্রতিরোধ্য। ব্রিটিশ সরকার স্বয়ং পরে স্বীকার করে মেদিনীপুরের বিদ্রোহে যথেষ্ট সতর্কতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল—পরিকল্পনাও ছিল অনেকটা ত্রুটিহীন। বিদ্রোহীদিগের ছিল নিজস্ব গোয়েন্দা-বিভাগ, সংঘর্ষে আহত ব্যক্তিগণকে সেবাশুশ্রূষা করবার চিকিৎসক ও শুশ্রূষাকারী সঙ্গেই থাকত।

প্রথমে মহিষাদলে "বিদ্যুৎবাহিনী" নাম দিয়ে একই ধরনের পোষাকে সজ্জিত বিরাট এক স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠিত হয়। ২৯শে আগষ্ট বিশ সহস্র স্বেচ্ছাসেবক মহিষাদল থানার সুমুখে জমায়েত হল এবং সেখানে তমলুকের মহকুমাশাসক ও সশস্ত্র পুলিশ-বাহিনীর চোখের উপর স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করল। মহকুমাশাসক চারজন বক্তাকে গ্রেপ্তারের আদেশ জারি করলেন, কিন্তু জনতা তাঁদের গ্রেপ্তারে বাধা দিল। ম্যাজিস্ট্রেট তখন পুলিশকে জনতার উপর লাঠি চার্জ করতে হুকুম দিলেন। কিন্তু কনষ্টেবলরা সে আদেশ পালনে অগ্রসর হল না। হতবুদ্ধি ম্যাজিস্ট্রেট সত্বর স্থান ত্যাগ করলেন। এই বিদ্যুৎবাহিনীতে ছিল তিনটি বিভাগ—গেরিলা সৈনিক বিভাগ, সংবাদ সংগ্রহ বিভাগ এবং সেবা বিভাগ।

২৭শে সেপ্টেম্বর তমলুকের নেতৃবৃন্দ এক গুপ্ত বৈঠকে সমবেত হয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, থানা-আদালতগৃহ ও অন্যান্য সরকারী ভবন দখল করে তার উপর জাতীয় পতাকা উড্ডীন করতে হবে। বিরাট বিদ্যুৎবাহিনী পরদিনই বড়-বড় গাছ কেটে রাস্তার উপর ফেলে, সেতু ধ্বংস করে, টেলিগ্রাফের তার কেটে ও পোষ্ট উপড়ে তমলুকের সহিত বহির্জগতের যোগাযোগ সম্পূর্ণ ছিন্ন করে দিল। প্রচণ্ড লাঠি চার্জ ও গুলিবর্ষণ উপেক্ষা করে দু'দিনের মধ্যে তিন-চারটি থানা দখল করে সে-সব স্থানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হল।

২৯শে সেপ্টেম্বর পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঁচটি বড়-বড় শোভাযাত্রা বিভিন্ন দিক হতে তমলুক শহরস্থ থানার দিকে অগ্রসর হল। পুলিশ প্রথমে জনতার উপর নির্মমভাবে লাঠি চার্জ করল। তাতে জনতা কিছুমাত্র নিরস্ত না হওয়ায় পুলিশ ও মিলিটারি শোভাযাত্রীদের উপর প্রচণ্ড গুলি নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করল। গুলিতে বহু লোক হতাহত হল। রামচন্দ্র বেরাকে সাংঘাতিক আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। বহুক্ষণ পরে তাঁর একটু জ্ঞান ফিরলে তিনি কোনও মতে দাঁড়িয়ে তাঁর বাইরের সঙ্গীদের ডেকে বললেন— "এই যে আমি থানায় এসেছি, থানা দখল হয়েছে।" কথাগুলি বলার সঙ্গে-সঙ্গেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন অমর শহীদ রামচন্দ্র।

উত্তর দিক থেকে যে শোভাযাত্রাটি থানা অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিল তারই পুরোভাগে ছিলেন ৭৩ বৎসর বয়স্কা মাতঙ্গিনী হাজরা। সৈন্যগণের প্রবল গুলিবর্ষণের মুখে মাতঙ্গিনী জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে সৈন্যদলের মধ্যে প্রবেশ করে ভারতীয় হয়ে ভারতীয়দের উপর গুলিবর্ষণ করতে নিষেধ করেন। কিন্তু সৈন্যদের নিক্ষিপ্ত গুলি প্রথমে তাঁর ডানহাতে পরে বামহাতে লাগে এবং পরে একটি বুলেট তাঁর ললাট ভেদ করে বেরিয়ে যায়। রক্তস্নাতা বৃদ্ধ-বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী হাজরা সঙ্গে-সঙ্গেই ইহলোক ত্যাগ করেন। কিন্তু তখনও জাতীয় পতাকা তাঁর বজ্রমুঠিতে ধরা ছিল।

সেদিন মহীয়সী বীরাঙ্গনা মাতা মাতঙ্গিনী হাজরার সঙ্গে পুলিশের গুলিতে প্রাণ দেন চারজন বীর সত্যাগ্রহী—লক্ষ্মীনারায়ণ দাস, পুরীমাধব প্রামাণিক, নগেন্দ্রনাথ সামন্ত এবং জীবনচন্দ্র বেরা।

ক্রমেই সমগ্র তমলুক মহকুমায় ব্রিটীশ শাসন কাঠামো বিলুপ্ত হয়ে যায়। অবশেষে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হল তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার, সর্বাধিনায়ক সতীশচন্দ্র সামন্ত; তাঁর দক্ষিণ হস্ত অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়। আইনশৃঙ্খলা, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিচার, কৃষি ও প্রচার বিভাগের প্রধান হিসাবে কয়েকজন মন্ত্রীও নিযুক্ত হন। বিভিন্ন থানায় কতকগুলি অধীনস্থ শাসনকেন্দ্র গঠিত হয়। নিজস্ব ডাকবিভাগও খোলা হয়। বিদ্যুৎবাহিনীকে নিয়মিত সেনাবাহিনীতে উন্নীত করা হয়। বিচারকার্য, শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা ইত্যাদি প্রশাসনিক সব বিষয় সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে থাকে। দুঃস্থ জনগণকে খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধপত্রাদি বিতরণ করে জাতীয় সরকার প্রভূত জনকল্যাণ সাধন করেন। তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার ৮ই আগষ্ট (১৯৪৪) পর্যন্ত তমলুক মহকুমায় শাসনকার্য পরিচালনা করেন। ঐ তারিখে গান্ধীজীর নির্দেশে ঐ সরকার তুলে নেওয়া হয়।

কাঁথি মহকুমাতেও আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠে। পটাশপুর ও অন্যান্য থানা, সব সরকারী আপিস জনতা দখল করে নেয়। বিশাল জনতা ভগবানপুর থানা আক্রমণ করে; কিন্তু পুলিশবাহিনী জনতার উপর প্রচণ্ড গুলিবর্ষণ করে বাধা দেয়। ১৬ জন আন্দোলনকারী নিহত হন। রামনগর থানার দশজন লোক পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান।

নীচে কয়েকটি পরিসংখ্যান দেওয়া হল। এগুলি থেকে তমলুক-কাঁথিতে আন্দোলনের শক্তি ও বিরাটত্ব এবং সেই আন্দোলন দমনে ব্রিটীশ সরকারের পৈশাচিক বর্বরতা কিছু পরিমাণে অনুমান করা যাবে।

তমলুক মহকুমা

গুলিবর্ষণে মৃত—৪০ জন; আহত—১৯৯ জন। ধর্ষিতা নারী—৭৩ জন। পুলিশের দ্বারা অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত গৃহ—১১৭ খানি। পুলিশ কর্তৃক লুঠতরাজ—১০৪৪ খানি গৃহ। পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার—১৮৬৮ জন। পুলিশ কর্তৃক বেআইনীভাবে আটক—৫০৭৬ জন। পুলিশের লাঠির আঘাতে আহত—৪২২৬ জন।

কাঁথি মহকুমা

গুলিবর্ষণে মৃত—৩৯ জন; আহত—১৭৫ জন। ধর্ষিতা ও লাঞ্ছিতা নারী—২২৮ জন। পুলিশের দ্বারা অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত গৃহ—৯৬৫ খানি। পুলিশ কর্তৃক লুণ্ঠিত গৃহ—২০৫৯ খানি। পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার ও আটক—১২৬৮১ জন। পুলিশের লাঠির আঘাতে আহত—৬৬৮৫ জন।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে মেদিনীপুরের স্বাধীনতা আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস দেওয়া সম্ভব হল না, যেমন সম্ভব হয় নাই দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথের পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি অঙ্কন, কারণ তাঁর জীবনীকার প্রমথনাথ পালের ভাষায় "বীরেন্দ্রনাথ বিরাট।"

সমাপ্তিতে বলি—ধন্য বীরপ্রসবিনী মেদিনীপুর, ধন্য বীরসিংহের সিংহশিশু বিদ্যাসাগর, অগ্নিযুগের অগ্নিশিশু ক্ষুদিরাম ও অস্ত্রগুরু হেমচন্দ্র, দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ, বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী হাজরার জন্মভূমি! ধন্য শত-শত বীর মৃত্যুঞ্জয়ের শোণিতে রঞ্জিত চির-গৌরবময় মেদিনীপুর!

দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ-স্মরণে

ডঃ বিমলানন্দ শাসমল, এম্. এ. (ক্যাল), ডি. লিট. (প্যারিস)
(য়্যাড্‌ভোকেট, কলিকাতা হাইকোর্ট)

১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর স্বর্গীয়া সরোজিনী নাইডু কলিকাতার দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ ইনষ্টিটিউশনের ম্যাগাজিনের জন্য একটি বাণী লিখে পাঠিয়েছিলেন। সেটা ঐ ম্যাগাজিনে ঐ বছরের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। ঐ ইনষ্টিটিউশনের কর্তৃপক্ষ সরোজিনী নাইডুর দেওয়া বাণীর মূল লেখাটি সংরক্ষণ করে রাখেননি, এটা খুবই দুঃখের বিষয়। এতেই বোঝা যায়, আমাদের দেশে যাঁদের হাতে শিক্ষাদানের ভার রয়েছে তাঁরা যুব-ছাত্রসম্প্রদায়ের মনে দেশের যথার্থ ঐতিহ্য জাগরূক রাখা সম্বন্ধে কতখানি উদাসীন।

স্বর্গীয়া নাইডু তাঁর বাণীতে বলেছিলেন : "দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল একজন অকুতোভয় এবং একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক ছিলেন, যিনি তাঁর সমগ্র জীবন ভারতবর্ষের সেবায় উৎসর্গ করে গেছেন। মাতৃভূমির জন্য তাঁর প্রেম, স্বাধীনতার জন্য তাঁর আবেগ, তাঁর সংগ্রামশীল সাহসিকতা এবং তাঁর আত্মত্যাগের অগণিত কাহিনী যুবজনের পক্ষে প্রেরণায় পূর্ণ। এই দেশপ্রেমিককে কিভাবে সম্মান দেখানো যায় সে-কথা তাদের অবশ্যই শিখতে হবে।"

দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষে যুব-ছাত্রসম্প্রদায় কিভাবে তাঁকে সম্মান দেখাতে পারে সেই কথাই এখানে বলব। প্রথম দিকে দেশের বেশীর ভাগ নেতা স্বাধীনতা বা স্বরাজ বলতে পূর্ণ স্বাধীনতা মনে করতেন না। প্রথম যুগ থেকেই যে সামান্য অল্পসংখ্যক নেতা স্বাধীনতা বা স্বরাজ বলতে পূর্ণ স্বাধীনতা মনে করতেন দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। কিন্তু এই পূর্ণ স্বাধীনতালাভের যে-পথটি তিনি অবশ্য প্রয়োজনীয় বলে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন

সেখানে তিনি একক এবং অদ্বিতীয়। পূর্ণ স্বাধীনতালাভের সেই পথ গ্রহণের কথা তাঁর আগে এদেশে কেউ কখনও কোথাও বলেননি।

তাঁর মতে পূর্ণ স্বাধীনতালাভের একটি পথ আছে—সেটি বিপ্লবের বা রেভোলিউশনের পথ। তিনি আরও বলেছিলেন যে, বিপ্লব বা রেভোলিউশনের পথ ছাড়া অন্য পথে পূর্ণ স্বাধীনতা আসতে পারে না। এখানে মনে রাখতে হবে যে, ক্ষমতা দখল এবং স্বাধীনতা যে এক জিনিস নয় তিনি সেই কথাই বলতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে ক্ষমতা দখল বাহিরের বস্তু, কিন্তু স্বাধীনতা অন্তরের সম্পদ। রবীন্দ্রনাথও এই কথা বার বার বলে গেছেন। তিনি বলেছিলেন ঃ "রাজনৈতিক স্বাধীনতা আমাদের সত্যিকার স্বাধীনতা এনে দিতে পারবে না। যে-সব দেশে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বিদ্যমান সেসব দেশের অধিবাসীরা যে স্বাধীন তা সব সময় নয়। সেসব দেশের অধিবাসী সংখ্যাল্প শাসক-সম্প্রদায়ের হাতের ক্রীড়নক। আমাদের দেশে আমরা সামাজিক দাসত্বের চোরাবালির উপরে স্বাধীনতার অলৌকিকত্বকে প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করছি।"—(অভিভাষণ)

বিপ্লব বা রেভোলিউশন ছাড়া দেশের সত্যিকার স্বাধীনতা যে হবে না দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ তার কারণ দেখিয়ে গেছেন। স্বাধীনতা-সংগ্রামের নেতারা ভেবেছিলেন যে, ইংরেজের নিকট থেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করলেই আমাদের সত্যকার স্বাধীনতা এসে যাবে। কিন্তু সত্যিকার স্বাধীনতা কেউ এনে দিতে পারে না। সেইজন্যই সত্যিকার স্বাধীনতা অর্জন করতে হয় এবং তা অর্জন করবার জন্য লড়াই করতে হয়। ওদিকে, স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যদি সংগ্রাম করতে হয় তাহলে সেই সংগ্রামের পথে যে-স্বাধীনতা আসে সংগ্রাম করতে গেলে সেই স্বাধীনতা অর্জনের যোগ্যতা তার আগেই এসে গিয়ে থাকে। অর্থাৎ সেই সংগ্রামের মুখ্য উদ্দেশ্য স্বাধীনতা অর্জন নয়, কিন্তু সংগ্রামের মাধ্যমে নিজেকে সত্যিকার স্বাধীনতালাভের যোগ্য করে তোলা। তাহলে স্বাধীনতালাভের চেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়

হচ্ছে স্বাধীনতা লাভের যোগ্যতা অর্জন করা। স্বাধীনতা লাভের যোগ্যতা অর্জন হয়ে গেলে যে-স্বাধীনতা করায়ত্ত হয়ে থাকে সেই স্বাধীনতাকে অস্বীকার করবার বা তাকে বাধা দেবার ক্ষমতা পৃথিবীর কোন শক্তিরই থাকে না।

স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম নানা ভাবে হতে পারে। সশস্ত্র সংগ্রাম হতে পারে—এ-পথে অস্ত্র দ্বারা স্বাধীনতা-অপহরণকারী বিদেশী শক্তিকে আঘাত করে শাসনক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া যায়। অথবা অহিংস সংগ্রামও করা যেতে পারে—যে-সংগ্রামের পথে সকল অত্যাচারকে হাসিমুখে বরণ করে নিয়ে স্বাধীনতা-অপহরণকারী শক্তির হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটিয়ে স্বাধীনতা লাভ সম্ভব হতে পারে।

কিন্তু দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ দেখিয়েছিলেন যে, ইংরেজ সাম্রাজ্য-বাদীদের হাত থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে গেলে এই দুটি পথের কোনটিই বিশেষ কার্যকরী হতে পারত না। তখনকার বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রামের স্বপ্ন আকাশকুসুম ছাড়া আর কিছু ছিল না। পৃথিবীর অন্য কোন শক্তির নিকট হতে অস্ত্র সরবরাহের আশা থাকলেও সেইভাবে অস্ত্র লাভ করে যে-স্বাধীনতা পাবার আশা থাকে তা যে শেষে অস্ত্র-সরবরাহকারী দেশের পদানত হয়ে থাকার পথ প্রশস্ত করে দেবে তার সম্ভাবনাই বেশী ছিল। তাঁর মতে অহিংস সংগ্রামের পথে প্রধান বাধা ছিল এই যে, নিষ্কলুষ অহিংসার মহান্ আদর্শে দেশের অগণিত জনসাধারণকে কার্যকরীভাবে উদ্বুদ্ধ করা অসম্ভব এবং সত্যই যদি কোনদিন ভারতের অগণিত জনসাধারণকে অহিংসার মহান্ আদর্শে সম্পূর্ণভাবে অনুপ্রাণিত করা যেত তা হ'লে বুঝতে হবে সেদিন তারা রাজনৈতিক স্বাধীনতার অনেক ঊর্ধ্বে উঠে গেছে এবং সেই হেতু তখন তাদের কাছে রাজনৈতিক স্বাধীনতা তুচ্ছ প্রমাণিত হতে বাধ্য ছিল এবং যে জনসমাজ রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে তুচ্ছ মনে করে তাদের দ্বারা রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংগ্রাম

করাও অসম্ভব হতে বাধ্য। অতএব সম্পূর্ণ অহিংস পথে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংগ্রাম এক অত্যন্ত অবাস্তব পরিকল্পনা ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

তা হ'লে এক নিরস্ত্র, সহায়হীন, সম্বলহীন জনসমষ্টির পক্ষে কি স্বাধীনতা অর্জন করা কোনো দিনই সম্ভব নয়? তা হ'লে তারা কি চিরদিন পরাধীনতার শৃংখলে বন্দী থেকে যেতে বাধ্য? যদি তারা চিরদিন পরাধীনতার শৃংখলে বন্দী থেকে যেতে বাধ্য না থাকে তা হ'লে তাদের পরাধীনতা মোচনের পথ কি? দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ সেই পথের নির্দেশ করে দিয়ে বলেছিলেন—তাদের পরাধীনতা মোচনের যে একটিমাত্র পথ আছে, সেটি বিপ্লবের পথ। কিন্তু সে-বিপ্লব ঘটবে গুপ্তহত্যার পথে নয়, এমন কি, কোন ধ্বংসমুখী হিংসার পথেও নয়। সে-বিপ্লবের প্রকাশ হবে গণ-অভ্যুত্থানে। এই গণ-অভ্যুত্থান শুধু বাহ্যিক বা শারীরিক নয়। বাহ্যিক বা শারীরিক গণ-অভ্যুত্থান বিপ্লবের গৌণ প্রকাশ মাত্র।

মানুষের অন্তরের যে-অভ্যুত্থান তাই হ'ল বিপ্লবের প্রথম পদক্ষেপ। শোষণহীন, অত্যাচারহীন, মনুষ্যত্বের মর্যাদাসৃষ্টিকারী এক নূতন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য এক আকুল আবেগের টানে অন্তরের যে-অভ্যুত্থান সেইটাই বিপ্লবের প্রকৃত সূচনা। কোন দেশের জনসমষ্টির মনে এক নূতন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এই যে আকুল আবেগ, এই আবেগের সৃষ্টি যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ বিপ্লবের কোন সম্ভাবনা একেবারেই থাকে না। যদি একবার এই আবেগের সৃষ্টি করা সম্ভব হয় তা হ'লে সেখানে আর সশস্ত্র বা নিরস্ত্র সংগ্রামের কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না।

ওদিকে এক নূতন সমাজব্যবস্থা সৃষ্টি করবার আবেগ মানুষের মনে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আসার সম্ভাবনাও খুব কম। কিন্তু যতক্ষণ নূতন সমাজ সৃষ্টির আবেগ সৃষ্টি না হচ্ছে ততক্ষণ প্রকৃত বিপ্লবের আশা একেবারেই থাকে না। কাজেই যাঁরা বিপ্লব সৃষ্টি করতে চান তাঁদের

প্রথম কর্তব্য হচ্ছে সমগ্র জনসমষ্টির মনে এক নূতন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আবেগ সৃষ্টি করা। বিপ্লব সৃষ্টির সেইটাই হচ্ছে প্রথম পদক্ষেপ। কিন্তু এই আবেগ সৃষ্টির একমাত্র পথ হচ্ছে—শিক্ষা। প্রকৃত শিক্ষাই বিপ্লবের বাহন। যে-শিক্ষা মানুষকে অত্যাচারহীন, শোষণহীন, মনুষ্যত্বের মর্যাদাসৃষ্টিকারী সমাজব্যবস্থা সৃষ্টির জন্য উদ্বুদ্ধ না করে সে-শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাই নয়। তাই ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর হাওড়া জেলার মাজু অধিবেশনে দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ এক দীর্ঘ প্রস্তাবে দেশের মানুষকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে দেশে এক নূতন সমাজব্যবস্থা সৃষ্টির ভিত্তি কি করে স্থাপন করা যায় তা সবিস্তারে আলোচনা করেছিলেন।

শিক্ষালাভ করে ভাল চাকরী পাব, ভাল টাকা উপার্জন করব—এ-শিক্ষা শিক্ষাই নয়। যে-শিক্ষা এক নূতন সমাজব্যবস্থা সৃষ্টির কাজে সহায়তা করে এবং মানুষের মনকে এক নূতন সমাজব্যবস্থার মহান্ আদর্শের প্রতি অনুরক্ত করে তোলে, দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, সেই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। দেশের ছাত্র-যুবাসম্প্রদায় একদিন সেই প্রকৃত শিক্ষার জয়ধ্বজা উড্ডীন করবে দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ এই আশা নিয়ে সারা জীবন কাটিয়ে গিয়েছেন।

মহান্ দেশপ্রাণের জন্মশতবর্ষ

একটি সমীক্ষা

অধ্যাপক ডঃ সুধাংশুশেখর শাসমল এম. এ ; পি-এইচ. ডি. (কলিঃ)

পৃথিবীর যে-কোন সভ্য-স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রনীতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারার মধ্যে কতকগুলি মৌল সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্য থাকেই। জীবনের পরম সত্য ও সুন্দর লাভের তপস্যায় বিশ্বের জাগ্রত মানবসমাজ চিরকাল ব্রত উদ্‌যাপন করেছে। জাতির অশেষ কৃচ্ছ্রসাধন, ত্যাগস্বীকার, দুঃখবরণ, এমন কি, মৃত্যুর বিনিময়ে তার স্বাধীনতা, সাম্য, শান্তি, শ্রেণীহীন-শোষণহীন-সংস্কৃতিবান সমাজ এবং আবশ্যক মূল্যবোধগুলি অর্জিত হয়েছে আর জাতি তার প্রাণ-মন দিয়ে সেই উপার্জিত সম্পদের সংরক্ষণ করে চলেছে।

এই সব কথার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় জাতীয় জীবনের আলোচনা ও অনুচিন্তা করতে বসলে বহু ব্যত্যয় এসে আমাদের আলোড়িত করবে। দেশ ভাগ করে ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে কয়েক দশকের দুঃখবরণ, কতজনের জীবনদান, আসমুদ্রহিমাচল জাতির অহিংস আন্দোলন, গান্ধীজীর নেতৃত্ব, নেতাজীর অকল্পনীয় সমরোদ্যম এবং ভারতবাসীর অনমনীয় প্রচেষ্টা ও সদিচ্ছার মাধ্যমে। সেই কষ্টার্জিত স্বাধীনতা মাত্র তিনটি দশক অতিক্রম করে এসেই এখন সমস্যাসংকুল কণ্টকাকীর্ণ ধূলিশয্যায় ধরাশায়ী হয়ে গেল কেন? এই কঠিন প্রশ্নের কোন সহজ সমাধান এই সামান্য প্রতিবেদকের জানার কথা নয়। তবে কতকগুলি মৌলিক সমস্যার সূত্র ধরে জাতীয় দেশপ্রেমিক নেতাগণ যে-যে বক্তব্য উত্থাপিত করে গেছেন সেগুলির পুনরালোচনা করলে এই দাঁড়ায় যে, প্রথমতঃ, এই জাতির দেশোদ্ধারের তাগিদ দ্রুত ও আকস্মিকভাবে গড়ে উঠেছিল দেশপ্রেম ও দেশরক্ষার মূল প্রত্যয়গুলি সম্পর্কে সচেতনতা লাভ না করেই; দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তি-

জীবন নিয়ে সমাজ-জীবন। ব্যক্তি-জীবনের স্বরূপ আলাদা-আলাদা ভাবে সমাজ-জীবনকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করবেই। এটা সুনিশ্চিত যে, ব্যক্তি-জীবনের মূল সত্যগুলি কোন ভারতীয় অর্জন করতে পারেনি। তারা ইতিহাসের সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে বিদেশী-বিজাতীয় শাসক-শোষকের দাপটে শাসন-শোষণের কাছে নতজানু হতে বাধ্য হয়ে। স্বাধীনতার চিরন্তন বোধ ও জ্ঞানগুলি ভারতীয়দের চরিত্রে সংশ্লিষ্ট হতে সুযোগ পায়নি। সেজন্য বারে বারে মহান্ দেশপ্রেমিক মনীষীদের • সর্বপ্রকার সমাজসংস্কারপ্রয়াস ও রাষ্ট্রনীতিক আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে, কিংবা আংশিক সফল হয়ে পরবর্তীকালে আবার ব্যর্থ হয়েছে। সে-দিক থেকে ভারতীয়দের আত্মবোধ-আত্মশ্লাঘার সঙ্গে দেশাত্মবোধের পূর্ণ রূপায়ণ হয়নি। ফলে এই দুরপনেয় নাগরিক যন্ত্রণা, দুর্নীতি, ব্যভিচার, অপ-সংস্কৃতি, রাহাজানি, নরহত্যা, নারী-লোলুপতা, নৃশংসতা, চুরি, ভেজাল, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং অকল্পনীয় সামাজিক ও আর্থনীতিক সংকট; তৃতীয়তঃ, এই স্বাধীনতোত্তর ভারত আপন খেয়ালে বেপরোয়া অগ্রগমন করতে গিয়ে মহান্ দেশপ্রাণ মনীষীদের, বীর শহীদদের ত্যাগ-শিক্ষা-আদর্শ-নির্দেশ-উপদেশ অগ্রাহ্য করে গেছে এবং তাঁদের সেই ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা বিস্মৃত হয়েছে। কোন স্বাধীন ভারতীয় জানলই না তার পূর্বসুরীদের ত্যাগ-তপস্যা-তিতিক্ষার কথা। তাঁদের জীবনী তাদের কাছে উপহৃত হল না। ফল হয়েছে, 'বিদেশের কুকুর ধরি, স্বদেশের ঠাকুর ফেলিয়া'; চতুর্থতঃ, 'জননী-জন্মভূমি স্বর্গ থেকেও শ্রেষ্ঠ'—এই শিক্ষাটা শুধু পুঁথিতেই পড়া গেছে। দেশের মাটি, সম্পদ, বনসম্পদ, পশুপাখী, শস্য, খনিজ ও অন্য যে-কোন দেশজ বস্তুর প্রতি অগাধ ভালোবাসা গড়ে ওঠে নি ভারতীয়দের মধ্যে। তারা যথেচ্ছ জাতীয় সম্পদ ধ্বংস করতে পারে, লুঠ করতে পারে, আত্মসাৎ করতে পারে—অথচ জাতীয় সম্পদ হিসেবে প্রাণ দিয়ে রক্ষা করতে শেখে নি একটি গাছ, একটি প্রাণীকে। তদুপরি স্বাধীনতার পরবর্তীকালেও সেই প্রকাণ্ড ভয়ংকর

প্রাগৈতিহাসিক জীব সহস্রদন্ত-জিহ্বা দিয়ে সমস্ত কিছু গ্রাস করেছে—তাঁকে বলা হয় নিষ্ঠুর শোষকসম্প্রদায়। এ শ্রেণীর লোক সর্বত্র অতি দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করছে। ব্যবসায়-রাজনীতি-শিক্ষাক্ষেত্রে ও আমলাতান্ত্রিক সমাজে আজ বেপরোয়া শোষক রক্তবীজের মতো জন্মাচ্ছে; পঞ্চমতঃ, এই হতভাগ্য ভারত আজ সম্পূর্ণতঃ যোগ্য নেতৃত্বের অস্তিত্ব খুঁজে পাচ্ছে না। পরাধীন ভারতের শেষ কয়েকটি দশকে জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষা-ধর্ম-জাতীয়তা ইত্যাদি বিকশিত হয়; কেননা বিরাট-বিরাট প্রাণপুরুষের আবির্ভাব ঘটে গিয়েছিল সেদিন। রত্ন-প্রসবিনী ভারতমাতার সুসন্তানগণ তাঁদের যোগ্যকর্ম সম্পাদন করে একে-একে লোকান্তরিত হয়ে গেলেন। অধুনাতন ভারতের সংকট-মোচনে কোন যোগ্য নেতৃত্বের জরুরী প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও আজ কোথাও কোন আলোকরেখামাত্র দেখা যাচ্ছে না।

তবুও এই দুঃসময় ও দুর্ভাগ্যের মধ্যে এই হতভাগ্য জাতি মহান্ দেশপ্রেমিক নেতাদের জীবন, কর্ম, ধর্ম, শিক্ষা ও নির্দেশ পুনরায় ধ্যান-মনন করতে পারে এবং তাঁদের পথ ধরে অনেক সংকট থেকে মুক্ত হতে পারে।

যে-কোনো স্বাধীন রাষ্ট্রের পক্ষে তার যোগ্য সন্তানদের যোগ্য মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু মহান্ দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল খণ্ডিত ভারতের ইতিহাসে কিংবা ভারতবাসীর কাছে কতটুকু স্বীকৃত? অন্যান্য জাতীয় নেতাদের মতো দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ যোগ্য মর্যাদা পাননি। ইতিহাসের পাতায় তাঁর পূর্ণ আত্মবিশ্বাস, কর্ম-তৎপরতা, অহিংস গণবিপ্লবে তাঁর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, দেশের জন্য সর্বাগ্রে ব্যারিষ্টারী বর্জন, কারাবরণ, আর্তত্রাণ ও জনসেবায় তাঁর ক্রিয়াকাণ্ড, তেজস্বিতা ও অনমনীয় ব্যক্তিত্বের কোন সংবাদই লিপিবদ্ধ হয়নি। জাতীয় আন্দোলনে বহু নেতাকে তিনি যে অতি দ্রুত অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন সে ইতিহাসও কেউ লিখে রেখে যাননি। লোক-পরম্পরায় জনৈক মনীষীর উক্তিবিশেষ প্রচলিত—

'আমি যদি আমার বিখ্যাত পত্রিকায় (সম্ভবতঃ শনিবারের চিঠি) দেশপ্রাণের কথা লিখতে শুরু করি—তা হ'লে যাঁরা কলকাতা-দিল্লীর রাজাসন আলো করে আছেন সেই সব তাবড়-তাবড় নেতাদের দেশপ্রাণের তলায় পড়ে যেতে হবে।' ভারতবর্ষের চরম সংকটের সময় গান্ধীজী তাঁর অহিংস আন্দোলনের কার্যকরী রূপায়ণ কী হবে—এই নিয়ে যখন খুবই চিন্তাগ্রস্ত, ঠিক সেই সময় গান্ধীজীর নীরব সমর্থক বীরেন্দ্রনাথ দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্রিটিশ সরকারের গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন আইন প্রবর্তনের বিরুদ্ধে একক শক্তিতেই সমগ্র মেদিনীপুর জেলায় অহিংস বিপ্লব আরম্ভ করেছিলেন। ভারতীয় নেতারা ব্যাপারটিকে গুরুত্ব না দিলেও বীরেন্দ্রনাথের সাফল্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন, বিদেশেও এই অহিংস বিপ্লবের বার্তা পৌঁছে গিয়েছিল। কাঁথির দারুয়া ময়দানে প্রায় দু' লক্ষ জনসমাবেশে স্বকণ্ঠে বজ্রনির্ঘোষে বক্তৃতা দিয়ে বীরেন্দ্রনাথ চার লক্ষ বজ্রমুষ্টি এই বলে উর্ধে আন্দোলিত করাতে পেরেছিলেন, "আমরা ট্যাক্স দেবো না, দেবো না, দেবো না।" সেদিন সেদিনের লক্ষ-লক্ষ মানুষ তাঁকে "দেশপ্রাণ" আখ্যা দিয়ে, তাঁদের মুকুটহীন সম্রাটের আসনে বসিয়েছিল—কোনো দল, পরিষদ কিংবা সরকারী অনুকম্পায় তিনি দেশপ্রাণ হননি। সেদিন মেদিনীপুরের লক্ষ-লক্ষ পুরুষ-নারী বালক-বৃদ্ধ পথে-পথে বেরিয়ে এসেছিল কণ্ঠে "বন্দে মাতরম্", হাতে তিনরঙা পতাকা নিয়ে। সরকারের এত জেলখানা ছিল না সকলকে পুরে দেবার, ছিল না এত মালখানা ক্রোকের সামগ্রী ভরে রাখবার। ব্রিটিশ সিংহ লজ্জায় অপমানে দেশপ্রাণের পায়ের কাছে বশীকৃত-বশংবদ হয়েছিল। এমন দেশপ্রেমিককেও দুষ্টচক্রের খপ্পরে পড়তে হয়েছে, দুষ্ট কপট দেশপ্রেমিকেদের চক্রান্তে অপমানিত হতে হয়েছে। মেদিনীপুরের চাষাভূষো মানুষের সহজ সারল্য ও একগুঁয়েমি তাঁর ছিল। ব্রাহ্মণ কায়স্থদের কাছে তাঁকে কখনো-কখনো মাহিষ্য বলে উপহসিত হতে হয়েছে। এই অকুতোভয় নিষ্পাপপ্রাণ মানুষটি কিন্তু জমিদার-নন্দন ও বিলাত-

ফেরত ব্যারিষ্টার হওয়া সত্ত্বেও নিজ হাতে জোড়া বলদের লাঙ্গল ধরে জনসমক্ষে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন—কলকাতা-দিল্লীতে বসে মনেপ্রাণে জনসেবক ও দেশদরদী হওয়া যায় না।

তৎকালীন অনেক দেশপ্রিয় নেতার নির্লজ্জ চরিত্র ও চালাকির ইতিহাস পরিজ্ঞাত হতে পারে দেশপ্রাণের জীবনী পাঠ করলে। সাধারণতঃ কারও মতের সঙ্গে মিল না ঘটলেই ঈর্ষা-ও-পরশ্রীকাতর বুদ্ধিজীবী বাঙালীরা বিদ্বেষ ও মনান্তর পর্যায়ে গিয়ে পরস্পর কাদা ছোঁড়াছুড়ি করে। ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধের ইতিহাসও এভাবে অনেক কলঙ্কলিপ্ত। নেতৃত্বের লড়াই, পদাধিকার, স্বার্থবুদ্ধি এবং লাভালাভের টানাপোড়েনে ভারতবর্ষ দু' টুকরো হয়ে গিয়েছে। আর সেই নেতৃত্বের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে হতভাগ্য বঙ্গ ও পাঞ্জাব প্রদেশের মানুষরা। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ তাঁর সচেতন কাণ্ডজ্ঞান নিয়ে বারংবার বলেছিলেন যে, ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কোন প্রকার মধ্যপন্থাই অচল। আবার তিনিই সন্ত্রাসবাদীদের দিকে অঙ্গুলি তুলে বলেছিলেন—ভারতের স্বাধীনতা লাভ করতে গেলে চোরাপথে কিছু ইংরেজ শাসক কিংবা নিরপরাধ কিছু ইংরেজ নরনারী হত্যা করে হবে না। তিনিই ঐতিহাসিকভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন, আসমুদ্রহিমাচল গণ-অভ্যুত্থান চাই এবং কেবলমাত্র অহিংস গণ-আন্দোলনের দ্বারাই ইংরেজকে এ-দেশ থেকে তাড়ানো যাবে। তার জন্য তিনি জাতীয় চরিত্রের সংগঠন, জাতীয় বিদ্যালয়ের মাধ্যমে চরিত্র-গঠন, দেশপ্রেম ইত্যাদি বিষয়ের আবশ্যকতার কথা বলেছিলেন। নিজের জীবনে তিনি তাঁর আদর্শ ও বাণীকে রূপ দিয়ে ভারতবাসীকে দেখিয়েছেন—বাক্‌সর্বস্ব নেতৃত্ব তাঁর নয়। গান্ধীজীর মতই ছিল 'তাঁর জীবনই তাঁর বাণী'।

দেশপ্রাণের জীবন দীর্ঘায়ত ছিল না। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে তিনি লোকান্তরিত হন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-যুদ্ধের সব থেকে বিরাট ঘটনা ১৯৪২ সালে আগষ্ট-আন্দোলন বা ভারত ছাড় আন্দোলন। তাতে তৎকালীন নেতাদের সর্বশেষ পরিচয় পরিপূর্ণতা পেয়েছে;

ইতিহাসে সমুল্লিখিত হওয়ার মতো জাতীয় সুযোগ এনে দিয়েছিল আগষ্ট-আন্দোলন। আমি এ-বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে, দেশপ্রাণের আয়ুষ্কাল অকালে নিঃশেষ না হলে তিনি জাতির কাছে নূতন এক দিগ্‌দর্শন ও দিগ্‌নিশানা দেখাতে সক্ষম হতেন ; তেমন ব্যক্তিত্ব তাঁর ছিল, তেমন কলুষকালিমামুক্ত চরিত্র তাঁর ছিল। কাজেই ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের মৃত্যুটিও দেশপ্রাণের সামগ্রিক অপরিচিতির জন্য দায়ী।

দেশপ্রাণের কর্মময় বিরাট জীবনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখিত হওয়া উচিত। প্রকৃতপক্ষে দেশপ্রাণ কেন দেশবাসীর কাছে অপরিচিত হয়ে রয়েছেন, দেশবাসীর তা জানা দরকার। তাঁর বিরাট কর্মকাণ্ডের কিছু জানলেও দেশবাসী পুলকিত হবেন। মেদিনীপুর জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের কর্মকর্তা, জেলা-বোর্ডের সভাপতি, বিভিন্ন বোমার মামলা ও চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার আসামী-পক্ষের কৌঁসুলী, জেলার বন্যাত্রাণে অগ্রণী, জেলা বিভাগ নিরোধে অগ্রণী, বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সভাপতি, ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য, তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের কোষাধ্যক্ষ, ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিরোধ আন্দোলনের একক নেতা, জাতীয় বিদ্যালয়ের স্থাপয়িতা, কলকাতা কর্পোরেশনের কাউনসিলার, বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য, পণ্ডিত মালব্যের কংগ্রেস ন্যাশন্যালিষ্ট পার্টির সংগঠক-নেতা ও বঙ্গ সরকারের বার্ষিক ৬৪ হাজার টাকার মন্ত্রীত্ব প্রত্যাখ্যানকারী দেশপ্রাণের সর্বভারতীয় নেতৃত্বের স্বরূপ তাঁর কৃতিত্বে সমুদ্‌ঘাটিত হয়ে আছে। তৎকালে অনেকেই তাঁর সমুন্নত ব্যক্তিত্বের ('Towering Personality'র) পরিচয় পেয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর ফজলুল হক বলেছিলেন—স্বাধীন দেশে জন্মালে তিনি হিটলার ও মুসোলিনীর থেকেও অনেক বেশী সম্মান পেতেন।

চির-উন্নতশির বীরেন্দ্রনাথ তাঁর মৃত্যুর পরে শব-দেহটির জন্যও উইল করে যান। উইল অনুযায়ী তাঁকে উন্নত শিরে দাহ করা হয়। তাঁর নির্দেশ ছিল—'জীবিতাবস্থায় আমি যে শির কারও নিকট অবনত করি নাই—মৃত্যুর পরেও যেন আমার সেই শির অবনত না করা হয়।

আমাকে যেন ঊর্ধ্বশিরেই দাহ করা হয়।' এমনটি পৃথিবীর কোন দেশের ইতিহাসে নেই।

এই মহান্ দেশপ্রেমিকের জন্মোৎসব পালনে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ভারত সরকার কোন ভূমিকা গ্রহণ করেননি বলে জানা গেছে। কেন করেননি—তার জন্য কোন পত্রিকাও দু'-চার কলম লিখে প্রতিবাদ জানায়নি। দেশের জন্য দেশপ্রাণ জীবন দিলেন—তাঁর যোগ্য সম্মান তাঁকে না জানানোর অপরাধ আছে অবশ্যই। যাঁরা এই মহান্ দেশপ্রেমিকের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তাঁরা জাতীয় কর্তব্য সম্পাদন করেছেন।

কাঁথি ও চণ্ডীভেটীর সভায় পশ্চিম বঙ্গের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রদ্ধেয় শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র তাঁর ভাষণে বলেছেন—ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধের প্রথম সার্থক, বাস্তববাদী ও খাঁটি রাজনীতিক নেতা মাত্র দু'জন—একজন অরবিন্দ ঘোষ, অন্যজন বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। তিনি বলেন—ইতিহাস-লেখকগণ দেশপ্রাণের প্রকৃত, সত্য ও সম্যক্ পরিচয় লিপিবদ্ধ করতে ব্যর্থ হয়ে জাতীয় ক্ষতি করে গেছেন—এর সংশোধন হওয়া আবশ্যক। শঙ্করবাবু বলেন—সম্প্রতি সর্বস্তরে জাতীয় চরিত্রে, জননেতৃত্বে, শিক্ষকতায়, আমলাতন্ত্রে, সংস্কৃতিতে ঘুণ ধরেছে। ভয়ঙ্কর ভীতিজনক চরিত্রগঠন সমস্যার মধ্যে শুদ্ধপূত নির্ভীক স্বার্থত্যাগী দেশপ্রাণের চরিত্র পঠন-পাঠন শুরু হওয়া উচিত প্রাথমিক শিক্ষাস্তর থেকে। তিনি বলেন, বাঙালীদের কাছে নেতাজী-বিবেকানন্দ কতখানি সমাদৃত, তা জানা যায় দক্ষিণ বা উত্তর ভারতে গেলে। দক্ষিণ ভারতে স্বামীজীর পথনির্দেশে জাতীয় চরিত্র গঠন আন্দোলন শুরু হয়েছে। কন্যাকুমারীর বিবেকানন্দ মন্দিরে বছরে কিছু যুবককে দেশসেবার ব্রতে দীক্ষিত করার কাজ আরম্ভ হয়েছে। সেভাবেই কাঁথি বা পশ্চিমবঙ্গের কোথাও দেশপ্রাণ ইনস্টিটিউট অব্ সোস্যাল সায়েন্স গঠন করে দেশের যুবকদের প্রকৃত সেবাব্রতে দীক্ষা দেবার চেষ্টা শুরু হোক।

চির-উন্নতশির বীরেন্দ্রনাথ

শ্রীসুশীলকুমার ধাড়া

(প্রাক্তন সংসদসদস্য)

দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল সম্পর্কে লেখার তাগিদ এসেছে, এসেছে আরো কয়েকবার। নানা কারণে লিখে উঠতে পারিনি। প্রধান কারণ হল—সেই পুরুষসিংহ বীরেন্দ্রনাথের অসাধারণ কর্মপ্রতিভা, কর্মকুশলতা ও কর্মসাফল্য সম্পর্কে কিছু প্রকাশ করার শক্তির অভাব বোধ করছিলাম। বেশ কিছুদিন ধরে মনের জোর বাড়িয়ে আমার দুর্বল লেখনী দিয়ে আজ প্রয়াস পাচ্ছি যদি কিছু প্রকাশ করতে পারি। মাঝে-মাঝে মনে প্রশ্ন জাগছে লেখার আরম্ভ তো হল, শেষ করতে পারব তো?

বীরেন্দ্রনাথের জীবনপঞ্জী দিতে মনে সাড়া পাচ্ছি না। তাই চেষ্টা করছি তাঁর চরিত্রের বিশেষ কয়েকটি দিক বিশ্লেষণ করবার জন্য।

প্রাক্‌দেশবিভাগ কালে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে বীরেন্দ্রনাথের জীবনদীপ নিভে গেছে, কাজেই সহজেই বুঝা যায়, দেশবিভাগোত্তর কালের হঠাৎ-গজিয়ে-উঠা কোন দলীয় নেতা তিনি ছিলেন না। সেদিন যাঁরা দেশমাতৃকার মুক্তিসংগ্রামে বিরোধিতা করেও আজ ঘটনাচক্রে দেশ-সেবক বলে চিহ্নিত হতে পেরেছেন, বা বড়-বড় সম্মানিত পদে আসীন হয়েছেন এবং হচ্ছেন এবং জনহিতের অনেক জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিচ্ছেন সে-গোষ্ঠীর মানুষ হিসাবে বীরেন্দ্রনাথকে চিহ্নিত করা যাবে না। দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে প্রোজ্জ্বল দীপশিখা অনির্বাণ রেখে যে কয়টি মানুষ সেদিন হিংসা বা অহিংসার কঠিন সাধনায় মগ্ন ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ তাঁদেরই অন্যতম। এরই সমর্থনে তাঁরই ভাষায় বলতে পারি—

"For whom shall I live
If not for the people ?
I am born of the people,
Trusted by the people
I will die for the people."

(যদি জনগণের কল্যাণসাধনের জন্য জীবনধারণ না করি তা হলে কার জন্য বেঁচে থাকব ? জনগণের মধ্য থেকেই আমার জন্ম, তারা আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে, আমি সেই জনগণেরই হিতের জন্য মরব)। এর ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। তাঁর মৃত্যুর চার বছর পরে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে দেশবরেণ্য নেতা পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় বলেছিলেন—"তিনি দেশপ্রেমিকদের মধ্যে রত্নস্বরূপ ছিলেন।" এই বছরই শ্রদ্ধাভাষণদান কালে ভারতের নাইটিঙ্গেল (Nightingale of India) সরোজিনী নাইডু বলেছিলেন—"যে-আদর্শকে তিনি ভালবাসতেন এবং অনুসরণ করতেন তারই জন্য নিষ্কলুষ হয়ে তিনি চিরদিন দাঁড়িয়েছিলেন। সে-আদর্শ হচ্ছে ভারতবাসীর স্বাধীনতা।"

দেশপ্রাণ শাসমলের জনপ্রিয়তা কিম্বদন্তী বলে সকলেই স্বীকার করবেন। কংগ্রেস সংগঠনের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি একক প্রচেষ্টায় তাঁর স্বীয় জেলা মেদিনীপুরে ইউনিয়ন বোর্ড চালু হতে দেননি। সে তো ১৯২১ খৃষ্টাব্দের কথা। পরে ইউনিয়ন বোর্ড বঙ্গের প্রতিটি জেলায় চালু হয় ইউনিয়নওয়ারী প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েৎ প্রথার স্থলে। কিন্তু ৩০ লক্ষ অধিবাসী-সম্বলিত বাংলার দ্বিতীয় বৃহত্তম জেলা পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুরে বৃটিশ সরকারের নূতন আইন অনুসারে এই ইউনিয়ন বোর্ড চালু হতে পারল না। এর মূলে প্রধান ও অপ্রতিহত নেতৃত্ব ছিল দেশপ্রাণের। অকুতোভয় মানুষটির জন্মলগ্নে মাতাপিতা যে নাম দিয়েছিলেন, সেই 'বীরেন্দ্রনাথ' নামের সার্থক ও সফল রূপায়ণ তিনি করে গেছেন তাঁর জীবদ্দশায়। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে,

বীরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে এই আন্দোলন ছিল পরিপূর্ণভাবে অহিংস ও নিরুপদ্রব। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর এক শ্রদ্ধার্পণ অনুষ্ঠান উপলক্ষে লণ্ডন থেকে ইণ্ডিয়া লীগের নেতা এবং বৃটিশ পার্লামেন্ট সদস্য লেনার্ড ম্যাটার্স এই মানুষটির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন—"তাঁর চরিত্রের সত্যবাদিতার জন্য সরকারী কর্মচারী ও পুলিশ অফিসাররাও তাঁকে প্রচণ্ড শ্রদ্ধা করত। শুধু তাঁর নাম শুনে মেদিনীপুরের সহস্র-সহস্র লোক জমায়েত হত, এ আমি নিজে দেখে এসেছি।" ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরের ইংরেজ জেলাশাসকের উক্তি শাসমল মশায়ের এই দিকটাই সমর্থন করে। তিনি তাঁর প্রতিবেদনে বলেছিলেন—

"The presence of Mr. Sashmal has always been a source of excitement and encouragement to the illiterate masses who look up to him for inspiration, lead and guidance...........Mr. Sashmal's presence in any part of the district at the present moment is a source of immediate danger to the public tranquility."

(নিরক্ষর জনগণের মধ্যে মিঃ শাসমলের উপস্থিতি উত্তেজনা ও উৎসাহের উৎসস্বরূপ। সেই লোকেরা তাঁর কাছ থেকে প্রেরণা, নেতৃত্ব ও পরিচালনা লাভের জন্য তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে।...... জেলার যে-কোন অংশে এই মুহূর্তে মিঃ শাসমলের উপস্থিতি সর্বসাধারণের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার পক্ষে আশু বিপজ্জনক।

সৃষ্টিকর্তা যেন কালো পাথর দিয়ে এই মানুষটিকে গড়েছিলেন নিজের কোন বিশেষ রচনার নমুনা রূপে,—তাই বোধ হয়, তিনি তাঁর হৃদয়ের নানা বৈশিষ্ট্যের আলো দিয়ে বাহিরের কালো রঙকে মহিমামণ্ডিত করে তুলেছিলেন। তাঁর অসংখ্য গোপন দান তাঁর কোমল হৃদয়ের পরিচায়ক। বহু বিপ্লবীর পক্ষ থেকে বিনা পারিশ্রমিকে তাঁদের মামলা পরিচালনা করবার অনুরোধ তাঁর কাছে আসত এবং তাঁদের

অনুরোধ শাসমল মশায় রাখতেন। নীতি ও আদর্শ অনুসরণে তিনি ছিলেন কঠোর। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বা গান্ধীজীর ভ্রান্ত পন্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতেও তিনি কুণ্ঠাবোধ করেননি। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর শহরে, বীরেন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে। তাঁর অভিভাষণে তিনি বলেছিলেন —"অবিরাম আপোষ মীমাংসার দ্বারা পৃথিবীর কোন বড় কাজ সাধিত হয় নাই, ভারতের স্বরাজ লাভও তাহার দ্বারা সংসাধিত হইবে না।" জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি তাঁর এই বিশ্বাসে সুদৃঢ় থেকেছিলেন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বীয় আদর্শ রূপায়ণের সহায়ক পন্থারূপে কেন্দ্রীয় আইন সভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে। জয়ীও হয়েছিলেন। জয়ের সংবাদ ঘোষণা করা হয় ১৯শে নভেম্বর বৈকাল ৪টায়। দেশের দুর্ভাগ্য, মেদিনীপুরের দুর্ভাগ্য যে, ঐদিন মেদিনীপুর থেকে কলিকাতা প্রত্যাবর্তনের পথে খড়গপুর ষ্টেশনে তিনি সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হন, জয় ঘোষণার মাত্র দু' ঘণ্টা পূর্বে বৈকাল ২টায়। কোন বিশেষ ষড়যন্ত্রের দূত হিসাবে দেশপ্রাণের পরিচিত জনৈক ব্যক্তি নির্বাচনে তাঁর পরাজয় হয়েছে বলে মিথ্যা সংবাদের বিষ তাঁর কানে ঢেলে দেওয়ার পরেই তিনি উক্ত রোগে আক্রান্ত হন, কেন না, তার পূর্ব থেকেই তিনি নির্বাচনের চিন্তা ও শ্রমে রক্তের চাপাধিক্যে ভুগছিলেন। আজ লজ্জায় মাথা নত হয়ে আসছে এজন্য যে, এই দূতটি মেদিনীপুরেরই অধিবাসী আর তাঁর প্রতিযোগী ছিলেন তাঁরই কাছে উপকৃত ব্যক্তি। দূতটি এই ষড়যন্ত্রের বিশেষ উদ্দেশ্য সফল করল বটে, কিন্তু মেদিনীপুর হারাল তার বীর সন্তানকে, উন্নতশির বীরেন্দ্রনাথকে। আর দেশ হারাল একজন মহান্ নেতাকে। তিনি কলিকাতায় নিজ বাড়ীতে থেকে সমস্ত রাত্রিটা শুধু এই কথা বলতে থাকেন যে, তিনি যেমন করে মেদিনীপুরে ইউনিয়ন বোর্ড প্রবর্তন রোধ করেছিলেন ঠিক তেমনি করেই তিনি দেশবাসীর সাহায্যে ভারতবর্ষে বৃটিশের সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত প্রবর্তন

রোধ করবেন। তাঁর অন্তরের দৃঢ়তাব্যঞ্জক এই শেষ চিন্তার প্রকাশ থেকে তাঁকে কেহই প্রতিনিবৃত্ত করতে পারেননি—না চিকিৎসক, না আত্মীয়-পরিজন-সহকর্মী। তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হল। তিনি বার বার রাজনীতির নীচ ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন, কিন্তু এবার এল চরম আঘাত। এখানে উল্লেখ করা উচিত যে, বীরেন্দ্রনাথ ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে বৃটেনের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরোধিতায় যে বৃহত্তর দেশসেবাব্রত আরম্ভ করেছিলেন তার ত্রিশ বছর পরে তাঁর চুয়ান্ন বছর বয়সে সেই ব্রতে পরিপূর্ণ অটলতা দেখিয়ে গিয়েছেন।

দ্রষ্টা বীরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর চব্বিশ বছর বয়সের কথা বলেছি। তারই পনর বছর পরে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে বীরেন্দ্রনাথের উনচল্লিশ বছর বয়সে বরিশালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে তিনি প্রস্তাব তুললেন যে, কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্ত শাসন আইনের (১৯১৯) বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করে দেশবাসীকে চৌকিদারী ট্যাক্স দিতে নিষেধ করা হোক। তাঁর এই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীবাজী সেটিকে কার্যে পরিণত হতে দেয়নি। তবু তিনি তাঁর স্বীয় জেলায় তা কার্যকরী করে সম্পূর্ণ সফলতা অর্জন করেছিলেন। তাই তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত ঐ জেলায় ইউনিয়ন বোর্ড প্রবর্তিত হতে পারেনি এবং তাঁর গতায়ু হওয়ার পরেই মেদিনীপুরে ইউনিয়ন বোর্ড প্রবর্তিত হতে পেরেছিল। তাঁর বাসনা ছিল বঙ্গদেশে ইউনিয়ন বোর্ড প্রবর্তন বন্ধের পর করবন্ধ আন্দোলন সফল করে তুলবেন এবং পরে সারা ভারতে করবন্ধ আন্দোলন ছড়িয়ে দেবেন। এইভাবে দেশে অর্থাৎ গ্রামবাসীদের মনে এক নূতন অহিংস ও নিরুপদ্রব বিপ্লবের জাগরণ আনবেন। তাঁর সে-স্বপ্ন আংশিক সফল হয়েছে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে 'ভারত ছাড়' সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। দ্রষ্টা দূর-সুদূর পর্যন্ত দেখেন, সেই দূরবর্তী কালে তাঁর চিন্তা রূপায়িত হয়; শিল্পী মনের গভীরতম প্রদেশে যা-কিছু দর্শন

করেন বা যে-চিত্র আঁকেন, তা তাঁর তুলিকায় ফুটে উঠে—তখনই হয় সার্থক দর্শন, সফল চিত্র। বীরেন্দ্রনাথ এইদিক থেকে একাধারে দ্রষ্টা ও শিল্পী ছিলেন। এই বিচারে তিনি ছিলেন অখণ্ড ভারতবর্ষের স্বপ্নদ্রষ্টা নায়ক—বাস্তববাদী সংগ্রামী।

দেশপ্রাণের ফুলে দেশপ্রাণের পূজা দিয়েই শেষ আঁচড় টানতে চাইছি। তাই চির-উন্নতশির বীরেন্দ্রনাথের উক্তি উদ্ধৃত করার আবশ্যকতা বোধ করছি—"জীবিতাবস্থায় আমার যে শির কাহারো নিকট নত করি নাই আমার মরণের পরেও তাহা যেন অবনত না করা হয়। আমাকে যেন উর্ধ্বশিরে দাহ করা হয়।" আজ সর্বজনবিদিত এই উক্তি মনে এলেই ভাবি মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ প্রান্তে কাঁথি মহকুমার চণ্ডীভেটির জমিদার-বাড়ীর চণ্ড ছেলে বীরেন্দ্রনাথের এই উক্তি তুলনাবিহীন। পৃথিবীর ইতিহাসে অন্য কোন ব্যক্তি কোন যুগে কখনো এমন কথা বলতে পেরেছেন বলে জানা নাই।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে যাঁর আবির্ভাব, ১৯০০ খৃষ্টাব্দে যিনি বিলাতি শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যারিষ্টার, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে যিনি বঙ্গভঙ্গের জন্য দেশসেবাব্রত আরম্ভ করলেন, ১৯১০ খৃষ্টাব্দে যিনি সফল আইনজীবী, ১৯২০ খৃষ্টাব্দ থেকে যিনি দেশমাতৃকার সেবায় নিষ্ঠার সঙ্গে ত্যাগমন্ত্রের গায়ত্রী জপ করে গেছেন, ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর জীবনাবসান হয়েছে। তিনি লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়পটে আজো সমুজ্জ্বল মূর্তিতে বিরাজমান।

শতাব্দীর আলোকে দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ

শ্রীপ্রমথনাথ পাল ('প্রভাত'-সম্পাদক)

চিরোন্নতশির বীর পুরুষসিংহ দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল মহাশয়ের জীবন, কর্ম্মধারা ও অসমাপ্ত কাজ সম্পর্কে আমাদের অন্তরে নিত্যনিয়ত যে ধারণা ও চিন্তা জাগ্রত হয় তাহার কিয়দংশ তাঁহার জন্মশতবর্ষপূর্ত্তি উপলক্ষ্যে পরিবেশন করিতেছি।

মহাপুরুষদের জীবনকথা পর্য্যালোচনা করিলে আমাদের জীবন কিছুদিনের জন্য, অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য তাঁহাদের ভাবে ভাবিত হওয়ার কথা। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিতেন—দেবদর্শনের উদ্দেশ্যে ও দেবভাবে ভাবিত হওয়ার জন্য দেবস্থানে যত বেশী যাওয়া যায় এবং সেখানে যতবেশী সময় অবস্থান করা যায় ততই মঙ্গল। সেই রূপ সাধারণ মানুষ আমাদের জীবনে মহাপুরুষদের জীবনকথা ও তাঁহাদের চিন্তাধারা যতই আলোচনা করা যাইবে উহা আমাদের পক্ষে ততই কল্যাণপ্রসূ হওয়ার সম্ভাবনা।

মহাপুরুষদের গুণাবলী নিজেদের জীবনে যতটা সম্ভব বিকশিত করিয়া তুলিবার প্রয়াস পাওয়াই সমীচীন। কিন্তু যাহা সর্বাপেক্ষা অবশ্য করণীয় তাহা হইল তাঁহাদের ভবিষ্যদ্বাণীর দিকে অতিশয় সতর্কভাবে দৃষ্টি রাখিয়া চলা এবং তাঁহাদের আরব্ধ অথচ অসমাপ্ত কাজ সম্পাদনে সচেতন ও সচেষ্ট হওয়া।

দেশপ্রাণ শাসমল ছিলেন প্রধানতঃ জনসেবক ও সেই কারণে আন্তরিকভাবে দেশসেবক। জনসেবা ও দেশসেবার একটা সহায়ক হিসাবে তিনি কোন বিশেষ রাষ্ট্রনীতিক আন্দোলন ও রাষ্ট্রনীতিক পর্য্যালোচনার সমর্থক ও পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রনীতিকে বা বর্ত্তমান যুগের সাধারণ কথায় রাজনীতিকে তাঁহার জীবনের প্রধান বা

একমাত্র বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার অকালে (১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৫৩ বৎসর বয়সে) দেহত্যাগের পরে এ-দেশের রাষ্ট্রনীতিক নেতারা সহজ সুখলাভের পথ ধরিয়া ভারতবর্ষকে তথা বঙ্গদেশকে অস্বাভাবিক ও অতি-অশোভন তৎপরতায় রসাতলে পাঠাইবার পাকা বন্দোবস্ত করিয়া ফেলেন।

আজ হইতে প্রায় পঞ্চান্ন বৎসর পূর্বে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে (বাংলা ১৩৩৩ সালে) নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল (১৮৮১-১৯৩৪ খৃঃ) ঐ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছিলেন—"অবিরাম আপোষ মীমাংসার দ্বারা পৃথিবীর কোনও বড় কাজ সাধিত হয় নাই, ভারতের স্বরাজলাভও তাহার দ্বারা সংসাধিত হইবে না।" দেশপ্রাণ যে-ভারতের কথা বলিয়াছিলেন সে-ভারত বর্ত্তমান সময়ের খণ্ডিত ভারত নয়, আর তিনি যে-স্বরাজের কথা বলিয়াছিলেন তাহা বর্ত্তমান সময়ের অর্জ্জিত নয়—প্রাপ্ত সসর্ত্ত স্বাধীনতা নয়। দেশপ্রাণ শাসমল বুঝিতেন—ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অর্থ সমগ্র ভারতবর্ষের সকল অধিবাসীর স্বাধীনতা—শুধু রাষ্ট্রনীতিক স্বাধীনতা নয়, আর্থনীতিক ও সামাজিক স্বাধীনতাও।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ভারতবাসী রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির দিক দিয়া ইংরেজ সরকার ও ইংরেজ শিল্প-ব্যবসায়মালিকদের গোলাম ছিল। আজ তাহারা দেশীয় সরকারের নামে ও মাধ্যমে বিদেশী শিল্পব্যবসায়-মালিকদের সহযোগিতায় লুণ্ঠনকারী দেশীয় শিল্পব্যবসায়মালিকদের ক্রীতদাস। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার নামে পণ্যমূল্যের ক্রমাগত বৃদ্ধি, যুদ্ধকালের মত মহার্ঘ্য ভাতার সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি, প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে পণ্যমূল্যের অতিমাত্রায় বৃদ্ধি, নির্বাচনে বিভিন্ন রাষ্ট্রনীতিক দলের ধনীনির্ধননির্বিবশেষে সকল প্রার্থীর টাকার 'হরির লুঠ', চাষাবাদকে সহরাঞ্চলের ধনী শিল্প-ব্যবসায়মালিকদের দয়া-দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভরশীলকরণ, শত-শত কোটি টাকা ব্যয়ের নদী

উপত্যকা পরিকল্পনা করিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণের নামে বন্যাসৃজন এবং কোটি-কোটি দেশবাসীর সর্বনাশ সাধন, খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির নামে বিদেশী রাসায়নিক সার আমদানি ও প্রয়োগের ব্যবস্থা দিয়া দেশী-বিদেশীব্যবসায়ীদের অর্থভাণ্ডারপূর্ত্তি এবং এদেশের খাদ্যশস্য ও অন্যান্য কৃষিজ পণ্যের অপকর্ষ সাধন, শিক্ষার অতিমাত্রায় অবনয়ন ঘটানো ও দুর্নীতি বিস্তারে সহায়তাকরণ, জমিদারি আইনের সংস্কার-সংশোধন না করিয়া, জমিদারি উচ্ছেদ করিয়া দিয়া এম্. এল. এ., এম্. পি., বড় শিল্পপতি-ব্যবসাদার প্রভৃতি নূতন ধরণের জমিদার সৃজন, পশ্চিমবঙ্গে আগত-আনীত শরণার্থীদের সহযোগিতায় এই রাজ্যে অবাঙালী শোষকদের শাসকদল গঠন ও গণতন্ত্রের নামে ধনতন্ত্রের স্থায়িত্ব বিধান ইত্যাদি ব্যাপার একটু গভীরভাবে চিন্তা করিলে দেশপ্রাণ শাসমলের কথার যথার্থতা বুঝিয়া লইতে কাহারও কিছুমাত্র অসুবিধা হইবে না।

খণ্ডিত ভারতের বর্ত্তমান দুর্গতির অন্যতম প্রধান কারণ হইল কেন্দ্রীয় ও রাজ্যিক আইনসভার সদস্যদের কাহারও-কাহারও নিজ-নিজ দলত্যাগের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহাদিগকে আইন সভার সদস্যপদ ত্যাগ করিতে বাধ্য করার জন্য কঠোর আইন দলীয় স্বার্থে প্রণয়ন-প্রয়োগ না করা।

আজ খণ্ডিত ভারতে রাষ্ট্রনীতিক দল ভাঙ্গাভাঙ্গির পালা বেশ ঘটাক্রমে চলিয়াছে। বিধানসভা ও সংসদের বহু সদস্য নির্লজ্জের মত অবাধে দল হইতে দলান্তরে গমন করেন। তাঁহারা তাঁহাদের নির্বাচনকেন্দ্রের নিকট কোন কৈফিয়ৎ দানের প্রয়োজনও বোধ করেন না। ইহার ফল যে কত কুৎসিত তাহা একটু শিক্ষালোকপ্রাপ্ত চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই উপলব্ধি করিতেছেন। কিন্তু এই কুশ্রী দলপরিবর্ত্তন একেবারে বন্ধ করিবার মত কিছুমাত্র আগ্রহ কোন রাষ্ট্রনীতিক দল, এমন কি, শাসকদলেরও নাই। আইন সভার কোন নির্বাচিত সদস্য কোন সময়ে তাঁহার নিজ দল ত্যাগ করিলে তাঁহাকে

সঙ্গে-সঙ্গেই আইন সভার সদস্যপদ ত্যাগ করিতে হয়—এই নৈতিক বোধ কোন সদস্যের, কোন রাষ্ট্রনীতিক দলের বা কোন শাসকদলের নাই। অথচ ভারতবর্ষে দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথই প্রথম তাঁহার দল—স্বরাজ্য দল—ত্যাগ করার সঙ্গে-সঙ্গে ঐ দলের মনোনয়নে প্রাপ্ত বঙ্গীয় আইনসভার সদস্যপদও ত্যাগ করেন এবং পরে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে পুনঃ নির্বাচিত হইয়া আইন সভায় প্রবেশ করেন। ইহাতে তিনি প্রমাণ করেন যে, আইন সভায় তাঁহার নির্বাচনের পক্ষে কোন রাষ্ট্রনীতিক দলের সমর্থন নিষ্প্রয়োজন। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রখর নীতিবোধের তাগিদে দল ও সদস্যপদ পরিত্যাগ করেন। তিনি অনুভব করিয়াছিলেন—উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, তাঁহার রাজনীতিক দল ত্যাগ করার কারণে, ঐ দলের মনোনয়নে তিনি যে সদস্যপদ লাভ করিয়াছিলেন তাহা নির্লজ্জের মত ধরিয়া থাকিবার তাঁহার কোন নৈতিক অধিকার নাই। দেশভাগের পর আজ চৌত্রিশ বৎসরেও দলত্যাগী আইনসভাসদস্যদের সম্বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের অবসর কাহারও হইল না—না আইনরচয়িতাদের, না জননেতা বলিয়া কথিত আত্মগর্ব্বপ্রচারকদের। কিন্তু দলত্যাগের পরেও বীরেন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত জীবনে স্বরাজ্যদলপতি চিত্তরঞ্জনের প্রতি ভদ্রলোকের সৌজন্য, শিষ্টাচার ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনে বিরত হন নাই। এমন কি, চিত্তরঞ্জন বিপদে পতিত হইয়া তাঁহার সহায়তা চাহিয়া পাঠাইলে[১] তিনি চিত্তরঞ্জনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এবং তাঁহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহার মানমর্য্যাদা রক্ষা করিতে কুণ্ঠিতও হন নাই।

দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতে বরাবরই দেশসেবা অর্থাৎ দেশবাসীর সেবা করিয়া আসিয়াছিলেন। দেশবাসীর সেবা করার অন্যতম উপায় হিসাবে সময়-সময় রাষ্ট্রনীতির আশ্রয় লইয়াছিলেন। কিন্তু আজকালের রাষ্ট্রনীতিক নেতাদের, খেলোয়াড়দের বা

(১) মৎপ্রণীত "দেশপ্রাণ শাসমল" গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ১১৮ সংখ্যক পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বাটপাড়দের মত তিনি কখনও রাষ্ট্রনীতিকে তাঁহার পেশা করিয়া তুলেন নাই।

দল ভাঙ্গার ব্যাপারে চিত্তরঞ্জনের ভূমিকা কম অশোভন ও অবাঞ্ছিত ছিল না। এ সম্পর্কে তাঁহার দলের অন্যতম কর্মকর্ত্তা অধ্যাপক হেমন্তকুমার সরকার লিখিত "দেশবন্ধু-স্মৃতি" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। হেমন্তকুমার ঐ গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন—"দেশবন্ধু ইনডিপেন্-ডেণ্ট, ন্যাশন্যালিষ্ট দল ও মুসলমান দলের কয়েকজনের সহিত রফা করিয়া তিন-তিন বার মন্ত্রিগণের বেতন-নাকচ প্রস্তাব পাশ করেন। এই অসাধ্য সাধন করিতে গিয়া তাঁহাকে কত প্রকার হীনতা স্বীকার করিতে হইয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই; অনুরোধ, উপরোধ, আবদার তো ছিলই, এমন কি, রংপুরের একজন সভ্যের পায়ের নিকটে হাত রাখিতেও দেখিয়াছি।" চিত্তরঞ্জনের এইভাবে জোড়াতালি দিয়া কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টার মধ্য দিয়া স্বরাজ্য দলে ঘুণ ধরিতে আরম্ভ করে। স্বরাজ্য দলের মধ্যে এইসব ও অন্যান্য রকমের অনেক নোংরামি লক্ষ্য করিয়াই দেশপ্রাণ শাসমল স্বরাজ্য দল ত্যাগ করিয়াছিলেন।

দেশপ্রাণ শাসমল ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচনের সময় একই সঙ্গে মেদিনীপুর জেলার কাঁথি-তমলুক কেন্দ্র ও চব্বিশ পরগণা জেলার ডায়মণ্ড হারবার কেন্দ্র হইতে সদস্যপদপ্রার্থী হইয়াছিলেন। কাজেই তাঁহাকে দুইটি কেন্দ্রে পুরাপুরি ঘুরাঘুরি করিতে এবং সেজন্য অনেক শ্রম স্বীকার করিতেও হইয়াছিল; তাহা ছাড়া স্বরাজ্য দলের সম্পাদক ও প্রধান সংগঠক হিসাবে বারাকপুর কেন্দ্রে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরোধিতা করিবার জন্যও নিজের যথেষ্ট শক্তি ব্যয় করিতে হইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ন্যাশন্যালিষ্ট পার্টির মনোনীত ও স্বরাজ্য দলের, বিশেষতঃ দলপতি চিত্তরঞ্জনের সমর্থিত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। ডাঃ রায় তখনও চিকিৎসক হিসাবে ভারতখ্যাত হইয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি চিত্তরঞ্জনের সমর্থনে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথকে পরাজিত করিয়া ভারত

বিখ্যাত হন। ডাঃ রায়কে স্বরাজ্য দলের সমর্থন জানানোটা চিত্তরঞ্জন ও স্বরাজ্য দলের সহিত বীরেন্দ্রনাথের মতান্তরের অন্যতম প্রধান কারণ। বীরেন্দ্রনাথের মনোগত কথা হইল যে, তিনি তাঁহার দলের মনোনীত প্রার্থীকে সমর্থন করিবেন, তিনি দলান্তরের প্রার্থীকে সমর্থন করিবেন না এবং তাহার জন্য শ্রমস্বীকার করিবেন না আর ভোটারদের নিকট মিথ্যা কৈফিয়ৎও দিতে পারিবেন না।

দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ যদি সে-সময় স্বরাজ্য দল ত্যাগ করিতেন তাহা হইলেও তিনি কাঁথি-তমলুক কেন্দ্র ও ডায়মণ্ড হারবার কেন্দ্র হইতে, এমন কি, প্রয়োজন হইলে বারাকপুর কেন্দ্র হইতেও তাঁহার ব্যক্তিগতপ্রভাবে আইন সভার সদস্য পদ লাভ করিতে কিছুমাত্র অসুবিধা বোধ করিতেন না। বীরেন্দ্রনাথ স্বরাজ্যদল হইতে সরিয়া দাঁড়াইলে বা সরিয়া না দাঁড়াইয়া বারাকপুর কেন্দ্র পরিভ্রমণে না গেলে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের জয় লাভেও অসুবিধা হইত না। চিত্তরঞ্জন বাড়ী-বাড়ী ঘুরিয়াও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে জয়ী করিতে পারিতেন না। সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে দাঁড়াইবার মত যোগ্য প্রার্থী হইতেন চিত্তরঞ্জন বা বীরেন্দ্রনাথ। কিন্তু চিত্তরঞ্জন সুরেন্দ্রনাথের আত্মীয়বোধে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে দাঁড়াইতে হয়ত লজ্জা পাইয়াছিলেন বা ডাঃ রায়কে জয়ী করিয়া হয়ত এক ঢিলে দুই পাখী মারিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন—(১) তাঁহার গুরু ন্যাশন্যালিষ্ট পার্টির কর্তা ব্যারিষ্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তীকে খুসী করিতে, (২) আর সেই সঙ্গে ডাঃ রায়ের মত একজন ধুরন্ধর ব্যক্তিকে তাঁহার নিজ তাঁবে রাখিতে।

দেশপ্রাণ শাসমল অর্থ বা পদের জন্য লোভাতুর হইলে রাষ্ট্রগুরুকে সমর্থন জানাইতেন আর তখন ডাঃ রায়ের তথা চিত্তরঞ্জনের পরাজয় ঘটিত এবং বঙ্গদেশের রাষ্ট্রনীতিক চেহারায় রূপান্তর ঘটিত। যাহা হউক, বঙ্গদেশের এক সময়ের মুকুটহীন রাজা সুরেন্দ্রনাথের অবদান স্মরণ করিয়া তাঁহাকে পরাজয়ের গ্লানি হইতে মুক্ত রাখিবার উদারতা

চিত্তরঞ্জন দেখাইতে পারেন নাই। সুরেন্দ্রনাথের পরাজয়ে গান্ধীজী হয়ত পুলকবোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সমগ্র কংগ্রেসী মহল উল্লাসে ফাটিয়া পড়িয়াছিল।

কোন আইন সভার সদস্যের পক্ষে দলত্যাগ করিয়া সদস্যপদ ত্যাগ না করা, এমন কি, স্বতন্ত্র সদস্যের পক্ষেও কোন দলে যোগদান করার অর্থ ভোটদাতাদিগকে উপেক্ষা করা, অপমান করা। ইহা সংশ্লিষ্ট সদস্যের পক্ষে নৈতিক অধঃপতনের পরিচায়ক। এইরূপ সদস্যকে শাস্তিদানের জন্য আইনের ব্যবস্থা না করা আইনরচয়িতাদের পক্ষে নীচ স্বার্থপরতা ও গর্হিত মনোভাবের পরিচায়ক। তাঁহারাও যে ভোটদাতাদের আদৌ হিতাকাঙ্ক্ষী নন ইহাই সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হইয়া যায়।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ ও চীন উভয় দেশই ইংরেজের অধীন ছিল। সেই বৎসরই দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ তাঁহার কৃষ্ণনগরে প্রদত্ত অভিভাষণে বলিয়াছিলেন—ঐ চীন জাগছে। উহাদের সম্বন্ধে আমাদের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

কি অখণ্ড, কি খণ্ডিত ভারতের অধিবাসী আমরা দেশপ্রাণ শাসমলের ভবিষ্যদ্বাণীতে কর্ণপাত করি নাই। ফল হইয়াছে দেশীয় সরকারের নির্বুদ্ধিতা-প্রসূত 'হিন্দী-চীনী ভাই-ভাই' বুলি কপচানো, পঞ্চশীলের মিথ্যা গুণকীর্ত্তন, তাহার অনতিবিলম্বে ভারত-চীন সংঘর্ষ এবং ভারতের প্রায় চল্লিশ হাজার বর্গ মাইল জায়গা চীনের দখলীকরণ আর মাঝে-মাঝে ক্লীবের ন্যায় ভারতের এই বলিয়া হুমকী প্রদর্শন —সূচ্যগ্র ভারতভূমি নাহি দিব মোরা; পরবর্ত্তী ও বর্ত্তমান ফল হইতেছে ভারত ও চীনের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক প্রতিনিধি চলাচল, কূটনীতিক যোগাযোগ স্থাপন, রাষ্ট্রসংঘে চীনের আসন লাভে ভারতের সহযোগিতা দান। কিন্তু ভারতের সেই প্রায় চল্লিশ হাজার বর্গ মাইল জায়গা এখনও চীনের কুক্ষিগত। দেশপ্রাণ শাসমলের ভবিষ্যদ্বাণী যথার্থ কিনা তাহা এখন চিন্তনীয়।

খণ্ডিত ভারতের নেতা নামধেয় ব্যক্তিগণ মাঝে-মাঝে আস্ফালন করেন বটে, তবে চীন জানে, যাহারা কথায়-কথায় মুখে বলে—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী, যাহারা সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে সকলে ষড়যন্ত্র করিয়া শয়তান বৃটেনের কুটিল চক্রান্তে গোপনে সহযোগিতা করিয়া স্ব-স্ব ব্যক্তিগত সুখসুবিধা লাভের জন্য সুযোগ বুঝিয়া জননীসমা জন্মভূমিকে কাটিয়া টুকরা-টুকরা করিয়া তাহাদের দেশপ্রীতি জাহির ও দেশরক্ষার আস্ফালন করিতে লজ্জাবোধ করে না, তাহাদের কাজে নয়, কথায় ঐ আস্ফালন কত অন্তঃসারশূন্য ও আন্তরিকতাবিহীন।

এই চীন সম্পর্কে তিনজন বাঙালী মনীষী বিশ্ববাসীকে, বিশেষতঃ ভারতবাসীদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন, আমরা কেহ তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করি নাই। আজ হইতে ৮৮ বৎসর পূর্ব্বে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় বসিয়া চীনের ভাবী জাগরণ, চীনাদের দ্বারা তাহাদের দেশ হইতে বৃটিশ শাসনের উৎসাদন এবং পীত জাতি কর্ত্তৃক সমগ্র এশিয়া ও আংশিক ইউরোপ অধিকার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। একদা আফিমের নেশায় মশগুল চীন আজ পূর্ণ জাগ্রত ইহা মিথ্যা নয়: চীনারা তাহাদের দেশ হইতে বৃটিশ শাসন দূরীভূত করিয়া দিয়াছে এ-কথা জলের মত স্বচ্ছ। তৃতীয় বাণী সত্যে পরিণত হওয়ার লক্ষণ আকাশে-বাতাসে পরিস্ফুট। চোখ থাকিলে দেখিতে অসুবিধা নাই।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে যখন দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ নদীয়ার কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে তাঁহার ঐতিহাসিক সভাপতির ভাষণে বলিয়াছিলেন—চীন জাগিতেছে, উহাদের সম্পর্কে আমাদের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। সত্য কথা বলিতে গেলে, তখন ত আমরা পরাধীন ছিলাম। সতর্ক হওয়ার কথা ত বৃটিশ সরকারের। কিন্তু দূরদর্শী শাসমল চীনের মতিগতি পূর্ব্বেই ভালভাবে বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই ভারতবাসীদিগকেই তিনি সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু

ভারতবাসী আমরা তাঁহার কথায় কাণ দিই নাই। এমন কি, ভারত বিভাগ ও চীনের স্বাধীনতা অর্জ্জনের পরে ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে বিপ্লবী মনীষী ৺মানবেন্দ্রনাথ রায় (পূর্বনাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য) চীনের উত্থান ও অগ্রগতির বাসনা সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সাবধানবাণী উপেক্ষা করা হইয়াছে।

এখানে আরও স্মরণীয় যে, খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জন নয়, প্রাপ্তির দুই বৎসর পরে চীন তাহার কব্জির জোরে নিঃসর্ত্ত স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছে। সে আজ বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর উন্নত শক্তিত্রয়ের অন্যতম। আর ভারত এখনও উন্নত দেশ নয়, উন্নয়নশীল। ভারতের কংগ্রেসী নেতাদের ক্লীবত্ব ও ভোগলালসার আধিক্য হেতু কাশ্মীরের একাংশে ক্ষুদ্র নবজাত পাকিস্তানের জবরদখল উপনিবেশ স্থাপন এবং তাহারই কিয়দংশ আবার পাকিস্তান কর্ত্তৃক চীনকে উপঢৌকন দান— এই সব কি মজার খেলাই না চলিতেছে!

ভারতবর্ষ বিভাগ

ভারতবর্ষ বিভাগের প্রত্যক্ষ কারণ হইল ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোন্যাল্ডের প্রবর্ত্তিত সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত এবং এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে পরাধীন ভারতবর্ষের গান্ধীজীচালিত বৃহত্তম রাষ্ট্রনীতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের ক্লীব নীতি—'না-গ্রহণ না-বর্জ্জন'। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ ঐ সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের প্রতিরোধ ও গান্ধীজীর ক্লীব নীতির বিরোধিতা করিতে গিয়া ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ২৪শা নভেম্বর অকালে মহাপ্রয়াণ করেন। বঙ্গদেশে গান্ধীজীর দল ঐ বৎসর নভেম্বর মাসের কেন্দ্রীয় আইন সভার নির্বাচনে হারিয়া গিয়াও বাঁচিয়া গেলেন; তাঁহারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া অন্তরে উল্লাস বোধ করিলেন এইজন্য যে, তাঁহাদের চরম শত্রু বীরেন্দ্রনাথ নিপাত গেলেন।

মহম্মদ আলি জিন্না প্রত্যক্ষভাবে পাকিস্তানের জনক বলিয়া কথিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ও পরোক্ষভাবে গান্ধীজীচালিত কংগ্রেসের

হিংসা ও ক্লীবত্বের সুযোগে ধূর্ত্ত বৃটেন কর্ত্তৃক পাকিস্তানের বীজ বপন এবং ঐ কংগ্রেসের সহযোগিতায় ও গান্ধীজীর পূর্ণ সমর্থনে বৃটেন কর্ত্তৃক পাকিস্তান সৃজন সম্ভব হইয়াছিল। অথচ এই গান্ধীজী বরাবরই বলিয়াছিলেন যে, তিনি বাঁচিয়া থাকিয়া ভারতবর্ষকে বিভক্ত হইতে দিবেন না। কংগ্রেসী নেতা জিন্না বরাবরই অবিভক্ত ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার সমর্থক ও সংগ্রামী ছিলেন। কিন্তু জিন্নার বুদ্ধি-বিবেচনা-নেতৃত্ব সহনে একান্ত অপারগ গান্ধীজীর হিংসাপ্রসূত ও ভণ্ডামিমিশ্রিত কূট কৌশলে জিন্না অতিমাত্র বিরক্তিভরে কংগ্রেস ত্যাগে বাধ্য হন। গান্ধীজী অতিশয় নির্লজ্জভাবে তাঁহার নিজের অহিংস-অসহযোগ নীতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে দেশবাসীর মাথায় বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাঁহার "না-গ্রহণ না-বর্জন" এই ক্লীব-নীতি নিঃসঙ্কোচে চাপাইয়া দেন আর ভারতের রাষ্ট্রনীতিক সংগ্রাম পরিচালনায় তাঁহার অক্ষমতা প্রকটভাবে প্রমাণ করেন; কিন্তু আমরণ নেতৃত্ব রক্ষার বাসনা তিনি আদৌ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। ইহার পরিণতি ভারতবর্ষের পক্ষে হৃদয়বিদারক এবং বঙ্গদেশ ও পাঞ্জাবের পক্ষে মর্মঘাতী। সজ্ঞানে দেশভাগ করা হইয়াছিল। হিন্দু-মুসলমান সমস্যার কিছুমাত্র সমাধান ত হয়ই নাই, অধিকন্তু উহা ত্রিগুণিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ তিনখণ্ডে বিভক্ত হইয়াছিল—পশ্চিম পাকিস্তান, ভারত ও পূর্ব পাকিস্তান। এই তিন খণ্ডেই হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই লোকজন ছিল। তাহা হইলে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান হইল কি করিয়া ইহা কোন সাধারণ বুদ্ধির লোকে বুঝিতে পারিবে কি? দেশভাগের পরে রক্তগঙ্গা বহাইয়া দিয়া পাকিস্তান সরকার পশ্চিম পাকিস্তানকে হিন্দু ও শিখশূন্য করিয়াছে আর ওয়াগন ভর্ত্তি করিয়া হিন্দু ও শিখদের মৃতদেহগুলি ভারতে পাঠাইয়া দিয়াছে। গান্ধীবাদী কংগ্রেসী নেতারা ন্যাকামি করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন মাত্র। তাঁহারা আর যে এক সমস্যা সৃষ্টি

করিয়া আজ প্রায় ৩৪ বৎসরেও তাহার সমাধান করিতে পারেন নাই এবং যেজন্য ভারতের শত-শত বা হাজার-হাজার কোটি টাকা ব্যয় হইতেছে তাহা হইল কাশ্মীর সমস্যা। এখন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হয়। দেশভাগের পর দেশবাসীর অন্তর হইতে দেশপ্রেম একেবারে মুছিয়া দিয়া তাহাদিগকে অতিমাত্রায় লোভাতুর ও দুর্নীতিপরায়ণ করা হইয়াছে এবং নেতাদের পাপ লুকাইবার জন্য শিক্ষাব্যবস্থাকে একেবারে ক্লেদাক্ত ও পূতিগন্ধময় করা হইয়াছে।

দুই

ভারতবর্ষ বিভাগের ফলে বাঙালী জাতির বিশেষতঃ হিন্দু বাঙালীর যে বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। পূর্বপাকিস্তানের হাজার-হাজার হিন্দু বাঙালী মুসলমানদের অত্যাচারে প্রাণ হারাইয়াছে, কেহ-কেহ প্রাণে বাঁচিয়া গৃহহারা হইয়া সর্বস্বান্ত হইয়াছে, কাহারও কাহারও পথই আবাসস্থল হইয়াছে। আবার কেহ-কেহ গৃহহীন হইয়াও উন্নতি করিয়াছে একথা অস্বীকার করা যায় না। দেশভাগে পশ্চিমবঙ্গবাসীরাও বড় কম ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। তাহাদের উপর পূর্বপাকিস্তান হইতে আগত হিন্দু বাঙালীদের আহার-বাসস্থান সংগ্রহের চাপ আসিয়া গিয়াছে এবং তাহারা রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতি সকল দিক দিয়াই বিপর্য্যস্ত হইয়াছে।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের তৎকালীন বড় লাট লর্ড কার্জ্জন বঙ্গদেশ তথা বঙ্গ প্রেসিডেন্সিকে দুই ভাগে ভাগ করেন। সেই বিভাগ রদ করিবার জন্য সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী আন্দোলন সৃষ্টি হইয়াছিল। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বঙ্গবিভাগ রদ করিবার জন্য দীর্ঘ ছয় বৎসর যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন তাহা এক কথায় বিস্ময়জনক। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে বঙ্গবিভাগ রদ হয়, কিন্তু বঙ্গ প্রেসিডেন্সির বিভাগ রদ করা সম্ভব হয় নাই। বিহার ও উড়িষ্যাকে বঙ্গ প্রেসিডেন্সি হইতে কাটিয়া স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করা হয়। পুরুলিয়া, পূর্ণিয়া,

মানভূম, সিংভূম ও ভাগলপুর এই বাংলা-ভাষা-ভাষী জেলাগুলিকে বিহারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অনুরূপভাবে বালেশ্বর জেলাকে উড়িষ্যার মধ্যে আর গোয়ালপাড়া ও কাছাড় জেলাকে আসাম প্রদেশে রাখা হয়। বঙ্গভঙ্গ রদ করিয়া বাঙালী জাতির স্বার্থ বিশেষতঃ জিদ বজায় রাখাই ছিল সুরেন্দ্রনাথের লক্ষ্য। তিনি বঙ্গদেশ হইতে অপহৃত বা লুণ্ঠিত জেলাগুলির জন্য আর আন্দোলন করিবার কথা চিন্তা করিতে উৎসাহী হন নাই। যাহা হউক, ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন স্থাপন ও প্রসারে সহায়ক এবং তাহাকে এদেশ হইতে বিতাড়নে অগ্রণী বাঙালীদের উৎসাদনের যে সুগূঢ় উদ্দেশ্যে বৃটেন বঙ্গ-প্রেসিডেন্সি ও বঙ্গদেশ ভাগ করিয়াছিল তাহা তখন ব্যর্থ হয়, কিন্তু বৃটেন তাহার উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয় নাই। সে সংগোপনে তাহার কুটিল উদ্দেশ্য সাধনের প্রচেষ্টা চালাইয়া গিয়াছিল বাঙালীবিদ্বেষী হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকের মাধ্যমে। সে জানিত যে, ভারতবর্ষ বিভাগের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিতে পারিলে, উহার অনিবার্য্য ফল হিসাবে বঙ্গদেশ ও পাঞ্জাব বিভাগের প্রশ্ন দেখা দিবে। সে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজীর পরিচালিত কংগ্রেসের ক্লীবনীতির সহায়তায় সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তরূপ কীলক ভারতবর্ষের বুকে সজোরে বসাইয়া দেয়। তাহার পরে ক্রমে-ক্রমে দেখা দেয় ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে মুসলীম লীগের পক্ষ হইতে ভারতবর্ষ ভাগ করিয়া পাকিস্তান অর্জ্জনের প্রস্তাব, রাজাগোপালাচারী (হয়ত রাজাগোপালাচারীর বকলমে সংগোপনে গান্ধীজী) কর্ত্তৃক সমগ্র পাঞ্জাব ও সমগ্র বঙ্গদেশকে পাকিস্তানে ফেলিয়া দিয়া অবশিষ্ট ভারতখণ্ডের শাসনভার কংগ্রেসের হাতে লওয়ার প্রস্তাব প্রচার, তারপর কলিকাতায় ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট মুসলীম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস পালন ও রক্তগঙ্গা সৃষ্টি এবং পরবর্ত্তী বৎসর (১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে) ভারতবর্ষ বিভাগ ও তাহার অনিবার্য্য ফল হিসাবে পাঞ্জাব ও বঙ্গদেশ বিভাগ। বৃটিশ সরকার ১৯১১ হইতে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৩৬ বৎসর বঙ্গদেশ বিভাগে ব্যর্থতার জ্বালাজনক

যে তীব্র অপমান কূটনীতিক কৌশলে সহ্য করিয়া আসিয়াছিল তাহার নির্মম প্রতিশোধ গ্রহণের সুগভীর স্পৃহা সে এবার যেন পরিপূর্ণরূপে বা তদধিক পরিমাণে চরিতার্থ করিল। ভারতবর্ষ বিভাগের জন্য তাহাদের প্রস্তাব গান্ধীজী নিজে ত সমর্থন করিলেনই, অধিকন্তু ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে তিনি কংগ্রেসকে দিয়া নিজ কূট কৌশলে গলাধঃকরণ করাইলেন। আমার মৃতদেহের উপর ভারতবর্ষ বিভক্ত হইবে অর্থাৎ আমি বাঁচিয়া থাকিতে ভারতবর্ষ ভাগ হইতে দিব না— গান্ধীজীর রাষ্ট্রনীতিক চালে সমগ্র দেশবাসীকে ধোঁকা বা ধাপ্পা দেওয়ার এই প্রতিজ্ঞা বা প্রতিশ্রুতি কোথায় ভাসিয়া গেল। "দুনিয়ায় পয়লা নম্বরের রাজনীতিক মানে পয়লা নম্বরের ধাপ্পাবাজ, তাহাদের মিথ্যা কথা বলতে বাধে না"—মহামনীষী অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকারের আমার প্রতি এই সতর্কবাণী সত্যে পরিণত হইল দেখিলাম। কংগ্রেসে ভারতবর্ষ বিভাগের প্রস্তাব ঠিক নিয়মমাফিক নয়, কংগ্রেসের নিয়মবহির্ভূতভাবে গৃহীত হওয়ার পূর্বে ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে কলিকাতা হাঙ্গামা সংঘটনের অনেক পূর্বেই বিনয়কুমার ভারতবর্ষ বিভাগ অবধারিত বুঝিয়াছিলেন।[২] ঐ হাঙ্গামার ঠিক পরেই তিনি বঙ্গদেশ বিভাগের প্রস্তাব ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাঠাইয়া দেন এবং শ্যামাপ্রসাদও তদনুযায়ী বঙ্গদেশ বিভাগের আন্দোলন আরম্ভ করেন। কংগ্রেসের ক্লীবত্বের সুযোগে বা কংগ্রেসের সহিত দীর্ঘদিনের কোন গোপন চুক্তির বলে বৃটেন সেদিন এদেশে এমন অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল যাহাতে বাঙালীই বঙ্গদেশ বিভাগের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল বৃটেনের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তখন তিনি যুবক—বয়স চব্বিশ বৎসর। উহার উনত্রিশ বৎসর পরে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে তিনি বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে

১ এ সম্পর্কে মৎপ্রণীত মহামনীষী বিনয়কুমার সরকার গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

ম্যাক্‌ডোন্যাল্‌ডের সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের এবং সেই সঙ্গে গান্ধীজীর ক্লীবনীতি (ঐ সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত না-গ্রহণ না-বর্জ্জন নীতি)-র বিরোধিতা করিতে গিয়া অকালে প্রাণ হারান। তখন তাঁহার বয়স ৫৩ বৎসর। ঐ বৎসর ১৯শে নভেম্বর তিনি বেলা প্রায় দুইটার সময় রক্তের চাপাধিক্য অবস্থায় মেদিনীপুর হইতে কলিকাতা আসিতে-ছিলেন। আসার পথে খড়গপুর ষ্টেশনে তাঁহার বিরোধী গান্ধীজীর দলের মেদিনীপুর-জেলাবাসী ও তাঁহার পরিচিত কোন লোকের দ্বারা প্রদত্ত তাঁহার কেন্দ্রীয় আইন সভার নির্বাচনদ্বন্দ্বে মিথ্যা পরাজয়ের সংবাদে হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হন। বৈকাল চারিটার সময় তাঁহার বিজয়লাভের সংবাদ ঘোষণা করা হয়। অথচ ঐ বিরোধী দলভুক্ত ব্যক্তি বীরেন্দ্রনাথকে খুঁজিয়া-খুঁজিয়া তাঁহাকে বেলা দুইটার সময় পরাজিত হওয়ার মিথ্যা সংবাদ দেয়। ঐ বিরোধী দলভুক্ত ব্যক্তিটির বীরেন্দ্রনাথের সহিত দেখা করার কোন প্রয়োজনই ছিল না। ইহাতে মনে হয় সে কোন ডাক্তারের কূটকৌশলে ও পরামর্শে এই ঘৃণ্য কাজ করিতে প্ররোচিত হইয়াছিল। ঐদিন বীরেন্দ্রনাথ তাঁহার কলিকাতার বাড়ীতে আসার পর সমস্ত রাত্রি শুধু এই কথাই বলিতে থাকেন যে, তিনি যেমন করিয়া দেশবাসীর সহযোগিতায় মেদিনীপুর জেলা হইতে ইউনিয়ন বোর্ড (বৃটিশ সরকার প্রবর্ত্তিত গ্রাম্য স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা) তুলিয়া দিয়াছিলেন ঠিক তেমনি করিয়া তিনি বঙ্গদেশে সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত প্রবর্ত্তন প্রতিরোধ করিবেন। তাঁহার চিকিৎসক, শুশ্রূষাকারী, বাড়ীর লোকজন, অন্তরঙ্গ সহকর্মী এবং একান্ত গুণগ্রাহী ব্যক্তিগণের কেহই তাঁহাকে তাঁহার চিন্তাধারা প্রকাশের প্রচেষ্টা হইতে নিবৃত্ত করিতে পারেন নাই। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি সুস্থ শরীরে জীবিত থাকিলে বঙ্গদেশে সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত রোধ করা সম্ভব হইত এবং পরবর্ত্তীকালে ভারতবর্ষ বিভাগ বা বঙ্গদেশ বিভাগ সম্ভব হইত না। বীরেন্দ্রনাথকে তাঁহার নির্বাচন দ্বন্দ্বের মিথ্যা ফল জ্ঞাপন করা তাঁহাকে চিরতরে পঙ্গু করা বা হত্যা করার সামিল।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচনে বঙ্গদেশ হইতে গান্ধীজীর মতাবলম্বী বা তাঁহার ক্লীবনীতির সমর্থক একজনও প্রার্থী জয়লাভ করিতে পারেন নাই। তাহা সত্ত্বেও গান্ধীজী সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাঁহার ক্লীবনীতি পরিত্যাগ করেন নাই। এমন কি, শুধু সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কংগ্রেসী কোন সদস্যকে আইন সভায় স্বীয় স্বতন্ত্র অভিমত প্রকাশ করিবার স্বাধীনতাও দেন নাই।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে গয়া কংগ্রেসে কংগ্রেসীদের আইনসভা, পৌরসভা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে প্রবেশের প্রস্তাব গান্ধীজী সমর্থন করেন নাই। তিনি তাঁহার অসহযোগের নীতি আঁকড়াইয়া রহিয়াছিলেন এবং আইন সভায় প্রবেশের প্রস্তাবে উষ্মা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই গান্ধীজী আবার চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর স্বরাজ্যদলকে স্বাগত জানাইয়াছিলেন এবং কংগ্রেসের কাজের বিশেষ সহায়ক বলিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। কিন্তু তিনি তাঁহার নীতির পরাজয় দেখিয়াও না-গ্রহণ না-বর্জ্জন নীতি পরিত্যাগ করিলেন না এবং ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে জওহরলাল প্রভৃতি তাঁহার একান্ত অনুগত ও বিশেষ স্নেহভাজন ব্যক্তিদিগকে প্রাদেশিক আইন সভায় প্রবেশের এবং মুসলীম লীগের সহিত কোয়ালিশন মন্ত্রীসভায় প্রবেশ করিয়া মন্ত্রীপদ গ্রহণের অনুমতি দিলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ আইন সভায় প্রবেশ ও মন্ত্রীত্বগ্রহণের উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন আর চিত্তরঞ্জন ও বীরেন্দ্রনাথ ১৯২২ খৃষ্টাব্দে আইন সভায় প্রবেশের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা গান্ধীজী বুঝিলেন ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু তিনি বঙ্গদেশে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠনের অনুমতিই দিলেন না। বঙ্গদেশ ও বাঙালী জাতিকে সংগোপনে জাহান্নামে পাঠাইবার জন্য বৃটেনের সহিত কার্য্যতঃ গান্ধীজীর কোন গোপন চুক্তি ছিল কিনা কে জানে। তবে বাঙালী নিধনের মানসিকতার দিক্ দিয়া উভয়েরই সমপথাবলম্বী থাকাই সম্ভব।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে মুসলিম লীগ ভারতবর্ষ বিভাগ করিয়া পাকিস্তান আদায় করিয়া লওয়ার জিগির তুলিয়াছিল। ধূর্ত্ত ও শয়তান বৃটেন তখন মুখ খুলে নাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে কলিকাতায় নির্লজ্জভাবে মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঘটানোর পর সে স্পষ্টভাবে হিন্দুদিগকে বুঝাইয়া দিতে চাহিল— তোমরা হিন্দু-মুসলমান এইভাবে মারামারি করিয়া লোকক্ষয় করিতেছ এবং পরেও করিতে থাকিবে। তদপেক্ষা স্বতন্ত্র থাকাই ভাল। আর উহার কয়েক মাস পরে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন সে ভারতবর্ষ বিভাগের প্রস্তাব দিল এবং অকংগ্রেসী গান্ধীজী ও তাঁহার চালিত কংগ্রেস অর্থাৎ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণ এই প্রস্তাব তৎক্ষণাৎই যেন লুফিয়া লইলেন। তাঁহাদের তৎপরতা লক্ষ্য করিয়া আমাদের এই ধারণা দৃঢ় হইয়াছিল যে, তাঁহারা ভারতবর্ষ বিভাগের বিষয়ে অনেক পূর্ব হইতে শুধু নিঃসন্দেহ নয়, প্রস্তুতই ছিলেন—কেবল বৃটেন কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ বিভাগের দিনক্ষণ ঘোষণা করিবার অপেক্ষায় ছিলেন মাত্র। কংগ্রেসী নেতারা জানিতেন যে, তাঁহারা এদেশবাসীর অজ্ঞাতসারে স্বাধীনতার নামে চুক্তিবদ্ধ শাসন-ক্ষমতা পাইতেছেন। সুচতুর বৃটিশ সরকার এখানে এক ঢিলে দুই নয়, দুইএর বেশী পাখী মারিল,—(১) ভারতবর্ষকে ভাগ করিল, (২) বঙ্গদেশকে ভাগ করিল, (৩) যুদ্ধশেষে সে ভারতবর্ষকে যে স্বাধীনতা দিবে বলিয়াছিল তাহা সর্ত্তযুক্ত করিয়া দিল, (৪) হিন্দু ও মুসলমানকে সে যে কখনও একত্র মিলিত হইতে দিতে চায় না তাহা অতি কুৎসিতভাবে ব্যক্ত করিল, (৫) হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নেতাদিগকে নিজ তাঁবে রাখিবার চেষ্টার ত্রুটি করিল না, (৬) প্রয়োজন হইলে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সংঘর্ষ বাধাইবার সুযোগ-সুবিধাও রাখিল—খণ্ডিত-ভারতের দুই পার্শ্বে পূর্ব-পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান সৃষ্টি করিয়া রাখিয়া মজা দেখিবার অপেক্ষায় রহিল, (৭) এদেশে ইংরেজের ব্যবসা-বাণিজ্য যেমন চলিত

তেমনই রহিল, অর্থাৎ তাহাদের পক্ষে এদেশীয় শিল্প-ব্যবসায়-মালিকদের সহযোগিতায় অর্থশোষণের সুবন্দোবস্তই করিয়া রাখিল।

অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, বৃটিশ সরকার ও কংগ্রেসী নেতাদের মধ্যে শাসনক্ষমতা হস্তান্তরের যে-দলিল সম্পাদিত হইয়াছিল তাহার বয়ান উভয় দেশের কয়েক ব্যক্তি ছাড়া আর কেহ জানিতে পারিল না।

মহাপুরুষদের গুণাবলী স্মরণ করিয়া তাঁহাদের স্মৃতিপূজা করা হয়। তাঁহাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের শ্রেষ্ঠ উপায় হইল তাঁহাদের ভবিষ্যদ্বাণী লক্ষ্য করিয়া চলা, তাঁহাদের অসমাপ্ত কাজ সুসম্পন্ন করা এবং তাঁহাদের কর্মাদর্শ প্রচার করা। এখন চীনের প্রতি আমাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে আর বিদেশী সরকার কর্তৃক সংঘটিত ও দেশের বিশ্বাসঘাতকদের সমর্থিত ভারতবর্ষ বিভাগ রদ করিবার জন্য উদ্যোগী হইতে হইবে। তবেই দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের যথার্থ স্মৃতিপূজা করা হইবে।

তিন

ভারতবর্ষ বিভাগে গান্ধীজীর কূটকৌশল

ভারতবর্ষ বিভাগে বৃটিশ শাসকদের কূটনীতি অবলম্বন এবং তাহাতে গান্ধীজী ও তচ্চালিত কংগ্রেসের সহযোগিতা দান সম্পর্কে পাঠক-পাঠিকাদিগকে একথা স্মরণ করাইতে চাই যে, ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজী ও তচ্চালিত কংগ্রেস বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোন্যাল্ডের সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ক্লীবের ন্যায় না-গ্রহণ না-বর্জ্জন নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের কয়েকটি প্রদেশে কংগ্রেস-মুসলীম লীগের সম্মিলিত মন্ত্রীসভাগঠনের ব্যবস্থা সমর্থন করিলেও বঙ্গদেশের ক্ষেত্রে সে-ব্যবস্থা কার্য্যকরী হইতে দেন নাই। আর এই কংগ্রেস বঙ্গদেশে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে সেন্সাস বর্জ্জনের কুৎসিত পরামর্শ দিয়া বঙ্গদেশের সর্বনাশ সাধনের পথ বহু পরিমাণে

প্রশস্ত ও সহজ করিয়া ফেলিয়াছিল। ভারতবর্ষবিভাগ তথা বঙ্গদেশ ও পাঞ্জাবের উপর খড়গাঘাত করিবার পথ সুদৃঢ় করিবার ব্যবস্থা বৃটিশ সরকার ও কংগ্রেস উভয়ে মিলিয়া বহুদিন হইতে সংগোপনে চালাইয়া যাইতেছিল। একমাত্র নিজের হাতে ভারতবর্ষের নেতৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবাব সুগুপ্ত আকাঙ্ক্ষা গান্ধীজীকে পাইয়া বসিয়াছিল। সেই কারণে তিনি মুসলিমতোষণ নীতি ও বৃটিশ সরকারের সহিত সহযোগিতার নীতি চালাইয়া গিয়াছিলেন। ভারতবাসী গান্ধীজীকে নেতা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিল, কিন্তু তাহারা বিনা প্রতিবাদে নিজেদের শিরশ্ছেদ করিবার অধিকার তাঁহার হাতে তুলিয়া দিয়াছিল একথা মনে করার কারণ নাই। ভারতবর্ষবিভাগের মত মহাগুরুত্ব-পূর্ণ ও মহাভয়ঙ্কর বৃটিশ প্রস্তাবটি গান্ধীজী কুটকৌশলে রাষ্ট্রনীতিজ্ঞের ভাষার চাতুরী খেলাইয়া কংগ্রেসকে দিয়া গিলাইয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাকে বেশ-কিছু অসত্যের আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। তিনি ঐ প্রস্তাবটি দেশবাসীকে যেন উপহার দিবার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় ওৎ পাতিয়া রহিয়াছিলেন। সমগ্র বঙ্গদেশ ও গোটা পাঞ্জাব প্রদেশকে পাকিস্তানে ফেলিয়া দিয়া ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমানসমস্যা সমাধানের জন্য শ্রীচক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারীর নামে প্রচারিত যে প্রস্তাবটি রাজাগোপালাচারী ফরমূলা (C. R. Formulae) বলিয়া পরিচিত, গান্ধীজী তাহার বিরোধিতা করেন নাই। সে-কারণে মনে হয়, ঐ প্রস্তাবে গান্ধীজীর মৌন সম্মতি ছিল অথবা উহা রাজাগোপালাচারীর সহযোগিতায় গান্ধীজীর নিজেরই রচিত। মনে হয়, গান্ধীজী ঐ ফরমূলা রাজাগোপালাচারীকে দিয়া প্রচার করাইয়া উহার সম্বন্ধে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিক্রিয়া দেখিতে চাহিয়াছিলেন।

যাহা হউক, ইহা সকলেরই জানা আছে যে, গান্ধীজী শেষ দিকে, মনে হয়, ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ হইতে কংগ্রেসের সাধারণ সদস্য ছিলেন না। হয়ত সত্যাগ্রহী (?) তিনি সুদীর্ঘ কাল পরে কংগ্রেসে অসত্যের গন্ধ পাইয়াছিলেন। কিন্তু এ-কথা ঠিক যে, তিনি একনায়ক হইয়া

বসিয়া রহিয়াছিলেন এবং সেই কারণে কংগ্রেসের প্রসাদ-প্যাটেল-নেহেরু প্রভৃতি নেতৃবর্গ তাঁহার পরামর্শ না লইয়া কোন কাজ করিতে পারিতেন না।

দেশবিভাগ ভারতবাসীর পক্ষে চরম বিপর্য্যয়। এই ধরণের চরম বিপর্য্যয় নিবারণ করিবার জন্যও গান্ধীজী নিজের কথার (অর্থাৎ প্রাণ থাকিতে ভারতবর্ষবিভাগ হইতে দিব না—কথার) বিন্দুমাত্র মর্য্যাদা ত রাখেন নাই। পক্ষান্তরে নিজের নীতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ভারতবর্ষব্যবচ্ছেদ সহজভাবে সম্পন্ন করাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার কূটকৌশল ও বহুদিনের অর্জিত প্রভাব লইয়া একটা অতিলাভজনক সুযোগ পূর্ণরূপে চরিতার্থ করিবার অত্যুগ্র বাসনায় তাঁহার পরিত্যক্ত কংগ্রেসমঞ্চে সহজভাবে উপস্থিত হইতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই, বরং অতিমাত্রায় উৎসাহবোধই করিয়াছিলেন। তিনি কূট-কৌশলীর ন্যায় ঘুরাইয়া নাক দেখাইবার মত ভারতবর্ষবিভাগে, কাজেই পাঞ্জাব ও বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডীকরণে কিভাবে সম্মতি দিয়াছিলেন, এবং সত্যের প্রতি তাঁহার আগ্রহ প্রয়োজনবোধে কিভাবে এদিক-ওদিক হইত তাহা তাঁহার সংবাদপত্রে প্রদত্ত বিবৃতি ও কংগ্রেস অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে সহজে বুঝিয়া লইতে আদৌ অসুবিধা হইবে না।

ভারতবর্ষবিভাগের বৃটিশ প্রস্তাব সম্পর্কে গান্ধীজীর জীবনীরচয়িতা ডি. জি. টেণ্ডুলকর ইংরেজীতে (Mahatma, Vol. VIII. P. 17) যাহা লিখিয়াছেন তাহা ও তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ :

Gandhi observed on June 7 (1947) that the A.-I. C. C. had appointed the Working Committee and they could not discard its decisions. Supposing the Working Committee signed a promissory note on behalf of the A -I. C. C., the A.-I. C. C. could punish it by removing it. But they can not go back upon the decision already taken by it.

Addressing the A.-I. C. C. for forty minutes (June 14, 1947) Gandhi commended the Working Committee resolution accepting the June 3 plan (partition of India by British Parliament). The A.-I. C. C., he stated, had absolute freedom to accept or to reject the resolution. The rejection or amendment of the resolution means lack of confidence in the President and Working Committee. They must naturally resign. Working Committee as their representative had accepted the plan and it was the duty of the A.-I. C. C. to stand by them.

Those who talked in terms of immediate revolution or of an upheaval in the country would achieve it by throwing out this resolution, but then he asked if they had the strength to take over reins of the Congress and the Government. "Well, I have not the strength to-day or else I would declare rebellion to-day," he added.

Gandhi emphasized that he was not pleading on behalf of the Working Committee, but the A.-I. C. C. must weigh the pros and cons of the rejection of the resolution. His views on the plan were well-known. The acceptance of the plan did not involve only the Working Committee. There are two other parties to it, namely, the British Government and the Muslim League. If at this stage the A.-I. C. C. rejected the Working Committee's decision,

what would the world think of it ? All parties have accepted it and surely it would not be proper for the Congress to go back on its word. If the A.-I. C. C. felt so strongly on this point that this plan would do a lot of injury to the country, then it could reject the plan. The consequence of such a rejection would be the finding of a new set of leaders who could constitute not only the Congress Working Committee but also take charge of the Government. It the opponents of the resolution could find such a set of leaders, the A.-I. C. C. could then reject the resolution, if it so felt. They should not forget, at the same time, that peace in the country was very essential at this juncture.

The Congress was opposed to Pakistan and he also steadfastly opposed the division of India. Yet he had come before the A.-I. C. C. to urge the acceptance of the resolution on India's division. Sometimes certain decision, however, unpalatable they might be, had to be taken.

The A.-I. C. C., he stressed, should not accept the resolution out of any false sense of moral compulsion but should do so from conviction and a sense of duty. The A.-I. C. C. could reject the resolution, if they could be certain that such a rejection would not lead to turmoil and strife in the country. The members of the Congress Work-

ing Committee were old and tried leaders who were responsible for all the achievements of the Congress hitherto and, in fact, they formed the backbone of the Congress and it would be most unwise, if not impossible, to replace them at the present juncture. All Congressmen should understand what their duty was at this time and to do it silently. Out of mistakes sometimes good emerged. Rama was exiled because of his father's mistake, but ultimately his exile resulted in the defeat of Ravan, the evil.

"I admit that whatever has been accepted is not good," he then added. "But I am confident good will certainly emerge out of it". The A.-I. C. C., he hoped was capable of extracting good out of this defective plan, as gold was extracted from dirt.

Appealing for communal unity, he said that the plan put both Hinduism and Islam on trial. Would Hindus, he asked, prove by their conduct that Jinnah Saheb was wrong ? The plan had afforded them an opportunity to disprove Jinnah Saheb's theory that the Muslims were a separate nation and were something apart from the Hindus. Even, the smallest minority should now feel secure and happy in India. A Harijan would not consider India to be truly democratic and free until untouchability was completely eradicated. He would urge that by accepting an imperfect plan they could all the same

extract good out of it and make India a land where there was no discrimination and where there were no inequalities.

অর্থাৎ গান্ধী ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুন এক বিবৃতিতে বলেন যে, নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি ওয়ার্কিং কমিটিকে নিযুক্ত করিয়াছেন এবং তাঁহারা ইহার সিদ্ধান্ত পরিহার করিতে পারেন না। যদি মনে করা যায় যে, কংগ্রেস কমিটির পক্ষ হইতে কার্য্যকরী সমিতি (ওয়ার্কিং কমিটি) কোন প্রমিসরি নোটে স্বাক্ষর করিয়াছেন, তবে কংগ্রেস কমিটি সেজন্য কার্য্যকরী সমিতিকে সরাইয়া দিয়া শাস্তি দিতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা কার্য্যকরী সমিতির ইতিমধ্যে গৃহীত সিদ্ধান্ত হইতে সরিয়া যাইতে পারেন না।

গান্ধী ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুন নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে চল্লিশ মিনিট বক্তৃতা করেন। ঐ বৎসরের ৩রা জুনের পরিকল্পনা (বৃটিশ পার্ল্যামেণ্ট কর্তৃক ভারতবিভাগ) সমর্থন করিয়া কার্য্যকরী সমিতি যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন গান্ধী তাঁহার ঐ বক্তৃতায় তাহার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন—ঐ প্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিল করিবার অবিসংবাদী ক্ষমতা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির আছে। ঐ প্রস্তাব বাতিল বা সংশোধন করার অর্থ কংগ্রেস সভাপতি ও উহার কার্য্যকরী সমিতির প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করা এবং সে-ক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে অবশ্য স্বভাবতঃই পদত্যাগ করিতে হইবে। কংগ্রেস কমিটির প্রতিনিধি হিসাবে কার্য্যকরী সমিতি ঐ পরিকল্পনা সমর্থন করিয়াছেন। এখন কংগ্রেস কমিটির কর্ত্তব্য হইল কার্য্যকরী সমিতির এ-কাজ সমর্থন করা।

যে-সকল ব্যক্তি দেশে অবিলম্বে বিপ্লব বা অভ্যুত্থান ঘটানোর দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কথা বলেন তাহারা এই প্রস্তাব বাতিল করিয়া দিয়া তাহা সম্পন্ন করিতে পারেন। কিন্তু কংগ্রেস ও সরকারের

বল্‌গা ধরিবার মত ক্ষমতা তাঁহাদের আছে কি? আজ আমার শক্তি নাই, নতুবা আমি আজ বিদ্রোহ ঘোষণা করিতাম।

গান্ধী সজোরে বলেন যে, তিনি কার্য্যকরী সমিতির পক্ষ সমর্থন করিয়া কথা বলিতেছেন না, কিন্তু কংগ্রেস কমিটিকে অবশ্যই প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করার ভাল-মন্দ বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁহার অভিমত সুবিদিত। পরিকল্পনা সমর্থনের সহিত শুধু যে কার্য্যকরী সমিতি জড়িত তাহা নয়, ইহার সহিত আরো দুইটি পক্ষ জড়িত, একটি বৃটিশ সরকার এবং আর একটি মুসলীম লীগ। যদি বর্ত্তমান অবস্থায় কংগ্রেস কমিটি কার্য্যকরী সমিতির সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করে তাহা হইলে জগদ্বাসী কি মনে করিবে? সকল পক্ষ উহা সমর্থন করিয়াছে। এবং কংগ্রেসের পক্ষে তাহার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা নিশ্চিতই সমীচীন হইবে না। এই পবিকল্পনা গ্রহণ করিলে দেশের যথেষ্ট ক্ষতি হইবে বলিয়া যদি কংগ্রেস কমিটি তীব্রভাবে মনে করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহারা ঐ পরিকল্পনা বাতিল করিয়া দিতে পারেন। এই ভাবে পরিকল্পনা বাতিল করার ফলে এমন এক দল নেতা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে যাঁহারা শুধু যে কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি গঠন করিতে পারিবেন তাহা নয়, যাঁহারা সরকার পরিচালনার ভারও লইতে পারিবেন। যদি প্রস্তাববিরোধিগণ এই ধরণের নেতা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন তাহা হইলে সে-ক্ষেত্রে কংগ্রেস কমিটি ইচ্ছা করিলে প্রস্তাব বাতিল করিতে পারেন। সেই সঙ্গে তাঁহাদের এ-কথা ভুলিয়া যাওয়া উচিত হইবে না যে, বর্ত্তমান সংকটকালে দেশে শান্তি রক্ষাই অত্যাবশ্যক।

কংগ্রেস পাকিস্তান গঠনের বিরোধী এবং তিনিও ভারতবিভাগের নিশ্চিতই বিরোধী। তাহা হইলেও তিনি ভারতবিভাগের প্রস্তাব গ্রহণ সমর্থন করিতে কংগ্রেস কমিটির সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। সময়-সময় কোন-কোন সিদ্ধান্ত যতই অপ্রীতিকর হউক না কেন, সেগুলি মানিয়া লইতে হয়।

গান্ধী জোর দিয়া বলেন—কোন প্রকার মিথ্যা নৈতিক বাধ্য-বাধকতাবোধে কংগ্রেস কমিটির পক্ষে এই প্রস্তাব সমর্থন করা উচিত হইবে না। প্রস্তাবটি যে উত্তম এবং উহা গ্রহণ করা যে কর্ত্তব্য এই বোধে সমর্থন করিতে হইবে। প্রস্তাবটি বাতিল করিলে এদেশে কোন গোলযোগ এবং সংঘর্ষ ঘটিবে না এ-বিষয়ে যদি কংগ্রেস কমিটি নিশ্চিত হইতে পারেন তবে তাঁহারা উহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন। কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির সদস্যগণ বৃদ্ধ হইয়াছেন এবং তাঁহারা অনেক খোড়-খাওয়া নেতা। তাঁহারা এ পর্য্যন্ত কংগ্রেসের সকল প্রকার কৃতিত্ব সম্ভব করিয়াছেন, বস্তুতঃ তাঁহারা কংগ্রেসের মেরুদণ্ড। বর্ত্তমান সংকটে তাঁহাদের পরিবর্ত্তে অন্য কাহাকেও বসানো অসম্ভব বলিয়া মনে না হইলেও, অত্যন্ত অবিজ্ঞোচিত কাজ বলিয়া গণ্য হইবে। বর্ত্তমান সময়ে কংগ্রেসকর্মীদের কর্ত্তব্য কি তাহা তাঁহাদিগকে বুঝিয়া দেখিতে হইবে এবং তাহা তাঁহাদিগকে নীরবে সম্পাদন করিতে হইবে। সময়-সময় ভ্রান্তি হইতেও সুফল পাওয়া যায়। রাম তাঁহার পিতার ভুলের জন্য নির্বাসিত হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার নির্বাসনের ফলে দুষ্ট রাবণের পরাজয় ঘটিয়াছিল।

যাহা কিছু সমর্থন করা হইয়াছে তাহা সব উত্তম নয় একথা তিনি স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস যে, ইহা হইতে নিশ্চিতই উত্তম ফল পাওয়া যাইবে যেমন ময়লা হইতে সোণা নিষ্কাশিত হয়, তেমনই এই ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পনা হইতে কংগ্রেস সুফল আহরণ করিতে পারিবে বলিয়া তিনি আশা প্রকাশ করেন।

সাম্প্রদায়িক ঐক্য রক্ষা সম্পর্কে আবেদন জানাইয়া গান্ধী বলেন যে, হিন্দু ধর্ম ও ইস্‌লাম ধর্ম উভয়ের নিকট এই পরিকল্পনা এক পরীক্ষাস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি প্রশ্ন করেন—হিন্দুরা কি তাহাদের আচরণের দ্বারা প্রমাণ করিয়া দিবে যে, জিন্না সাহেব ভুল করিয়াছেন। মুসলমানরা এক পৃথক জাতি এবং তাহারা হিন্দু হইতে স্বতন্ত্র জিন্নাসাহেবের এই মতবাদ মিথ্যা প্রমাণ করিবার সুযোগ এই

পরিকল্পনার ফলে হিন্দুদের নিকট আসিয়া গিয়াছে। এমন কি, এখন ক্ষুদ্রতম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ও ভারতে থাকাকেই নিরাপদ ও সুখময় বলিয়া মনে করিবে। যতদিন ভারত হইতে অস্পৃশ্যতা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত না হইবে ততদিন কোন হরিজন ভারতকে যথার্থ গণতান্ত্রিক ও স্বাধীন বলিয়া মনে করিবে না। তাহারা বলিতে থাকিবে যে, ত্রুটিযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া তাহারা ইহা হইতে সুফল লাভ করিতে পারিবে এবং ভারতকে এমন একটা দেশে পরিণত করিতে পারিবে যেখানে কোন প্রকার ভেদাভেদ ও অসাম্য থাকিবে না।

প্রথমে গান্ধীজী বলিয়াছিলেন—'এ.-আই. সি. সি.-র একমাত্র কর্ত্তব্য হইল ওয়ার্কিং কমিটিকে সমর্থন করা।' তারপর তিনি বলিয়াছিলেন—'এই পরিকল্পনাটি দেশের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিকর হইবে বলিয়া যদি এ.-আই. সি. সি. তীব্রভাবে মনে করিয়া থাকেন তবে তাঁহারা ইহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন। সেক্ষেত্রে এমন একদল নূতন নেতার সন্ধান করিতে হইবে যাঁহারা যে শুধু কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিতে পারিবেন তাহা নহে, যাঁহারা সেই সঙ্গে সরকার পরিচালনার ভারও লইতে পারিবেন। যদি প্রস্তাবের বিরোধিগণ এইরূপ একদল নেতা খুঁজিয়া পাইতে পারেন তবে এ.-আই. সি. সি. মনে করিলে প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন।' তাহা হইলে দেখা যাইতেছে—প্রস্তাব সমর্থন করা বা প্রত্যাখ্যান করা কোন নীতির ব্যাপার নয়, কোমরের জোরের ব্যাপার এবং জোর যার মুলুক তার এই নীতিই ঠিক আর ক্ষমতা অর্জ্জন করা ও উহা হাতে রাখার ব্যাপারে ন্যায়-অন্যায় বলিয়া কোন নীতিই নাই।

গান্ধীজীর উক্তি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে স্ববিরোধী। তিনি বলিয়াছিলেন কংগ্রেস পাকিস্তান গঠনের বিরোধী এবং তিনিও ভারত-বিভাগের নিশ্চিতই বিরোধী। তিনি ঐ সঙ্গে বলিয়াছিলেন—তাহা হইলেও তিনি ভারতবিভাগের প্রস্তাব গ্রহণ সমর্থন করিতে কংগ্রেস কমিটির সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন।

গান্ধীজী বলিয়াছিলেন—'কোন প্রকার মিথ্যা নৈতিক বাধ্য-বাধকতাবোধে কংগ্রেস কমিটির পক্ষে এই প্রস্তাব সমর্থন করা উচিত হইবে না। প্রস্তাবটি যে উত্তম এবং উহা গ্রহণ করা যে কর্ত্তব্য এই বোধে সমর্থন করিতে হইবে।' পর মুহূর্ত্তে তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন যে, যাহা কিছু সমর্থন করা হইয়াছে তাহা সব উত্তম নয় কিন্তু ইহা হইতে নিশ্চিতই উত্তমকাল পাওয়া যাইবে। অর্থাৎ সংসারে বাস করিয়া কোন বিষয় যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা বিচার না করিয়া শুধু তাঁহারই বিশ্বাসে সকলকে চলিতে হইবে এবং তাঁহারই বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে হইবে।

গান্ধীজী বলিয়াছিলেন—'এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলে দেশে গণ্ডগোল ও সংঘর্ষ ঘটিবে না এ-বিষয়ে যদি এ.-আই. সি. সি. নিশ্চিত হইতে পারেন তবে তাঁহারা এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন।' কিন্তু এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলে দেশে গণ্ডগোল ও সংঘর্ষ ঘটিবে না এই গ্যারান্টি গান্ধীজী ও কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি দিতে পারেন নাই। এ.-আই. সি. সি. শেষ পর্য্যন্ত কি অভিমত দিবে সে-বিষয়ে গান্ধীজীর সন্দেহ ছিল। সেজন্য তিনি বলিয়াছিলেন—'বর্ত্তমান সংকটকালে একদল নূতন নেতাকে আনিয়া বসান অসম্ভব না হইলেও বিশেষ বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না।' তাঁহার আশঙ্কা ছিল যদিও তাঁহার নেতৃত্বের প্রধানতম প্রতিদ্বন্দ্বী সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত, তবুও কংগ্রেসের নেতৃত্ব তাঁহার হাতছাড়া হইয়া যাইলেও যাইতে পারে। সেজন্য তিনি এ.-আই. সি. সি.-র সদস্যদের ভাবপ্রবণতায় আঘাত দিয়া পলাইয়া যাওয়ার পথ করিয়া রাখিয়া তাঁহার সংশয়ান্বিত ও দ্ব্যর্থবোধক ভাষণ দিয়াছিলেন। গান্ধীজীর বক্তৃতায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভ অপেক্ষা তাঁহার নিজের নেতৃত্ব রক্ষা এবং বঙ্গদেশ ও পাঞ্জাবনিধনের বাসনাটাই প্রকট হইয়াছিল।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, যে-গান্ধীজী দেশবিভাগের পূর্বে ও পরে কথায়-কথায় অনশন করিয়া তাঁহার মৃত্যুভীতি প্রদর্শন

করিতেন সেই গান্ধীজী দেশবিভাগের মত অতি গুরুত্বপূর্ণ ও অতি কুশ্রী ব্যাপারে অনশন করিবার নামটিও উচ্চারণ করেন নাই। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ১৫ই আগষ্ট যখন ভারতবর্ষ বাহ্যতঃ দুইখণ্ডে কিন্তু কার্য্যতঃ তিনখণ্ডে বিভক্ত হয় তখন গান্ধীজী কলিকাতায়। দেশবিভাগের কয়েক দিনের মধ্যে ভারত ও পাকিস্তানে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে আবার ভীষণ সংঘর্ষ বাধে। কলিকাতা সংঘর্ষের সময় গান্ধীজী জনগণকে স্বীয় মরণের ভয় দেখাইয়া আবার অনশন আরম্ভ করেন। তিনি মনে-মনে ভালভাবেই জানিতেন যে, হিন্দু-মুসলমানে সংঘর্ষ ছিল, আছে ও থাকিবে এবং এই সংঘর্ষে সাময়িক ধাপ্পার প্রলেপ দান করিয়া থাকা ছাড়া গত্যন্তর নাই। ইহা তাঁহার বাস্তবকে উপলব্ধি ও দীর্ঘকাল রাজনীতিক্ষেত্রে নেতৃত্ব করাব অভিজ্ঞতা। গান্ধীজী অনশনে প্রাণত্যাগ করিবেন—হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে এই ভয় দেখাইযা শান্ত করিয়া রাখিবার একটা দারুণ ভেষজ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, কোথায়, না, কলিকাতায়, কিন্তু দাঙ্গা লাগিয়াছিল পাকিস্তানে যেখানে গান্ধীজীর টুঁ শব্দ করিবার উপায় ছিল না। পাকিস্তানের দাঙ্গাব প্রতিক্রিয়া দেখা দিল খণ্ডিত ভারতে, বিশেষতঃ খাস রাজধানী দিল্লী সহরে। কাজেই দেশবিভাগ করিয়া কিছুমাত্র শান্তি আনয়ন সম্ভব হয় নাই। অধিকন্তু অশান্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং পাইয়াছে। তাহা ছাড়া উভয় ভাগেরই সমরশঙ্কা ও প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়বরাদ্দ সমধিক বাড়িয়া চলিয়াছে।

দেশবিভাগ সম্বন্ধে গান্ধীজী নিজের অভিমত যেভাবে প্রকাশ করেন তাহাতে তিনি এ-কথা বলিতে চান নাই বলিয়া বলিতে পারেন নাই—"আমি দেশবিভাগ চাই না, কারণ উহা ভারতবাসী ও ভারতবর্ষের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক বলিয়া অসমীচীন। প্যাটেল-নেহেরু-প্রসাদ তাঁহাদের খেয়াল-খুশীমত দেশবিভাগে বৃটিশ সরকারের শয়তানীতে সহযোগিতা করিতেছেন এবং তাঁহাদের ব্যক্তিগত প্রভাবে ওয়ার্কিং কমিটিতে দেশবিভাগের প্রস্তাব পাশ করিয়াছেন। এই

সর্বনাশা প্রস্তাব নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি সমর্থন করিবে কোন্ দুঃখে ?" ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে গান্ধীজী ভারতীয় আইন সভায় কোন কংগ্রেসী সদস্যকে স্বাধীন অভিমত প্রকাশের অধিকার দেন নাই। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে দুইটি স্বকৃত সংকট তুলিয়া ধরিয়া নিজেকে সাধু সাজাইয়া রাখিয়া কংগ্রেস কমিটির সদস্যদিগকে স্ব-স্ব অভিমত প্রকাশের যে-সুযোগ দিলেন তাহা তাঁহাদের উপর ভাষার ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়া কূটকৌশলে কার্যোদ্ধার করিবার জন্য একনায়কী কুশ্রী নির্দ্দেশ একপ্রকার অভিসন্ধিমূলকভাবে আরোপের নামান্তর মাত্র।

এখানে উল্লেখ্য যে, গান্ধীজী তাঁহার জীবিতাবস্থায় ভারতবর্ষ বিভক্ত হইতে দিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। তিনিই আবার ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ১৪ই জুন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির দিল্লী অধিবেশনে বলিয়াছিলেন—আমার আর লড়াই কবিবার শক্তি নাই, অর্থাৎ এখন ভারতবর্ষ গোটাই থাকুক বা কাটাই হউক, যেমন-তেমন ভাবে সসর্ত্ত করিয়া এদেশের স্বাধীনতা পাইলে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচি। কিন্তু গান্ধীজী দেশবিভাগের পরেও মুসলমান তোষণের কূটকৌশল ত্যাগ করেন নাই। তৎকালীন ভারত সরকার পাকিস্তানের দাবী অনুসারে তাহাকে পঞ্চান্ন কোটি টাকা দিতে স্বীকৃত না হওয়ায় গান্ধীজী ১৯৪৮ সালের ১৩ই জানুয়ারী অনশন করিয়া বসিলেন। ইহাতে ভারত সরকার অর্থাৎ গান্ধীজীর পরামর্শপুষ্ট কংগ্রেসী নেতা-শাসকগণ (প্যাটেল-প্রসাদ-নেহেরু প্রভৃতি) পাকিস্তানকে পঞ্চান্ন কোটি টাকা দিতে সম্মত হওয়ায় গান্ধীজী অনশন ভঙ্গ করেন। দেশমাতাকে টুকরা-টুকরা করিয়া ফেলার ব্যাপারে সহযোগিতা করিতে যিনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত ছিলেন না বা বেদনাবোধ করেন নাই তিনি দেশভাগের পর শরীর ও মনে এমন শক্তি লাভ করিলেন যে, দেশভাগের পাঁচ মাস পরে অনশন আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রমাণ করিতে বসিলেন

—দেশভাগের পরেও খণ্ডিত ভারতের শাসন তাঁহারই ইঙ্গিতে চলিবে। ইহা পিতামহ বা প্রপিতামহ সংসারপারে যাইতে বসিয়াও সংসারের চাবীকাঠি হাতছাড়া করিতে চান না ধরণের ব্যাপার।

গান্ধীজীর এই দেশবিভাগ রচনার সূত্রপাতেই বীরেন্দ্রনাথ উহার উৎসাদনের জন্য এবং সমগ্র ভারতবর্ষকে বাঁচাইবার জন্য স্বীয় জীবন বিসর্জ্জন দেন। খণ্ডিত ভারতে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, তপশীলী জাতি ও উপজাতি সমস্যা, শরণার্থীসমস্যা, প্রতিরক্ষাসমস্যা প্রভৃতি বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে শান্তিস্থাপন সম্পর্কে গান্ধীজীর পদ্ধতি ঠিক, না, দেশপ্রাণ শাসমলের দূরদৃষ্টি যথার্থ, ইহা চিন্তনীয়।

এখন আমরা দেশপ্রাণের অসমাপ্ত কাজের কথা বলি। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ এবং সেই সঙ্গে আমরা শুধু আমাদের নিজ-নিজ গ্রাম বা মহকুমা, জেলা বা প্রদেশের স্বাধীনতা চাহি নাই। আমরা সকলে অখণ্ড ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা চাহিয়াছিলাম বা আমাদিগকে উহার দাবী উত্থাপন করিতে শিখান হইয়াছিল। অন্ততঃ ১৯২১ খৃষ্টাব্দের নেতারা সমগ্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবার প্রচেষ্টার কথাই আমাদিগকে শুনাইয়াছিলেন। কিন্তু কার্য্যতঃ যাহা হইয়াছে তাহা সকলেই দেখিতেছেন। সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে আইন সভার সদস্য নির্বাচন, সরকারী চাকরী ও বৃত্তি লাভ প্রভৃতি যে-সব ব্যাপার দেশ বিভাগের আপাত প্রত্যক্ষ মূলীভূত কারণ সে-সব কারণের উৎসাদন করিতে গিয়া দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথের অকাল বিয়োগ ঘটিয়াছে। অখণ্ড ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক সমস্যা ছিল এক, দেশভাগের ফলে উহা তিন হইয়াছিল এবং এখন আছে দুই। খণ্ডিত ভারতে যে-সব প্রধান সমস্যা লক্ষিত হইতেছে, সেগুলির অসমাধানের ফলে এদেশের দুর্গতি যে ঘটিয়াছে এবং আরও ঘটিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কাজেই এই সমস্যা বা এগ্‌জিমা দূর করিতে গেলে শুধু বাহিরে মলম লাগাইয়া গেলে চলিবে না, তাহাতে এজ্‌মা দেখা দিবে যাহা এগজিমার চেয়েও ভয়ঙ্কর রকমের প্রাণঘাতী। এখন দেশবিভাগ রোধ করিতে না

পারিলে, কোন সমস্যারই সুসমাধান সম্ভব নয়। দেশবিভাগ রোধ করাই দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথের স্মৃতিপূজা বা স্মৃতিরক্ষার একমাত্র পন্থা। মনে রাখিতে হইবে দেবদৈত্যের পূজা একসঙ্গে হয় না।

দেশভাগের ফলে উড়িষ্যাবাসী বা বিহারবাসী ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে হিন্দু বাঙালী ও অসমীয়াগণ। পূর্ব পাকিস্তান হইতে উদ্বাস্তু আগমনের ফলে বাঙালীদের দ্বারা বাঙালীদেরই সাংস্কৃতিক, আর্থনীতিক, রাজনীতিক ও নৈতিক অবনতি ঘটিয়াছে এবং নিজেদের মধ্যে বিশেষতঃ আর্থনীতিক কারণে পারস্পরিক রেষারেষি বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সুযোগে অবাঙালীরা যে পশ্চিমবঙ্গকে একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে সেদিকে বাঙালী দলীয় নেতাদের আদৌ ভ্রূক্ষেপ নাই, আছে অবাঙালী ধনীর পদলেহনের মনোবৃত্তি। সেদিকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন প্রণম্য আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ আরও কয়েক বৎসর জীবিত থাকিয়া দেশের কল্যাণ সাধনের সুযোগ পাইলে বাঙালীর বর্ত্তমান দুর্গতি ঘটিত না বলিয়াই আমাদের দৃঢ় ধারণা।

দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথের সমুন্নত চরিত্র বুঝিতে হইলে তাঁহার আপোষহীন সংগ্রামী মনোভাব এবং সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বসময়ে উন্নত মস্তকে চলার মনোবল উপলব্ধি করিতে হইবে। দেশপ্রাণের জীবনে-মরণে উন্নতশির মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া তাঁহার অমর আত্মার উদ্দেশে এতদিন প্রাণের এই আকুতি জানাইয়া আসিতেছি—'ওহে বাংলার দুরন্ত সন্তান, আবার তুমি আসিও ফিরে'। এই আকুতি কবে বাস্তবে রূপায়িত হইবে তাহা একমাত্র মা ভবতারিণী জানেন।

চার

জাতিভেদের বৈরী জাতিবিদ্বেষের বলি

যুগ-যুগ ধরিয়া শুধু ভারতবর্ষে নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কোন-না-কোন আকারে জাতিভেদ এবং সেই হেতু জাতিবিদ্বেষ ছিল, আছে

এবং থাকিবেও। হিন্দু-মুসলমান-জৈন-খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্মের ভিত্তিতে সম্প্রদায়ভেদ, হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের ভিত্তিতে বর্ণবিভেদ, ইহার পর ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, মাহিষ্য, কায়স্থ প্রভৃতি জাতির ভিত্তিতে জাতিবৈষম্য, আবার ব্রাহ্মণদের ভিতর বৈদিক, বারেন্দ্র, রাঢ়ী প্রভৃতি শ্রেণীবিভেদ, মাহিষ্য-কায়স্থাদি জাতির মধ্যেও উত্তর রাঢ়ী ও দক্ষিণ রাঢ়ী ভেদে অনুরূপ বিভেদ ছিল এবং আছেও। খৃষ্টানদের মধ্যে রোম্যান ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্ট্যাণ্ট মতভেদ ও পারস্পরিক বিভেদবিদ্বেষ, মুসলমানদের মধ্যে সিয়া, সুন্নী প্রভৃতি মতভেদে শ্রেণীভেদ ও বিদ্বেষ ছিল এবং এখনও আছে। প্রত্যেকের প্রত্যেক বিষয়ে মতাদর্শ ভিন্ন, কাজেই বিভেদ থাকিবে, তবে বিভেদের স্বরূপ কোথাও স্পষ্ট, কোথাও অস্পষ্ট। কিন্তু বিভেদ থাকিবে বলিয়া বিদ্বেষ থাকিবে কেন? তাহার কারণ অতি হীন সাংসারিক স্বার্থবুদ্ধির প্রাবল্য ও সহনশীলতার একান্তই অভাব। মানুষ নিজেদের স্বার্থ কিছু-কিছু হ্রাস করিয়া সুখভোগের বাসনা সংযত করিয়া পারস্পরিক হিতের জন্য যথেচ্ছাচার ত্যাগ করিয়া একত্র বাস করিতে ইচ্ছুক হইয়া সমাজ-বদ্ধ হইয়াছে এবং সভ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে নয়, প্রায় সকল স্থানে মানুষের মধ্যে নানা সূত্রে যে বিদ্বেষবুদ্ধি প্রকটিত হইতেছে তাহাতে তাহাদিগকে আর সভ্য ও সমাজবদ্ধ বলিতে অন্তর ঠিক সায় দেয় না।

ভারতবর্ষে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্য্যন্ত ধর্ম্ম ও জাতি লইয়া যে কঠোরতা ছিল তাহা পাশ্চাত্য শিক্ষার অধিকতর বিস্তার এবং যান-বাহনের সুবিধা প্রসারের ফলে লোকজনের দূরদূরান্তরে গতি-বিধির সুযোগলাভ, তারপর দুই মহাসমরের আঘাতে কিছু শিথিল হইয়াছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বীরেন্দ্রনাথ যখন কলেজে উচ্চ শিক্ষার্থে কলিকাতা আসেন তখনও এই সহরে প্রচণ্ড রকমের জাতিবিদ্বেষ ছিল। কিন্তু তাঁহার মধ্যে জাতিভেদের কঠোরতা মানিয়া চলার মনোভাব

ছিল না। তিনি কলিকাতায় এক ছাত্রাবাসে কয়েকজন বিভিন্ন জাতির ছাত্রের সহিত একত্র অবস্থান করিতেন।

সে-সময় একদিন একজন তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর ছাত্রের অভিভাবক ঐ ছাত্রাবাসে আসেন। তিনি সেখানে সব শ্রেণীর ছাত্রের একত্র বসিয়া আহারের ব্যবস্থা দেখিয়া বিরক্ত হন এবং তথাকথিত উচ্চবর্ণের ছাত্রদিগকে একসঙ্গে লইয়া ছাত্রাবাস পরিত্যাগ করিবার আয়োজন করেন। ইহা শুনিয়া আবাল্য তেজস্বী বীরেন্দ্রনাথ প্রতিজ্ঞা করেন যে, তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর সকল ছাত্র ছাত্রাবাস ত্যাগ করিলেও তিনি তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের সহিত ছাত্রাবাসে বাস করিবেন এবং একসঙ্গে বসিয়াই আহার করিবেন। ইহার পর আর কেহই ছাত্রাবাস ত্যাগ করিতে সাহস করে নাই। এখানে বীরেন্দ্রনাথের জাতিভেদবিরোধী মনোভাবের যে-পরিচয় পাওয়া যায় তাহা তাঁহার জনসেবার অঙ্গ।

বীরেন্দ্রনাথের নিজ বাড়ীতে কয়েকজন বিভিন্ন শ্রেণীর দরিদ্র ছাত্র আহার ও বাসস্থান পাইয়া লেখাপড়া করিত। কিন্তু জাতিগত পার্থক্যানুসারে কখনও তাহাদের পানভোজনের ভিন্ন-ভিন্ন ব্যবস্থা ছিল না। বীরেন্দ্রনাথের মাতৃদেবী আনন্দময়ীও জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা মানিয়া চলিতেন না।

পরবর্ত্তীকালে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে বীরেন্দ্রনাথ অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। এই আন্দোলন সম্পর্কে প্রচারকার্য্যে বাহির হইয়া তাঁহাকে মফঃস্বলে কোন-কোন স্থানে তাঁহার সঙ্গী স্বেচ্ছাসেবকদের সহিত একত্র আহারাদির ব্যবস্থা করিতে হয়। এক ক্ষেত্রে আহারকালে এক মুসলমান স্বেচ্ছাসেবকের জন্য আহারের পৃথক স্থান দেখিয়া বীরেন্দ্রনাথ ক্ষুব্ধ হন এবং নিজে উঠিয়া গিয়া তাঁহাকে সস্নেহে ডাকিয়া লইয়া এক পংক্তিতে বসিয়া আহার সমাধা করেন। ইহাও তাঁহার দেশসেবা, উদারতা ও জাতিভেদবিরোধী মনোভাবের পরিচায়ক। আজ অস্পৃশ্যতা ও হয়ত অদূর ভবিষ্যতে

জাতিভেদ প্রথা ভারতীয় সমাজ হইতে উঠাইয়া দেওয়ার জন্য দেশে যে-ভাব সৃষ্টি করা হইতেছে তাহা বহুপূর্বেই বীরেন্দ্রনাথের চিন্তাধারার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। মনে হয়, এ-বিষয়ে তাঁহার মাতৃদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব তাঁহার উপর বেশী পরিমাণে পড়িয়াছিল। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় যেমন বিপদের সময় বিপন্ন ব্যক্তির জাতিকুল কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া আপনার সেবার হস্ত তাহার দিকে প্রসারিত করিয়া দিতেন বীরেন্দ্রনাথও তেমনই দেশবাসীর সেবা ও দেশোদ্ধারব্রতে কোন প্রকার সম্প্রদায় মানিতে পারিতেন না। অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ প্রথা বরাবরই তাঁহার ধারণাতীত ব্যাপার ছিল।

বিদ্যাসাগর মহাশয় ছিলেন যথার্থ অভিজাত পুরুষ। মস্তিষ্ক ও হৃদয় উভয়েরই আভিজাত্যে বীরেন্দ্রনাথ বা তাঁহার উর্দ্ধতন কয়েক পুরুষ কলিকাতা সহরের তথাকথিত অভিজাত ব্যক্তি বা পরিবারের তুলনায় কম মর্য্যাদাসম্পন্ন ছিলেন না, বরং প্রাণশক্তির নিষ্কলুষতায় সমধিকই ছিলেন। এই পুরুষসিংহ মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জন আন্দোলনে যোগদান করিয়া কিভাবে যে কলিকাতার তথাকথিত অভিজাত ব্যক্তিদের জাতিবিদ্বেষবহ্নির বলি হইয়াছিলেন তাহার দুইটি দৃষ্টান্ত এখানে উপস্থিত করিতেছি।

(১) ১৯২১ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে বীরেন্দ্রনাথ বঙ্গীয় তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। শাসমল তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হওয়ায়, সাধারণের টাকাপয়সার ব্যাপারে যাঁহারা হিসাব দেন না, তাঁহাদের মধ্যে খুব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। কারণ তাঁহারা শাসমলের কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় পাইয়াছিলেন। কংগ্রেসের পূর্ববর্ত্তী বিশেষ অধিবেশনের সময় শাসমল খাদ্যসরবরাহ বিভাগের সম্পাদক থাকাকালে বহু ফাঁকি ধরিতে পারিয়াছিলেন এবং ফাঁকিদারদের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের উচ্চ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আপনার কঠোর মন্তব্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বেশীর ভাগই প্রাক্তন

রাজবন্দী (ex-detenue)। ইঁহারা আরও অনেক পরে শাসমলের বিরুদ্ধে চিত্তরঞ্জনের মন বিষাক্ত করিতে আরম্ভ করেন।

ইহার কিছুদিন পরে একদিন চিত্তরঞ্জন বীরেন্দ্রনাথকে বলেন— পঁচিশ লক্ষ টাকার ফাণ্ডে তোমার একার থাকা উচিত নয়। কলিকাতার একজন কায়স্থ, একজন মারোয়াড়ী ও একজন মুসলমান থাকা ভাল। দেশপ্রাণ শাসমল কায়স্থ বা মারোয়াড়ী বা মুসলমান ছিলেন না। কাজেই তিনি চিত্তরঞ্জনের ইঙ্গিত বুঝিয়া তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের কোষাধ্যক্ষের পদ পরিত্যাগ করেন। পরে কায়স্থ নির্ম্মল চন্দ্র কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এই সময় হইতে শাসমলের উপর অবিচার চলিতে থাকে। শাসমলের কার্য্যের ত্রুটি না থাকা সত্ত্বেও তাঁহার স্পষ্টবাদিতা সহ্য করিতে না পারিয়া ও জাতিবিদ্বেষের আগুনে জ্বলিয়া উদারচিত্ত চিত্তরঞ্জনের মনকে তিক্ত করিয়া যাঁহারা শাসমলের উপর অবিচার আরম্ভ করেন তাঁহারা পরে ক্রমশঃ প্রতিপত্তি লাভ করিয়া শুধু শাসমলের জীবনকে বিপর্য্যস্ত করেন নাই, তাঁহারা সেই সঙ্গে স্বাধীনতা অর্জ্জন আন্দোলনে শাসমলের মত মহান কর্মপ্রতিভা হইতে দেশকেও বঞ্চিত করিয়াছিলেন।

(২) ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের নূতন সংশোধন অনুসারে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কলিকাতা করপোরেশান নাম হয় এবং উহার চেয়ারম্যানের পদের পরিবর্ত্তে নূতন মেয়রের পদ সৃষ্টি হয়। চিত্তরঞ্জন ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ১৬ই এপ্রিল মেয়র নির্বাচিত হন। তারপর তিনি বীরেন্দ্রনাথকে করপোরেশনের প্রধান কর্মকর্ত্তা (চীফ্ এগ্‌জিকিউটিভ অফিসার) পদে নিযুক্ত করিবেন বলিয়া তাঁহাকে প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু ভিতরে-ভিতরে কেহ-কেহ শাসমল 'মাহিষ্য' বলিয়া আপত্তি তুলিতে থাকেন এবং চিত্তরঞ্জনের নিকট সুভাষচন্দ্র বসুর নাম উত্থাপন করিয়া তাঁহাকে ঐ পদে নিযুক্ত করিতে অনুরোধ করেন। চিত্তরঞ্জনও সুভাষচন্দ্রকে ঐ পদে নিযুক্ত করিতে সঙ্কল্প করেন।

কলিকাতা করপোরেশানের প্রধান কর্মকর্তা নিয়োগের কয়েকদিন পূর্বে শাসমল চিত্তরঞ্জনকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যকরী সভার এক অধিবেশনে এ-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। তখন চিত্তরঞ্জন কিছু না বলিয়া চলিয়া যান। ইহার দিন কয়েক পরে এক সন্ধ্যায় বীরেন্দ্রনাথের বাসায় তাঁহার পরিচিত দুই-তিনটি যুবক উপস্থিত হইয়া বলে, "মশায়, আমরা একটা প্রস্তাব নিয়ে আপনার কাছে এসেছি, যদি একটু শোনেন, ভাল হয়।' শাসমল পূর্ব হইতেই ঐ যুবকদের মতিগতি জানিতেন। তিনি তখন বলেন,—"তোমরা, যে-প্রস্তাব উত্থাপন করতে চাচ্ছ তা আমার কাছে গ্রহণীয় নয় জেনেও এসেছ। তবে বলতে চাও বল।" তখন জনৈক যুবক বলে—"কলিকাতা করপোরেশনের চীফের পোষ্ট নিয়ে গোলমাল চলেছে। তা' আপনি শুনেছেন। আমাদের দলের একজন মাসিক পাঁচশত টাকা নিয়ে বাকী টাকাটা আমাদের দলের ফাণ্ডে দিতে রাজী আছেন। এখন আপনি যদি মাসে পাঁচশত টাকা নিয়ে বাকীটা আমাদের ফাণ্ডে দিতে রাজী হন তা হলে আমরা দেশবন্ধুর কাছে আপনার নাম প্রস্তাব করি।" ইহাতে বীরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং সহসা দাঁড়াইয়া উঠিয়া যুবকদিগকে কিল-চড় মারিয়া গলা ধাক্কা দিয়া তাঁহার বাসা হইতে তাড়াইয়া দেন।

এই ঘটনার পরদিন বীরেন্দ্রনাথ চিত্তরঞ্জনের সহিত দেখা করিয়া বলেন—"আপনি বিপ্লবী (revolutionary)-দিগকে কংগ্রেসে আসিতে দিতেছেন। তাহারা কংগ্রেসের মধ্যে থাকিয়া দলের কাজ করিতেছে।" চিত্তরঞ্জন বলেন, "তাহারা চারি আনা চাঁদা দিয়াছে, সুতরাং তাহারা থাকিবে।" তখন শাসমল বলেন, "ইহার জন্য যদি কংগ্রেস কখনও জাহান্নামে যায় তখন আপনাকে দায়ী হইতে হইবে।" ইহার পর শাসমল চলিয়া যান।

সেদিন রাত্রে যুবকগণ বীরেন্দ্রনাথকে যে-কথা বলিয়াছিল তাহা তিনি শ্রীঅনিলবরণ রায় প্রভৃতি সহকর্মীদিগকে জানান। অনিল-বাবু

বলেন, 'এখানে (অর্থাৎ কংগ্রেসে) merit অর্থাৎ গুণের স্থান নাই।' তিনি আরও বলেন যে, প্রকৃত ব্যাপার তিনি অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন। অনিল-বাবু অনুসন্ধানের পর বীরেন্দ্রনাথকে জানান যে, ৬।৭টি দল সুভাষ-বাবুকে দাঁড় করাইয়াছে। অনিল-বাবু সকল দলকে শাসমলের অনুকূলে রাজী করাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি একটি দলকে রাজী করাইতে পারেন নাই। তাহা revolutionary দল।

এই সব ব্যাপার চিত্তরঞ্জনের কর্ণগোচর হয় এবং তিনি আবুল কালাম আজাদকে দিয়া শাসমলকে ডাকিয়া পাঠান। শাসমল চিত্তরঞ্জনের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বলেন, 'তুমি চীফ এগ্‌জিকিউটিভ অফিসার হবে ঠিক হয়ে রয়েছে। তুমি সন্দেহ করছ কেন?' তখন শাসমল বলেন, 'বড়-বড় কাউনসিলার আমাকে বলেছেন, আপনি সুভাষ-বাবুকে ভোট দিবার জন্য তাঁদিগকে অনুরোধ করছেন।' চিত্তরঞ্জন বলেন, 'উহা মিথ্যা কথা।' তখন বীরেন্দ্রনাথ বলেন, 'তা'হলে আপনি পার্টি মিটিং-এ (অর্থাৎ স্বরাজ্য দলের সভায়) বলে' দেবেন যে, আপনি সুভাষ-বাবুর পক্ষ অবলম্বন করেন না। তারপর যা হয় হবে।' এই প্রস্তাবে চিত্তরঞ্জন সম্মত হন।

ইহার দুই-একদিন পরে নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্রের বাড়ীতে স্বরাজ্য দলের সভা হয়, তাহাতে রামতারণ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা করপোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার পদের জন্য শাসমলের নাম প্রস্তাব করেন এবং নসিম আলি (পরে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি) তাহা সমর্থন করেন। চিত্তরঞ্জনের যে statement (অর্থাৎ বিবৃতি) দেওয়ার কথা ছিল তাহা তিনি দেন নাই। ভোটের সময় বীরেন্দ্রনাথের নাম টিকিল না। সুভাষ-বাবু স্বরাজ্য দলের পক্ষ হইতে প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা পদে মনোনীত হইলেন। ইহার পর ২৪শা এপ্রিল করপোরেশনের সভায় মাসিক পনর শত টাকা বেতনে তিনি ঐ পদে নিযুক্ত হন।

চিত্তরঞ্জনের অন্যতম প্রিয় শিষ্য ও ভক্ত হেমন্তকুমার সরকার তাঁহার 'দেশবন্ধু-স্মৃতি' পুস্তকের ৫০ তম পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—'সেবার

নদীয়া জেলার ভেড়ামারা গ্রামে নদীয়া জেলা প্রজা কনফারেন্সের অধিবেশন ছিল। আমি সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলাম। স্বয়ং দেশবন্ধু সে-সভায় উপস্থিত হওয়ায় বিস্তর জনসমাগম হইয়াছিল।

"কলিকাতা হইতে আসিবার আগে শ্রীযুক্ত বীরেন শাসমল আমায় বলিয়াছিলেন যে, করপোরেশনের ঐ পদে দেশবন্ধু যদি তাঁহাকে মনোনীত করেন তাহা হইলে তিনি মাসিক পাঁচ শত টাকা মাত্র য়্যালাউয়েন্স লইয়া কাজ করিতে রাজী আছেন। আমি দেশবন্ধুকে শ্রীযুক্ত শাসমলের কথা জানাইলাম। দেশবন্ধু স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন—"বীরেন দরখাস্ত করলে আমি বাঁচি। বীরেনের নাম প্রস্তাব হলে অন্যদের আমি সাফ জবাব দিতে পারি।" ভেড়ামারা হইতে ফিরিয়া আমি শ্রীযুক্ত শাসমলকে দেশবন্ধুর মনোভাব জানাইলাম। কিন্তু এই কথা প্রচার হইবামাত্র কলিকাতার দলের মধ্যে ভীষণ ষড়যন্ত্র সুরু হইয়া গেল। 'মেদিনীপুরের ক্যাওট' এসে কলকাতায় রাজত্ব করবে?—এ-কথাটাও দলের একজন পাণ্ডার মুখে শুনা গেল। শাসমলকে হঠাইতে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্রকে নানা ফিকিরে খাড়া করা হইল। পার্টিতে ভোটের সময় শাসমলের নাম টিকিল না।" দেশবন্ধুও দলভঙ্গের ভয়ে ও নিজের নেতৃত্ব হারাইবার আশঙ্কায় একসঙ্গে কংগ্রেসী ও বিপ্লবীদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে আর জোর করিতে পারিলেন না; জাতিবিদ্বেষের বৈজয়ন্তী উড্ডীন রাখিতে নিজেকে নীরব রাখিয়া নীতি ও প্রতিশ্রুতি বিসর্জ্জন দিয়া খাটো করিতে দ্বিধা করিলেন না। দেশবন্ধু নিজে বৈদ্যবংশসম্ভূত।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ১লা মে কলিকাতার ক্যাপিট্যাল (Capital) পত্রিকা কলিকাতা করপোরেশনের চীফ এগজিকিউটিভ অফিসারের পদে স্বরাজ্যদলের মনোনীত ব্যক্তি নিয়োগ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—

'On the command of Mr. C. R. Das, the Mayor, the Swarajists in the Calcutta Corporation at the meeting last week elected Mr. Subhaschandra Bose,

his well-behaved disciple, as Chief Executive Officer on Rs. 1500 per mensem. There have been many farces played in the hall of Calcutta Corporation but none so droll as this. It had been originally decided by the Swarajist caucus to reward the services of Mr. Sasmal with the glittering job of Chief Executive Officer. Later on it was discoursed that his preferment would offend the 'Kayastha clique, a risk Boss-Dass could not afford to run. So the strong man of Midnapore was pushed out of the way to make room for the Ex-Civil Servant who boldly left the celestials to become a non-co-operator.

চিত্তরঞ্জন বীরেন্দ্রনাথকে ডাকিয়া একটা মুখের কথা বলিতে পারিলেন না। তিনি বীরেন্দ্রনাথকে একখানি পত্র লিখিয়া করপোরেশনের চীফ এগ্‌জিকিউটিভ অফিসারের পদে সুভাষচন্দ্রের নিয়োগের কথা জানাইয়া দিলেন। তিনি যে বীরেন্দ্রনাথের সহিত আর একযোগে কাজ করিতে পারেন না বা তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে পারেন না, এই কথাটাই যেন দেশবন্ধুর পত্র লেখার রীতির মধ্য দিয়া ফুটিয়া বাহির হইল। চিত্তরঞ্জন তথা স্বরাজ্য দলের উপর কোন্ দুষ্ট প্রভাব বিস্তৃত হইল? দলে নিজের নেতৃত্বরক্ষাবাসনা ও জাতি-বিদ্বেষের প্রাধান্য।

বীরেন্দ্রনাথ এই জন্য ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হইলেন যে, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁহাকে জাতিতে ছোট ধরিয়া ও মতভেদের জন্য দলাদলি করিয়া তাড়াইয়া দিল। সুভাষচন্দ্র সরকারী চাকুরীতে থাকিলে তৎকালে তাঁহার পক্ষে মাত্র সাতাইশ বৎসর বয়সে পনর শত টাকা বেতনের চাকরিতে উন্নীত হওয়া সম্ভব হইত বলিয়া মনে হয় না।

দলীয় চক্রান্তে ও সেইসঙ্গে গূঢ় স্বার্থে চীফ এগ্‌জিকিউটিভ অফিসার পদে নিযুক্ত হওয়ায় তাঁহার পক্ষে তাহা সম্ভব হইল। আর করপোরেশনের চাকরি আধা-সরকারি জানিয়াও সুভাষচন্দ্র তাহা দলীয় স্বার্থে লুফিয়া লইতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিলেন না, এমন কি, শাসমলের সহিত দেখা করিয়া কোন-কিছু আলোচনা করিবার মত সৌজন্য প্রদর্শনেও কুণ্ঠিত হইলেন। এখানে তাঁহাকেও যেন জাতিবিদ্বেষের চক্রান্ত ও দলীয় স্বার্থ গ্রাস করিয়া ফেলিল।

জীবনপ্রভাতে কলেজের ছাত্রাবস্থায় যে বীরেন্দ্রনাথ জাতিভেদের বিরোধিতা করিয়াছিলেন, যৌবনে দেশসেবাযজ্ঞে যোগদান করিয়া যে-বীরেন্দ্রনাথ তাঁহার মন হইতে সহজেই জাতিভেদ ও ধর্মভেদ সরাইয়া দিয়াছিলেন সেই বীরেন্দ্রনাথ উহার অব্যবহিত পরেই বাঙালী হিন্দুদের জাতিবিদ্বেষের বলি হইলেন। স্বার্থবুদ্ধি ও রাজনীতির কুচক্র মতলববাজ ব্যক্তিদিগকে কোথায় লইয়া যায় দেখুন। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিবার মত একটি মজার কথা এই যে, তথাকথিত উচ্চজাতির কর্ত্তারা ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের লোকগণনার পরেই শাসমলের জাতিকে নিজেদের জাতি পর্য্যায়ে বেমালুম বিনা অভিযোগে বিনা ওজর-আপত্তিতে মিশাইয়া লইলেন। কারণ সেখানেও উৎকট স্বার্থবুদ্ধি ও শাসমলভীতি বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু শাসমল কখনও অপরের ভীতি উৎপাদনের মত কোন ব্যবস্থা বা কাজ করেন নাই। সে-সময় পাছে শাসমলের নেতৃত্বে বা ইঙ্গিতে সমস্ত অনুন্নত শ্রেণী স্বতন্ত্র দল গঠন করেন এবং আইন সভা, সরকারী চাকুরী, আধা-সরকারী চাকুরী ক্ষেত্রে নিজেদের সংখ্যানুপাতিক আসন ও পদ দাবী করেন সেই আশঙ্কায় তাঁহারা এক বড় চাল চালিলেন বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন।

বীরেন্দ্রনাথ জাতিবিদ্বেষের বলি হইলেন ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে। তার পর সাতান্ন বৎসর অতীত হইয়াছে। এখনও জাতিভেদ ও জাতিবিদ্বেষ আশানুরূপ হ্রাস পায় নাই। সমগ্র পূর্ব ভারতে আজ যে দাবানল

জ্বলিয়া উঠিয়াছে তাহার অন্যতম প্রধান কারণ জাতিবিদ্বেষ হেতু তথাকথিত নিম্নজাতির লোকদের প্রতি কুৎসিত উপেক্ষা।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ বিভাগের পূর্বে এদেশের হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃষ্টানধর্মনির্বিশেষে সকল অধিবাসীই এই একই দেশের নাগরিক ছিল। ধর্মনির্বিশেষে সকল চাষী একই মাঠে চাষাবাদ করিত, একই পুকুরের জল পান করিত, একই কলিকায় ধূমপান করিত, একের বিপদে অপরে সাহায্য করিতে ছুটিয়া আসিত, হিন্দুর ঘরে আগুন লাগিলে মুসলমানও সেই আগুন নিভাইবার জন্য জল ঢালিত, মুসলমানের ঘরে আগুন লাগিলে হিন্দুও সেই আগুন নিভাইতে জল ঢালিত। হিন্দু ও মুসলমান একই কলকারখানায় একই সঙ্গে কাজ করিত, একই দোকানে বসিয়া এক সঙ্গে চা পান করিত। একই গাছতলায় বসিয়া বিশ্রাম করিত, গল্প করিত, একই হাটে পণ্য ক্রয় করিত, বিবাহাদি উৎসবে পরস্পরের যাতায়াত ছিল। কখনও-কখনও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে কলহ হইত না এমন নয়। সে ত হিন্দু ও হিন্দুর মধ্যে এবং মুসলমান ও মুসলমানের মধ্যেও চলিত। ধর্মরক্ষার অজুহাতে এ দেশের হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিভেদ-বিদ্বেষের উগ্রতা মোঘল রাজত্বের শেষ ভাগ হইতে ইংরেজ রাজত্বের প্রথমার্দ্ধ ভাগ পর্য্যন্ত স্তিমিত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সেই বিভেদ-বিদ্বেষকে ইংরেজ সরকার নিজ স্বার্থরক্ষার জন্য পুনরায় খুঁচাইয়া তুলে এবং বাঙালী হিন্দু আর পাঞ্জাবী হিন্দু ও শিখের উপর আক্রোশ সাধনের জন্য উহাকে একেবারে উদগ্র করিয়া ফেলে। ইহার বিষময় ফল হইয়াছিল ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে ১৬ই ও ১৭ই আগষ্ট কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং বীভৎস নারকীয় দৃশ্যের অবতারণা আর সেই অজুহাতে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ বিভাগ। কিন্তু তাহাতেও হিন্দুমুসলমান সমস্যার সমাধান ত হয়ই নাই বরং ত্রিগুণিত হইয়াছিল। কারণ ভারতবর্ষ নামত ভারত ও পাকিস্তান বলিয়া দ্বিধা বিভক্ত হইলেও ফলতঃ পূর্ব্ব পাকিস্তান (পূর্ব্ববঙ্গ অর্থাৎ বর্ত্তমান

বাংলাদেশ.), ভারত ও পশ্চিম পাকিস্তান বলিয়া ত্রিধা বিভক্ত হইয়াছিল এবং এই তিন ভূখণ্ডেই হিন্দু ও মুসলমান ছিল। কাজেই দেশ ভাগ করিয়া যে হিন্দুমুসলমান সমস্যা আদৌ মিটে নাই এবং মিটিবার কথা নয় তাহা সকলেই সহজে বুঝিতে পারেন। অথচ দেশ বিভাগের জন্য বৃটেনের প্রচেষ্টায় সংগোপনে সহায়তা-সহযোগিতা করিয়া গান্ধীজী ও তাঁহার চালিত কংগ্রেস ভুল নয়, সজ্ঞানে পাপ করিয়াছিলেন। সেই পাপ দেশবিভাগের জন্য বৃটেনের প্রস্তাব গ্রহণে নেহেরু প্রভৃতি ব্যক্তির অত্যুৎসাহে ও গান্ধীজীর তৎপরতায় প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল এবং গান্ধীজীর কূটনৈতিক কপটতাকে একেবারে অনাবৃত করিয়া দিয়াছিল। আর সে-পাপের ফলে কোটি-কোটি দেশবাসী নেকড়ে বাঘের মুখে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মত দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে-পাপ মার্জ্জনীয় বলিয়া প্রতীত-প্রতিপন্ন হওয়ার কথা নয়। গান্ধীজী ও তাঁহার শিষ্যবর্গের আচরণকে যদি আপোষ মীমাংসার প্রচেষ্টা বলিয়া গণ্য করা হয় তাহা হইলে বলিতে হয় গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ কথাটা সম্পূর্ণ বিগতার্থ এবং ধুরন্ধর রাষ্ট্রনীতিবিদের কপটোক্তি। এখানে পুনরায় আমরা দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি—"অবিরাম আপোষ মীমাংসার দ্বারা পৃথিবীর কোনও বড় কাজ সাধিত হয় নাই, ভারতের স্বরাজ লাভও তাহা দ্বারা সংসাধিত হইবে না।" এখন ভারতের অর্থাৎ ভারতবাসীর স্বরাজ কোন্ দিক দিয়া কতটা সম্ভব হইয়াছে তাহা দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই একটু ভাবিয়া দেখিতে পারেন এবং তাঁহাদের সেই চিন্তাটাকে একেবারে নীরব না রাখিয়া কিছুটা সরব করিতে পারিলে ফল উত্তম ছাড়া অধম হইবে না বলিয়া আমাদের ধারণা।

গান্ধীজী অহিংসভাবে ভারতবর্ষের না হইলেও খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা আনিয়া দিয়াছেন একথা মনে করিয়া তিনি হয়ত আত্ম-প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে বঙ্গদেশ ও পাঞ্জাবের এবং

সেই সঙ্গে ভারতের যে সর্বনাশ সাধিত হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় কি করিয়া? যাহারা একদিন ভারতবর্ষের নাগরিক ছিল তাহাদেরই কোটি-কোটি লোক প্রচণ্ডভাবে বিপন্ন হইয়াছিল একথা কি মিথ্যা? দেশবিভাগের পর খণ্ডিত ভারতের হিন্দু হিন্দুর দ্বারা শোষিত হইয়াছিল এবং হইতেছে এবং পাকিস্তানের মুসলমান পাকিস্তানের মুসলমানের দ্বারা অতিমাত্রায় শোষিত হইয়াছিল যাহার ফলে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্ট—একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন কি? পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে দুইবার যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল একথা কি ইতিহাস হইতে মুছিয়া ফেলা যায়? কেন এমন হইয়াছিল এবং হইতেছে তাহাই চিন্তনীয়। শুধু দেশভাগ করিয়া হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান হইবে কি করিয়া এই প্রশ্নের উত্তর কোন কংগ্রেসী দাবী করেন নাই।

প্রায় হাজার বৎসরের পরাধীনতার ফলে ক্লীবত্বপ্রাপ্ত দেশবাসীর সম্মুখে রাষ্ট্রনীতির উপর ধর্মের খোলস জড়াইয়া তাহাদিগকে এমনই মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখা হইয়াছিল যে, ধর্ম্মের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ বিভাগে কংগ্রেসী নেতারা সমর্থন জানাইয়াছিলেন। এই নজির নাকের ডগায় নাচাইয়া হিন্দুদের মধ্যে কোন-কোন জাতি তাহাদের অসহায়তার জন্য জাতির ভিত্তিতে স্বতন্ত্র বাসভূমি দাবী করিতে পারে যেমন দাবী তুলিয়াছে আদিবাসীরা ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠনের। এবং শিখদের খালিস্তানের জন্য তেমন দাবী উঠিবার পক্ষে কেবল উস্কানির অভাব ও অপেক্ষা মাত্র। তেমন দাবী উঠিলে কংগ্রেসী নেতারা বা কংগ্রেসী শাসকরা কোন্ অহিংস অস্ত্রের বলে সেই দাবীকে প্রতিহত করিতে উদ্যোগী হইবেন—ব্যালট, না, বুলেট?

জাতির নীচতার দোহাই দিয়া দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথের প্রতি একদিন অবিচার করা হইয়াছিল। বীরেন্দ্রনাথের অনুরাগিগণ তাহার প্রতিশোধ লইতে পারেন নাই। তপশীলী জাতি ও উপজাতিসকল এখন তাহার প্রতিশোধ কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করিয়া লইবে। তথাকথিত

উচ্চশ্রেণীর কংগ্রেসী নেতারা তাঁহাদের নিকটে নতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। তাহা কি প্রকৃতির প্রতিশোধ বলিয়া প্রতীত হইবে না?

বীরেন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণে বিদগ্ধ মুসলমানের অশ্রুবিসর্জ্জন

দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ বঙ্গদেশের হিন্দুমুসলমাননির্বিশেষে সকল নিরক্ষর ব্যক্তির অর্থাৎ শতকরা ৯৫ ভাগ লোকের শ্রদ্ধা ও পূজার পাত্র ছিলেন। কিন্তু তিনি যে উচ্চশিক্ষিত মুসলমানদেরও কিরূপ সম্মান আকর্ষণ করিয়াছিলেন তাহা নিম্নের ঘটনা হইতে পাঠকপাঠিকাদের সহজে উপলব্ধ হইবে।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ২৫ শা নভেম্বর প্রায় মধ্যাহ্ন কালে দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথের নাবালক পুত্র বিমলানন্দ কেওড়াতলা মহাশ্মশানে তাহার পিতৃদেবের শবদেহে মুখাগ্নি ক্রিয়া সম্পাদন করে। যখন অগ্নিশিখা চিতার উপরে বীরেন্দ্রনাথের উপবিষ্ট অবস্থায় রক্ষিত ঊর্দ্ধশির বিশাল বপুকে প্রায় ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল সেই সময়ে চিতা হইতে অনতিদূরে উন্মুক্ত আকাশতলে শীতের সূর্যকরোজ্জ্বল শ্মশানে একখানি বেঞ্চে বসিয়া সাশ্রু নয়নে দেশপ্রাণেরই কথা চিন্তা করিতে-ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, মাথায় ফেজ, গায়ে কাল লম্বা কোট ও পরণে পায়জামা এমনই বেশে এক ভদ্রলোক শ্মশানে প্রবেশ করিয়া সরাসরি শাসমল মহাশয়ের চিতার সন্নিকটে আসিলেন এবং মাথার ফেজ খুলিয়া ফেলিয়া উহা বুকের উপর দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া থাকিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। আমি বেঞ্চ হইতে উঠিয়া গিয়া সেই ভদ্রলোকের পার্শ্বে দাঁড়াইলাম। তিনি অশ্রু বিসর্জ্জন হইতে ক্ষান্ত হইলে আমি তাঁহার হাত ধরিয়া আনিয়া সেই বেঞ্চে বসাইয়া তাঁহার পার্শ্বে নিজেও বসিলাম এবং তাঁহার সহিত আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আমি আপনাকে চিনি না, তবে আপনি শাসমল মশায়ের গুণগ্রাহী। সেজন্য আপনার নাম জানতে পারি কি?" ভদ্রলোক

পুনরায় অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন, পরে বলিলেন, "আমার নাম আবদুল্লা সোহারাওয়ার্দ্দি। রাজনীতি ক্ষেত্রে শাসমল মশায় ছিলেন আমার গুরু। তাঁর সঙ্গে আমার কথাই ছিল তিনি ও আমি একসঙ্গে এই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে লড়াই করব, আমার গুরু আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন, আমি আর কার সঙ্গে মিলে কাজ করব।" তারপর আমরা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম। তারপর আমাদের মধ্যে আরও দুই একটা কথা হওয়ার পর আবদুল্লা সোহারাওয়ার্দ্দি {পুরা নাম (স্যার) আবদুল্লা অল্-মামুন সোহারাওয়ার্দ্দি} ধীরে-ধীরে শ্মশান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।[১]

নিরক্ষর মূর্খ নয়, বোধ তাদেরও হয়

এদেশে নিরক্ষর বা স্বল্পসাক্ষর ব্যক্তিগণ কোথাও কোন ব্যাপারে কিছুমাত্র ভুল করিয়া ফেলিলে বা তাঁহাদের কোন উক্তি বা কার্য্য

---

১) আবদুল্লা বীরেন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের দুই মাসের মধ্যে (১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারি) দেহ রক্ষা করেন। তাঁহার নিবাস ছিল মেদিনীপুর সহরে। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ও রেলওয়ে বোর্ডের প্রাক্তন সভাপতি স্যার জাহাদুর রহিম জাহিদ সোহারাওয়ার্দ্দির খুল্লতাত ঢাকা কলেজের আরবী ও পারসী সাহিত্যের অধ্যাপক ওবায়েদুল্লা এল মামুন সোহারাওয়ার্দ্দির পুত্র এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রথম মুসলমান ভাইস-চ্যান্সেলার স্যার হাসান সোহারাওয়ার্দ্দির কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি অত্যন্ত বিদ্বান ও নিরহঙ্কার ব্যক্তি ছিলেন, তিনি আরবী, পারসী, ইংরেজী সাহিত্য ও দর্শন এই চারিটি বিষয়ে এম. এ. উপাধিকারী। তাহা ছাড়া তিনি পি-এইচ্. ডি, ডি. লিট্, ও ডি. এল. উপাধিও লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ইংল্যাণ্ড হইতে ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া দেশে ফিরিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় করিতেন। পরে তিনি আইন ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী বিভাগের অধ্যাপক হইয়া পরে উহার অধ্যক্ষ হন। তারপর তিনি বিশ্ববিদ্যালয় আইন কলেজে 'ঠাকুর' অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইনি ১৯২০ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের প্রথম বে-সরকারী চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

মনঃপূত না হইলে শিক্ষিত নামধেয় ব্যক্তিগণ কিছুমাত্র চিন্তা বা দ্বিধা না করিয়া সাধারণতঃ মন্তব্য প্রকাশ করেন—ওরা মূর্খ, লেখাপড়া শেখে নি, ওরা কিচ্ছু জানে না। ওদের কথা বাদ দেওয়াই ভাল। এই সব তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তির মনের কথা হইল—কেহ লেখাপড়া না শিখিলে কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়, তাহার বোধবুদ্ধি বিচার-বিবেচনাশক্তি থাকে না, আর একটু লেখাপড়া শিখিলেই যেন সকল প্রকার বিচার-বুদ্ধির পাখা গজাইয়া উঠে। যে-সব ব্যক্তি এই ধারণা পোষণ করেন তাঁহারা বুঝিয়া দেখিতে চান না যে, তাঁহাদের চেয়েও উচ্চশিক্ষিত ও বিবেকবান লোক এ সংসারে তাঁহাদেরই ধারে-কাছে যথেষ্টসংখ্যক আছেন, কিন্তু থাকিলে কি হয়, নিরক্ষর ব্যক্তিকে মূর্খ বলিয়া বিবেচনা করার গোঁয়াতুর্মি, গোঁড়ামি বা নির্বুদ্ধিতা তাঁহাদের ঘুচে নাই, বরং তাঁহাদের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। তাঁহাদের এ-কথাও মাথায় আসে না যে, তাঁহাদের অপেক্ষা উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ যদি তাঁহাদের সম্পর্কে, তথাকথিত মূর্খদের সম্পর্কে তাঁহাদের নিজেদের অভিমতের মতই অভিমত বা ধারণা পোষণ করেন এবং তাঁহাদের সম্পর্কে কটু মন্তব্য করেন, তবে তাঁহাদের অবস্থা কেমন হয়।

যে-ব্যক্তি লেখাপড়া শিক্ষা করে নাই বা শিক্ষা করার সুযোগ-সুবিধা পায় নাই তাহাকে লেখাপড়া শিখাইবার প্রয়াস পাইলে সে যদি শিখিতে পারে, তবে তাহাকে মুখে-মুখে অর্থাৎ চক্ষুকর্ণের সাহায্যে কোন কিছু শিক্ষাদানের চেষ্টা করিলে তাহাও তাহারা গ্রহণ করিতে পারে। এখন তাহাদিগকে যথার্থতঃ শিক্ষা দেয় কে এবং শিক্ষা দেওয়া যায় বা কিরূপে তাহাই প্রশ্ন।

কি করিয়া চাষাবাদ করিতে হয়, কি করিয়া গোযান চালাইতে হয়, কি করিয়া গোমহিষাদি পালন করিতে হয়, কিভাবে জমিতে সার দিতে হয়, সার না দিলেই বা ক্ষতি কি হয়—এই সব প্রশ্নের উত্তর শিখিয়া লইয়া নিরক্ষর জন্মগ্রহণ করে না। বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে থাকিয়া তাহারা এসব শিক্ষা করে—এজন্য লেখাপড়া শিক্ষার, পুঁথি-

পুস্তক পাঠের প্রয়োজন হয় না। সেইভাবে তাহাদিগকে তাহাদের জীবনধারণ প্রণালীর কথা, তাহাদের বিবিধ সমস্যা ও সেগুলির সমাধানের কথা মুখে-মুখে জানাইলে তাহারা তাহা বুঝিতে পারে এবং পারিবে। তাহারা মূর্খ বলিয়া অভিহিত হওয়ার অবস্থায় থাকে না এবং থাকিবেও না।

আমাদের এত কথা বলিবার কারণ ও প্রয়োজন হইল যাঁহারা নিরক্ষর ব্যক্তিদিগকে মূর্খ বলিয়া অবহেলা করেন তাঁহাদের সমক্ষে দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথের জীবন ও কর্মধারার সহিত জড়িত এক বিশেষ দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করিয়া তাঁহাদের চক্ষু উন্মীলন করা।

আজ (১৯৮১ খৃঃ) বাঙালীদের শতকরা ৩০।৩৫ ভাগ শিক্ষিত বলিয়া দাবী করা হয়। কিন্তু ১৯২১ খৃষ্টাব্দে বাঙালীদের সাক্ষরতার অবস্থা এইরূপ ছিল না। তখন শতকরা ৪।৫ ভাগ লোকের মধ্যে যেমন উচ্চশিক্ষিত লোক ছিল, তেমনি শুধুমাত্র সাক্ষর করিতে সমর্থ লোকও ছিল। এই শিক্ষিত লোকদের অধিকাংশই ছিল সহরের বাসিন্দা। কাজেই পল্লী অঞ্চলের শিক্ষিত লোকের শতকরা হার আরও কম ছিল। এবং নিরক্ষর লোকের সংখ্যার হার সর্বাধিকই ছিল অর্থাৎ শতকরা ৯৫ ভাগেরও অধিক। এইরূপ অতিমাত্রায় গরিষ্ঠ নিরক্ষর ব্যক্তিদিগকে লইয়া প্রবল প্রতাপশালী সুসংগঠিত সরকারের বিরুদ্ধে একটা ব্যাপক আন্দোলন গড়িয়া তোলা এবং তাহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে লওয়া যে কি ব্যাপার তাহা বর্ত্তমান যুগের শিক্ষিত নামধেয় ব্যক্তিগণের অনুধাবনশক্তির বহির্ভূত। এমন কি, যাঁহারা আজ নিজেদিগকে নেতা বলিয়া জাহির করিয়া আত্মপ্রসাদ ভোগ করেন তাঁহাদেরও কল্পনার অতীত।

দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ১৯২১ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলায় এই ব্যাপক আন্দোলন গঠন করেন। বীরেন্দ্রনাথ ঐ সময়ে সরকারের গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন আইন প্রবর্ত্তনের বিরোধিতা করেন। এ সম্পর্কে তাঁহার প্রস্তাব বরিশালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন

সমর্থন করে। কিন্তু পরে কলিকাতায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্য্যকরী সভা তাহাদের বৈঠকে বীরেন্দ্রনাথের অসুস্থতা হেতু অনুপস্থিতির সুযোগে বরিশাল সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব নাকচ করে। বীরেন্দ্রনাথ পরে তাহা জানিতে পারেন এবং নিজ ব্যক্তিগত দায়িত্বে মেদিনীপুর জেলায় উল্লিখিত আইন প্রবর্ত্তনবিরোধী আন্দোলন আরম্ভ করেন। তিনি গ্রামে-গ্রামে ঘুরিয়া সভা করিয়া নিরক্ষর ও সাক্ষর সকল ব্যক্তিকে ঐ আইন প্রবর্ত্তনের কুফল বুঝাইয়া দেন। জেলাবাসী সকলে বীরেন্দ্রনাথের যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করেন এবং সর্বান্তঃকরণে বীরেন্দ্রনাথকে সমর্থন জানান। লক্ষ-লক্ষ লোক এই আন্দোলনের ঝুঁকি লইতে অগ্রসর হন। এই ঝুঁকির অর্থ শুধু অর্থত্যাগ নয়, সম্পদ ত্যাগ নয়, কারাবরণ নয়, লাঠি-গুলীর সম্মুখে আত্মসমর্পণ ও মৃত্যুবরণ।

জনমনে রাষ্ট্রনীতিক সাক্ষরতা সৃষ্টি

দেশবাসীর উল্লিখিত মানসিক প্রস্তুতি হইল নিরক্ষর অর্থাৎ লেখাপড়া করার কৌশলশিক্ষাহীন ব্যক্তিদিগকে চক্ষুষ্মান করিবার জন্য বীরেন্দ্রনাথের অকপট ও অশ্রান্ত প্রয়াসের ফলশ্রুতি। ইহা বীরেন্দ্রনাথের মহান কৃতিত্ব। এই কৃতিত্ব বোধবুদ্ধিহীন নয় শুধু লেখাপড়ার কৌশলজ্ঞানহীন গ্রাম্য দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে রাষ্ট্রনীতিক সাক্ষরতা সৃষ্টির কৃতিত্ব, আর্থনীতিক ও সামাজিক সাক্ষরতা সৃষ্টির সূচনা করার কৃতিত্ব। বর্ত্তমান যুগে যদি একজন অন্ধ হইয়াও লেখাপড়া শিখিতে পারে, একজন বধির হইয়াও যদি লেখাপড়া শিখিতে পারে, তাহা হইলে বোধবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বর্ণমালা না শিখিয়াও রাষ্ট্রনীতিক সাক্ষরতা অর্জন করিতে পারিবে না কেন? দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ লেখাপড়া-জ্ঞানশূন্য ব্যক্তিদের মধ্যে রাষ্ট্রনীতিক স্বাক্ষরতা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে আর্থনীতিক ও সামাজিক সাক্ষরতা অনুপ্রবিষ্ট করাইবার সুযোগ-সময় পান নাই। সংগ্রাম

করিতে-করিতে তাঁহার জীবনদীপ অকালে নির্বাপিত হইয়া গিয়াছিল। আজকাল যাঁহারা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তাঁহারা, যথার্থ কথা বলিতে গেলে, জনগণের মধ্যে দূরের কথা, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেই সভ্যজীবনের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতি সম্পর্কিত সাক্ষরতা সঞ্চার করিতে আদৌ আগ্রহী নয়। ফল হইতেছে বহুলোক কিছু লিখিবার ও পড়িবার কৌশল জানিয়াও সমাজজীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ রহিয়া যাইতেছে।

জনগণের মধ্যে রাষ্ট্রনীতিক সাক্ষরতা সৃষ্টির এই কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য তাঁহার নাম ভারতীয় বা বাঙালী কর্ত্তৃক লিখিত পরাধীন ভারতের রাজনীতিক ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকার কথা। কিন্তু স্বর্ণাক্ষরে দূরে থাকুক, সামান্য কালকালির অক্ষরেও কোথাও লিখিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের অবগতি নাই। ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন যুগে এদেশে সর্বপ্রথম বীরেন্দ্রনাথের দ্বারা প্রবর্ত্তিত কৃষি ও কৃষক কল্যাণ আন্দোলন সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের পরশ্রীকাতর কোন বিখ্যাত শিক্ষিত ধনী ব্যক্তির চিন্তাধারার কথা এখানে উল্লেখ করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কলিকাতার অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ একবার সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল স্মৃতি বক্তৃতা দিতে গিয়া সর্দ্দার প্যাটেলকে ভারতবর্ষের কৃষি আন্দোলনের প্রবর্ত্তক বলেন যদিও দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ কৃষি ও কৃষক আন্দোলন করেন ১৯২১ খৃষ্টাব্দে আর সর্দ্দার প্যাটেল করেন ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে। তুষারবাবু দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথের নাম বেমালুম ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি বৃহৎ বিখ্যাত ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্রের মালিক, পরিচালক ও সম্পাদক। তিনি বাঙালী দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নাম ও কর্মধারার সহিত পরিচিত ছিলেন না এমন কথা কোনক্রমেই বলা যায় না। তখন আমরা মৎ-সম্পাদিত 'প্রভাত' মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় তাঁহার মন্তব্যের প্রতিবাদ করিয়াছিলাম।

বীরেন্দ্রনাথের প্রবর্ত্তিত কৃষি ও কৃষক আন্দোলন অর্থাৎ পল্লী স্বায়ত্তশাসন আইন অনুসারে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপন প্রতিরোধ আন্দোলন তৎকালীন কি বঙ্গনেতা চিত্তরঞ্জন, কি ভারতনেতা গান্ধীজী সমর্থন করেন নাই। তাঁহারা দেশের কল্যাণকামী হইলেও তখন বা তাহার পরে তাঁহারা কৃষক কল্যাণের জন্য তেমন মাথা ঘামাইতেন না—যেমন মাথা ঘামাইতেন জমিদারগোষ্ঠী ও ধনী শিল্পব্যবসায়-মালিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য এবং শিল্পশ্রমিকদের সুবিধার জন্যও বটে। তাঁহারা দরিদ্র নিরক্ষর জনগণের চোখ খুলিয়া দিতে একেবারে আগ্রহী হন নাই। এমন কি, দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথের প্রবর্ত্তিত আন্দোলনের সাফল্য দেখিয়াও, ঐ আন্দোলন দেশব্যাপী করিয়া তুলিবার সম্পর্কে তাঁহার সহিত কোন আলোচনা করিবার ঔৎসুক্য প্রদর্শন করেন নাই। বীরেন্দ্রনাথের প্রয়াসে তাঁহারা বোধ হয় এইজন্য চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, জনসাধারণের চোখ খুলিয়া গেলে, তাঁহাদের নেতৃত্ব চলিয়া যাইবে, জমিদারবর্গ ও শিল্পব্যবসায়মালিকগণ অখুসী হইবে এবং মেদিনীপুরের সাফল্যের পর সমগ্র বঙ্গদেশে শাসমলের প্রয়াস সফল হইলে তিনি সর্বভারতীয় রাষ্ট্রনীতিক ক্ষেত্রের নেতৃত্বে একটি বিশিষ্ট স্থান নিজের গুণেই করিয়া লইবেন। শাসমলের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইলে, আজ নয়, দুইদিন পরে তিনি জমিদার, রাজা-মহারাজার বিরোধিতা করিবেন এবং সেই সঙ্গে শিল্পব্যবসায়-মালিকগণও তাঁহার বিরোধিতা হইতে বাদ যাইবেন না। শাসমল ধন্য, তাঁহার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও নেতৃত্বগ্রহণ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল, তিনি ধন্য যে, তিনি তাঁহার বিরাট দায়িত্ব পরিপূর্ণরূপে পালন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; মেদিনীপুরবাসী ধন্য যে, তাঁহারা দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথের মত একজন পুরুষসিংহের মহান নেতৃত্ব লাভ করিয়া নিজেরা যে এক-একজন ক্ষুদ্র শাসমল তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ দেওয়ার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ১৯২১ হইতে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দেশ-বিদেশের সকলেই বলিতেন—শাসমল বলিতে মেদিনীপুর আর মেদিনীপুর

বলিতে শাসমলকে বুঝায়। তাহার কারণ বা অন্তর্নিহিত কথা হইল তৎকালে মেদিনীপুরবাসিগণ ছিলেন এক-একজন ক্ষুদ্র শাসমল, আর চিরোন্নতশির বীর ও একান্ত জনদরদী বীরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত অল্প সময়ে স্বজেলাবাসীদের অন্তরের স্বাভাবিক বীরত্ব ও স্বদেশপ্রাণতাকে তাহাদের সহিত একান্ত হইয়া গিয়া অতি সহজ ভাবে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং তাঁহার উদ্দাম সংগ্রামপ্রেরণা ও অকুতোভয়তা তাহাদের তাজা প্রাণে সঞ্চার করিয়াছিলেন। এই বীরত্ব ও স্বদেশ-প্রেমমিশ্রিত সংগ্রামপ্রবণতা ও অকুতোভয়তা মেদিনীপুরবাসীদের মনে এমন দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল যে, বীরেন্দ্রনাথের দেহাবসানের (১৯৩৪) পরেও বহুদিন পর্য্যন্ত উহা তাহাদের মধ্যে সঞ্জীবিত ছিল। ইহার প্রমাণ ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরের আগষ্ট আন্দোলনে শত-শত বীর ও বীরাঙ্গনার আত্মত্যাগ এবং সহস্র-সহস্র নরনারীর স্বাধীনতাযজ্ঞে আত্মনিমজ্জন ও অশেষ নির্য্যাতন ভোগ।

এই ১৯৪২ খৃষ্টাব্দেও মেদিনীপুরে শিক্ষিত নামধেয় লোকের সংখ্যা শতকরা দশের অধিক ছিল না। তবুও সেই জেলার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা পরাধীনতাটাকে অভিশাপ মনে করিয়া তাহার দূরীকরণের জন্য অকুণ্ঠ চিত্তে স্বাধীনতা-অর্জন আন্দোলনের অগ্নিকুণ্ডে মরণ ঝাঁপ দিয়াছিলেন। সেইজন্যই বলিতেছিলাম—নিরক্ষরতা মূর্খতার কারণ নয়, নিরক্ষরদের মধ্যে যে বিবেকবুদ্ধি-বিবেচনাশক্তি আছে তাহাকে জাগাইয়া তুলিবার মত দরদ, ক্ষমতা, তিতিক্ষা ও ত্যাগস্বীকার চাই। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ এই সমস্ত গুণেরই অধিকারী ছিলেন। সেইজন্য তিনি মেদিনীপুরকে বুকে করিয়া রাখিয়াছিলেন আর সযত্নে লালন করিয়া গিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের যে-সব ব্যক্তি দেশবিভাগে সহযোগিতা করিয়াছিলেন তাঁহারা শাসনশক্তি লাভ করিয়া নিজেদের পাপ লুক্কায়িত রাখিবার জন্য, দেশবাসীকে তাহা জানিবার সুযোগ না দিবার অভিপ্রায়ে সর্বাগ্রে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, তৎপরে খাদ্য-উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা এবং চিকিৎসাব্যবস্থার সর্বনাশ সাধন করিয়া

গিয়াছেন। দেশের লোক যাহাতে লেখাপড়া শিখিয়া নিরক্ষর নাম ঘুচাইয়াও নিরেট মূর্খ থাকে তাহার সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে এবং দেশবাসীর মন হইতে দেশ ও দেশপ্রেম ধুইয়া মুছিয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেজন্য আজ দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথের মত মহান জননায়ক ও জনসেবকের কথা কেহ মনে করে না, তাঁহার ত্যাগ-তিতিক্ষার কথা স্মরণ করে না, তাঁহার কথা দেশীয় সরকার ও সাধারণকে জোর করিয়া খোঁচা দিয়া স্মরণ করাইয়া দিতে হয়।

বীরেন্দ্রনাথকে কবে মনে পড়িবে

দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথকে বাঙালী জাতির একদিন মনে পড়িবে বা মনে নাও পড়িতে পারে। যদি কোন দিন মনে পড়ে তবে সেদিন বড় দুঃখেই 'হায়-হায়' করিয়া মনে পড়িবে। আবার মনে পড়িবার দিনে মনে নাও পড়িতে পারে। কবে মনে পড়িবার সম্ভাবনা আজ এখানে সেই কথাই একটু আলোচনা করিতেছি।

এদেশে ইংরেজ শাসনযুগে বঙ্গদেশ খণ্ডিত হইতে আরম্ভ করে। ইংরেজ সরকার এই ভূখণ্ডকে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে খণ্ডিত করিয়া ইহার ভৌগোলিক কলেবর ও লোকসংখ্যা হ্রাস করিতে আরম্ভ করে। ঐ বৎসর কাছাড় ও গোয়ালপাড়া এই দুই বঙ্গভাষাভাষী বাঙ্গালী-প্রধান জেলাকে বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহারা আসাম বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করে। আসাম তখন একজন চীফ কমিশনারের শাসনাধীন হয়। তারপর তাহারা বড়লাট লর্ড কার্জনের সময় ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশকে দুইভাগে ভাগ করে। কিন্তু তাহারা ভাগ করিয়া ছয় বৎসর দুই বঙ্গে দুই জন গভর্ণর রাখিয়া রাজত্ব চালাইয়াও তেমন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। তাহারা যেমন নিজেদের স্বার্থে শাসনসুবিধা, আর্থিক লাভ ও ধর্ম্মনির্বিশেষে বাঙালী জাতির ক্ষতি সাধনের জন্য বঙ্গদেশ ভাগ করিয়াছিল তেমনই তাহারা আবার সেই শাসনসুবিধা, সমগ্র ইংরেজ জাতির আর্থিক ক্ষতি রোধ ও বাঙালী

জাতির ক্ষতি সাধনের জন্য দুই বাংলাকে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে একীভূত করে। বঙ্গবিভাগের ফলে শুধু বঙ্গদেশে নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে বৃটিশ পণ্য বিক্রয় একেবারে বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। ইংরেজ বণিক জাত। তাহারা তাহাদের ব্যবসায়ে আর্থিক ক্ষতির কথা একেবারে উড়াইয়া দিতে পারে না। ইংল্যাণ্ডে সহরে ও গ্রামে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের ভারতে বৃটিশ পণ্য বর্জনের যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতার ফলে ইংরেজ জনগণের চৈতন্যোদয় হয়। তাহাদের চাপে পড়িয়া ইংরেজ সরকার বঙ্গবিভাগ রদ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু তাহারা বিহার ও উড়িষ্যাকে বঙ্গ প্রেসিডেন্সি হইতে কাটিয়া লইয়া 'বিহার ও উড়িষ্যা' নামে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করে আর সেই সঙ্গে বঙ্গভাষাভাষী বাঙালী-প্রধান সিংভূম, মানভূম, পুরুলিয়া, ভাগলপুর, পূর্ণিয়া ও বালেশ্বর জেলাকে নূতন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করে। ঐ সময় মেদিনীপুর জেলার কিয়দংশও বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত হইয়া যায়। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নেতাগণ ইংরেজ সরকারের পরাজয়ের আনন্দে মশগুল হইয়াছিলেন এবং ছয়টি বাঙালীপ্রধান জেলা যে মূল বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল সেদিকে তাঁহারা দৃষ্টিপাত করেন নাই। সেদিন ইংরেজ সরকার মনে-মনে স্থির করিয়া লইয়াছিল—ভবিষ্যতে সুযোগ-সুবিধা পাইলে তাহারা একটা বড় রকমের কোপ বসাইয়া ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ ১৯১১ খৃষ্টাব্দে নিজেদের দ্বারা রদ করিতে বাধ্য হওয়ার অপমানের প্রতিশোধ তুলিয়া লইবে। এই যে ছয়টি জেলা বঙ্গদেশ হইতে প্রদেশান্তরে চলিয়া গেল ইহার ফলাফল কি হইতে পারে তাহা তৎকালীন বঙ্গনেতাগণ দুই বঙ্গ নামতঃ একীভূত করার প্রয়াসের সাফল্যে আনন্দের আতিশয্যে আর বিবেচনা করিয়া দেখিতে চাহিলেন না। তাঁহারা অতিমাত্রায় তৎপর হইয়া ইংরেজ সরকারের দুই বঙ্গকে একীভূত করার সিদ্ধান্তকে লুফিয়া লইয়াছিলেন যেমন ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজী ও তাঁহার পরামর্শ পরিহারে অপারগ নেহেরু-প্রসাদ-প্যাটেল প্রভৃতি কংগ্রেসী নেতা ও জিন্না-লিয়াকৎ

আলি প্রভৃতি মুসলীম লীগ নেতা বৃটিশ পার্ল্যামেন্টের ভারতবর্ষ বিভাগের প্রস্তাব নেতাজীভীতি এবং ক্ষমতা ও বিলাস ভোগের লোভে আর সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের বুদ্ধিবল বাঙ্গালী ও বাহুবল পাঞ্জাবীদের সর্বনাশ সাধনের বাসনায় অতিমাত্র ব্যস্ততায় লুফিয়া লইয়াছিলেন, যেমনভাবে তাঁহারা বুঝিতে চান নাই যে, দেশভাগের পরিণাম ভয়ঙ্কর হইবে, যেমনভাবে তাঁহারা একথা বুঝিতে চান নাই যে, তাঁহারা ভারতবর্ষকে নামতঃ দুইভাগে কিন্তু কার্য্যতঃ তিন ভাগে ভাগ করিয়া হিন্দু-মুসলমান সমস্যাকে ত্রিগুণিত করিতেছিলেন এবং তাহার ফলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা ঘরোয়া যুদ্ধের পরিবর্ত্তে তিনটা ঘরোয়া যুদ্ধ সৃষ্টি হইবে এবং তাহাতে অধিকতর লোকক্ষয় হইবে আর বিপুল সম্পদের বিনষ্টি ঘটিবে।

যাহা হউক, ইংরেজ সরকার বঙ্গদেশে তাহাদের প্রাধান্য বিস্তারের সময় মেদিনীপুর জেলাবাসীদের নিকট হইতে সর্বাধিক বাধা পাইয়াছিল এবং বঙ্গদেশের মধ্যে মেদিনীপুর সর্বশেষে ইংরেজের কাছে পরাজিত হয়। ইংরেজ সরকার সে-কথা বিস্মৃত হয় নাই। 'তারপর ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনের সময় (গান্ধীজীর ভারতবর্ষে রাজনীতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণের অনেক পূর্বেই) মেদিনীপুর জেলা অহিংস ও হিংস উভয় প্রকার বিপ্লবাত্মক আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া অদ্ভুত কৃতিত্ব ও বীর্য্যবত্তার পরিচয় দিয়াছিল। অগ্নিযুগের দ্রোণাচার্য্য হেমচন্দ্র কানুনগো, মৃত্যুঞ্জয় ক্ষুদিরাম, ফাঁসির সত্যেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিপ্লবী জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায় ও দেশসেবক বীরেন্দ্রনাথ শাসমল মেদিনীপুর জেলার এই যুগের মুখোজ্জ্বলকারী সুসন্তান। ইংরেজ সরকার এই সকল দিক বিবেচনা করিয়া মেদিনীপুরের স্বাধীনচিত্ততা, স্বাধীন চিন্তা ও একনিষ্ঠ দেশপ্রেম নষ্ট করিবার জন্য বঙ্গভঙ্গ বন্ধ করার মাত্র দুই বৎসর পরে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে এই জেলাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিবার সিদ্ধান্ত করে।

দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ ইংরেজ সরকারের ঐ সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী হইতে দেন নাই। তিনি জেলায় প্রবল আন্দোলন গড়িয়া তোলেন। ফলে সে-বৎসর জেলাবিভাগ রোধ হয়। কিন্তু ইংরেজ সরকার মেদিনীপুরবাসীদিগকে জব্দ করিবার অভিপ্রায়ে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ঐ জেলার দক্ষিণাংশ উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য উড়িষ্যাবাসীকে দিয়া দাবী উত্থাপন করায়। ঐ সঙ্গে তাহাদের আরও উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গদেশকে আয়তন ও আয়ের দিয়া খাট করা আর স্বাধীন মনোভাবাপন্ন কয়েক লক্ষ ব্যক্তিকে বঙ্গদেশ হইতে উড়িষ্যায় সরাইয়া দিয়া তাহাদিগকে সেখানে সংখ্যালঘু করিয়া রাখা যাহাতে উড়িয়াভাষী উড়িষ্যাবাসী তাহাদিগকে সহজে দাবাইয়া রাখিতে পারে। এবারে মেদিনীপুর বিভাগের ব্যাপারে বঙ্গদেশের প্রসিদ্ধ সাংবাদিক ও মনীষী ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ব্যতীত আর কোন বুদ্ধিজীবী মেদিনীপুরের অংশবিশেষ বিভাগ করিয়া উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্তির প্রতিরোধ করিবার বিষয়ে বীরেন্দ্রনাথের সহযোগিতা করেন নাই। রামানন্দ-বাবু তাঁহার সম্পাদিত প্রবাসী মাসিকপত্রে মেদিনীপুরবিভাগের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। পেশাদার ফাঁকিবাজ রাজনীতিক নেতারা বোধ হয় মনে করিয়া লইয়াছিলেন যে, বীরেন শাসমলের জেলা মেদিনীপুর বা তাহার জন্মস্থান কাঁথি মহকুমা যদি উড়িষ্যায় চলিয়া যায় ত যাউক, তাহা হইলে অন্ততঃ শাসমলভীতি হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু শাসমল একক প্রচেষ্টায় মেদিনীপুরে যে-আন্দোলন গঠন করেন তাহার ফলে মেদিনীপুর বিভাগ বন্ধ হয়। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে বীরেন্দ্রনাথ মহাপ্রয়াণ করেন। উহার তের বৎসরের মধ্যে ইংরেজ সরকার সংগোপনে সুকৌশলে কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের সহযোগিতায় ভারতবর্ষ বিভাগের পাকা ব্যবস্থা করিয়া ফেলে। ভারতবর্ষ বিভাগের অনিবার্য্য ফল হিসাবে বঙ্গদেশ ও পাঞ্জাব বিভক্ত হয়। কিন্তু তখনও কংগ্রেসী নেতারা কেহ বিহার ও উড়িষ্যার অন্তর্গত এবং পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তসন্নিহিত বঙ্গভাষাভাষী বাঙ্গালীপ্রধান জেলাগুলি বা জেলা-

গুলির অংশবিশেষও পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রশ্ন তুলেন নাই। পশ্চিমবঙ্গ যে কি দুর্গত অবস্থায় পড়িতেছে তাহা কেহ চিন্তা করিলেন না। এখানে বলা একান্ত প্রয়োজন যে, বঙ্গদেশ ভাগ করিয়া ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ বলিয়া যে-ভূভাগটুকু খণ্ডিত ভারতে কোন প্রকারে থাকিয়া যাওয়ার সুযোগটুকু পাইয়াছিল তাহার উত্তরাঞ্চলের চারটি (বর্ত্তমানে কুচবিহার লইয়া পাঁচটি) জেলার সহিত স্থলপথে এই রাজ্যের বাকী অংশের কোন যোগাযোগ ছিল না। শেষে অনেক আন্দোলনের পর বিহারের পূর্ণিয়া জেলা হইতে এক টুকরা ভূভাগ পশ্চিমবঙ্গকে যেন দান দিয়া এই রাজ্যের উত্তরাঞ্চলের সহিত দক্ষিণাঞ্চলের যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। খণ্ডিত ভারতের কংগ্রেস নেতাদের এই দুর্মতি লক্ষণীয়।

বৎসর দুই পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলের পাঁচটি জেলা লইয়া একটি স্বতন্ত্র উত্তরখণ্ড রাজ্য গঠনের দাবী উঠিয়াছিল। এখন এদেশের শাসক ইংরেজ নয়। যাহারা স্বতন্ত্র উত্তরখণ্ড রাজ্য গঠনের দাবী তুলিয়াছিল তাহারা নিশ্চিতই বাঙালীবিদ্বেষী বা বাঙালী হইলে কিছুসংখ্যক বাঙালীবিদ্বেষী অবাঙ্গালীর সাহায্যপুষ্ট। আপাততঃ সে আন্দোলন স্থগিত রহিয়াছে। এখন আবার মেদিনীপুর জেলা বিভাগ করিয়া উহাকে দুইটি জেলায় পরিণত করিবার অভিসন্ধির গন্ধ পাওয়া যাইতেছে। এই অভিসন্ধির পশ্চাতে বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী উভয়ের যোগাযোগ থাকাই স্বাভাবিক। বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা বুঝিয়া দেখিতেছেন না যে, মেদিনীপুর আজ দুইভাগে বিভক্ত হইলে কয়েক বৎসর পরে উহার দুই ভাগের দক্ষিণাঞ্চলগুলিকে উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য দাবী উত্থাপন করানো হইবে।

এখনই ত 'ঝাড়খণ্ড' গঠনকর্মীরা মেদিনীপুর জেলার কতকগুলি অঞ্চলকে নূতন সম্ভাব্য ঝাড়খণ্ড রাজ্যের অন্তর্ভুক্তির দাবী তুলিয়াছে। মেদিনীপুরে যে নবাগতরা ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠন আন্দোলনের পোষকতা করিতেছেন তাঁহারা স্বার্থপর ও শোষণমুখী বলিয়া তাঁহাদের এখন চোখ

খুলিতেছে না। মেদিনীপুর ধ্বংস হইলে তাঁহারাও যে ধ্বংস হইবেন তাহা তাঁহারা বুঝিতেছেন না। মেদিনীপুরের দক্ষিণাঞ্চল উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্তির কথা উত্থাপিত হইলে মেদিনীপুরের দুই ভাগের লোকের একত্র মিলিত হইয়া প্রতিবাদ-প্রতিকার-প্রতিরোধ আন্দোলন গঠন করিবার সুযোগ থাকিবে না। পশ্চিমবঙ্গ আজ রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন দিক দিয়া জর্জরিত হইয়া যেরূপ দুর্গত অবস্থায় রহিয়াছে তাহাতে এই রাজ্যের উত্তরাঞ্চলের পাঁচটি জেলা লইয়া স্বতন্ত্র রাজ্য গঠিত হইলে বিস্ময়ের কিছু থাকিবে না। কেন্দ্রীয় সরকার বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রায়ত্ত কয়লা খনি অঞ্চল লইয়া একটি স্বতন্ত্র কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গঠন করিতেও পারেন। দেশভাগের পর হইতেই যে বাঙালী জাতির উৎসাদনের চক্রান্ত চলিতেছে তাহা আমরা দেশভাগের ঠিক পরেই আমার সম্পাদিত 'প্রভাত' পত্রিকায় লিখিয়াছিলাম। অন্ধ্রপ্রদেশ গঠন ও আসামের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া আমাদের ধারণা ও মন্তব্য কি অমূলক মনে হয়? আজ যাহা অঙ্কুর কাল তাহা মহীরুহে পরিণত হইতে পারে। পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখিলে ভয় পায়। এখন মেদিনীপুরবাসীর মনের অবস্থা তাহাই। যদি কখনও মেদিনীপুর জেলার অংশবিশেষকে উড়িষ্যার বা সম্ভাব্য ঝাড়খণ্ড রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার আয়োজন চলে তবে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীর তখন মেদিনীপুরের বীরেন শাসমলের নাম মনে পড়িবে। আবার একথাও বলা যায়, বাঙালী যেরূপ আত্মবিস্মৃত, ঈর্ষ্যাকাতর ও পরপদলেহী জাতি তাহাতে তাহাদের বীরেন্দ্রনাথের নাম মনে নাও পড়িতে পারে। আমাদের একথা বলার আরও কারণ এই যে, হিন্দু-মুসলমাননির্বিশেষে অবাঙালীরা কোন এক বা একাধিক গোপন পরিকল্পনা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলিকাতা সহর ও অন্যান্য বড় সহরকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে এবং বাঙালীরাও ঐসব অবাঙালীকে এই রাজ্য গ্রাস করিবার যেরূপ সুযোগ-সুবিধা করিয়া দিয়াছে তাহাতে বাঙালীদের তথাকথিত শিক্ষিত ছেলেমেয়েরাও

অবিলম্বে অবাঙালীদের বাড়ীতে পরিচারক-পরিচারিকার কাজ করিবার জন্য বা তদপেক্ষাও কোন হীন ও জঘন্য কাজ করিবার জন্য প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইয়া রহিবে বলিয়াই মনে হয়। আজ এত প্রচণ্ড মার খাইয়াও যে-সব বাঙালীর দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথকে মনে পড়িতেছে না তাহারা কি আর সেই নিদারুণ ঘোরতর দুর্দ্দিনে সেই মহাবিপ্লবীর পুণ্যনাম আকুল প্রাণে স্মরণ এবং তাঁহার কার্য্যাবলী একান্তভাবে মনন করিয়া ঋজু মেরুদণ্ডে দণ্ডায়মান হইয়া বিপ্লবের পথ অবলম্বন করিতে পারিবে ?

শেষ কথা

দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ ছিলেন অকুতোভয়। তিনি বলিয়া গিয়াছিলেন—তিনি জীবিত কালে কাহারও নিকট মাথা অবনত করেন নাই। মরণের পরেও যেন তাঁহার মাথা অবনত না করা হয়, তাঁহাকে যেন উর্দ্ধশিরে দাহ করা হয়।

দেশপ্রাণ শাসমলের বাসনা ও নির্দ্দেশ অনুযায়ী তাঁহার প্রাণহীন দেহ কলিকাতার কালীঘাটের সন্নিকটবর্ত্তী আদিগঙ্গার তীরে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে চিতায় উপবিষ্ট অবস্থায় স্থাপন করিয়া মুখাগ্নি-ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। এ দৃষ্টান্ত বিশ্বে অদ্বিতীয়।

নিত্য যাঁহাকে স্মরণ করি আজ সেই চিরোন্নতশির বীর পুরুষসিংহ দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল মহাশয়ের জন্মশতবর্ষপূর্ত্তি উপলক্ষে তাঁহার অমর কীর্ত্তির কথা পুনঃ স্মরণ করিয়া তাঁহার দীর্ঘ ঋজুদেহী মূর্ত্তি নয়নসমক্ষে রাখিয়া তাঁহার উদ্দেশে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধানতি জ্ঞাপন করিতেছি আর প্রার্থনা করিতেছি—ওহে বাংলার দুরন্ত সন্তান, ভারতবাসীর দরদী মহান, এই খণ্ডিত বঙ্গভূমিতে পুনরায় আবির্ভূত হইয়া বঙ্গদেশ ও ভারতবর্ষের বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে একীভূত কর।

যাঁকে আমরা অন্যায় করে ভুলেছি

অধ্যাপক সাধনকুমার ঘোষ

কলিকাতা আশুতোষ কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের প্রাক্তন অধ্যাপক

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে বঙ্গদেশে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ছিলেন এক মহান পুরুষ। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ২৬শে অক্টোবর তাঁর জন্ম হয়। দেশবাসী তাঁকে ভুলে গিয়ে এক নৈতিক অপরাধ করেছে। বীরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে গান্ধীজী এতটা উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন যে, দার্জ্জিলিং-এ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর বীরেন্দ্রনাথ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির পরিচালনাভার গ্রহণ করুন এইটাই তিনি চেয়েছিলেন। তিনি যদি বীরেন্দ্রনাথের হাতে কংগ্রেস সংগঠনের ভার দিতে পারতেন তাহলে বাংলার রাজনীতি দলাদলির আবর্ত্ত থেকে বেরিয়ে যেতে পারত এবং সেখানে একনায়কতন্ত্রও থাকত না। কিন্তু কুখ্যাত 'বৃহৎ পঞ্চ' নেতার জন্য তিনি তা পারেন নি। ইতিহাসের পরিহাস বড় নিষ্ঠুর ও অচিন্তনীয়। 'বৃহৎ পঞ্চ' নেতার মধ্যে একজন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস হতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর বিতাড়নে একটা বড় রকমের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সেটা পরবর্ত্তী কালের ঘটনা।

বীরেন্দ্রনাথ ১৯২১ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরে করবন্ধ আন্দোলন চালিয়েছিলেন আর সেই আন্দোলন ছিল বরদোলিতে সর্দার প্যাটেলের আন্দোলনের চেয়ে অধিকতর চিত্তাকর্ষক ও বিস্ময়কর। গান্ধীজী তাঁর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় উল্লেখযোগ্য ভাবে এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। সেকালে তিনিই ছিলেন একমাত্র কংগ্রেস নেতা যিনি অত্যন্ত গভীর ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, সহরে, নগরে ও রাজধানীতে নয়, দেশের গ্রামে-গ্রামে বার-বার রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনা করতে হবে। বীরেন্দ্রনাথ ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে মহাপ্রয়াণ করেন। যদি তিনি আর কিছুদিন বেঁচে থাকতেন তা হলে দেশবিভাগের সময়

বঙ্গদেশ নেতৃহারা হয়ে পড়তো না। তাঁর সমসাময়িক বেশীর ভাগ নেতা জনগণের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতেন। কিন্তু বীরেন্দ্রনাথ তাঁর সমসাময়িক যে-কোন নেতার চেয়ে মূক-দরিদ্র জনগণের অনেক বেশী পরিমাণে যথার্থ বন্ধু ছিলেন। গান্ধীজী, মতিলাল নেহেরু, এমন কি, সুভাষচন্দ্র বসুও (১৯২৮ খৃষ্টাব্দে সর্বদলীয় সম্মেলনের সদস্য রূপে) ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস্‌কেই ভারতের লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেছিলেন। শাসমল ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ঘোষণা করেন যে, পূর্ণ স্বাধীনতাই ভারতের লক্ষ্য। তিনি আরও ঘোষণা করেছিলেন যে, কেবলমাত্র বিপ্লবের পথেই পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ সম্ভব হতে পারে এবং বিপ্লবের মাধ্যমে বিদেশীর অধীনতা থেকে আমাদের দেশকে স্বাধীন করবার আমাদের অধিকার রয়েছে।

আমার মনে হয়, কেন এবং কিভাবে এই শক্তিমান ও খাঁটি দেশসেবককে রাজনীতি-ক্ষেত্র থেকে ঠেলে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল তা নির্দ্ধারণের জন্য গবেষণা চালানো আবশ্যক। তাঁর পরলোকগমনের অল্পদিন পরে অনুরূপভাবে সুভাষচন্দ্র বসুকেও দেশের রাজনীতিক্ষেত্র থেকে চাপ দিয়ে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য তার কারণ ছিল স্বতন্ত্র। এটা অবশ্য স্মরণ রাখতে হবে যে, যেদিন শাসমলকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্য্য নির্বাহক সমিতির সদস্যপদ দিতে অস্বীকার করা হ'ল সেইদিনই সুপরিচিত মুসলমান নেতা মৌলানা মহম্মদ আক্রাম খাঁও কংগ্রেসের সভ্যপদ ত্যাগ করেছিলেন। অন্যান্য মুসলমান নেতাও একের পর এক কংগ্রেস ত্যাগ করে চলে যান। আক্রাম খাঁ পরবর্ত্তী কালের দেশভাগের জন্য অক্লান্তভাবে সচেষ্ট হয়েছিলেন। একথা মনে করলে অন্তরে আশা ও আনন্দ জাগে যে, যখন স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা শাসমলকে রাজনীতি থেকে অপসারিত করার জন্য সর্বপ্রকার প্রয়াস চালিয়েছিলেন তখন বাংলার সকল গ্রামীন কংগ্রেসকর্মী, সকল মুসলমান নেতা এবং যাঁরা মজঃফর আহমেদের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে বিশ্বাস করতেন তাঁরা

সকলেই দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রতি আস্থা জানিয়েছিলেন।

শাসমল যে কেবল ষড়যন্ত্রমূলক রাজনীতির শিকার হয়েছিলেন তা নয়, তিনি নীচাশয় দলীয় রাজনীতির ও জাতিবিদ্বেষমূলক রাজনীতিরও বলি হয়েছিলেন। আজকালের চেয়ে তৎকালে জাতিভেদ নিয়েও অনেক মারপ্যাঁচ চলত। শাসমল উচ্চজাতের কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে একই আসনে আসীন থাকুন এটা তাঁরা সহ্য করতে পারতেন না। দুঃখের বিষয় এই যে, গান্ধীজী উচ্চজাতির কংগ্রেস নেতাদের এরূপ মনোবৃত্তির কথা জানতেন, কিন্তু তিনি তাঁর চোখ বন্ধ করে রেখেছিলেন। সেজন্য ক্যামু (Camus) কলিন উইলসন তাঁদের বই লেখবার বহু পূর্বেই শাসমল রাজনৈতিক সমাজে "বহিরাগত" হয়ে গিয়েছিলেন।

প্রাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে জানা যায়, বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শেষ ভাগ থেকে চতুর্থ দশকের প্রথম কিছুদিন পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদীরা শরৎ বসুর নিকট থেকে আর্থিক সাহায্য পেতেন। তিনি তাদিগকে মনের মত উপযোগী বন্ধু বলে বিবেচনা করতেন। দুঃখের বিষয় এই যে, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সংগে জড়িত বন্দীগণ ছাড়া, ঐ সময়ের অন্যান্য সন্ত্রাসবাদী কেবল 'যুগান্তর' ও 'অনুশীলন' এই দুই বিবদমান সন্ত্রাসবাদীদলের শুধু যন্ত্র হিসাবে কাজ করা ছাড়া কোনো মহৎ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল বলে মনে হয় না। এটা ইতিহাসের ঘটনা যে, অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ ও লোকনাথ বল—চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের এই তিন জন প্রধান নেতার যে জীবন রক্ষা পেয়েছিল তা শুধু একক বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের গভীর আইনজ্ঞান, সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি ও বিপক্ষকে তীব্রভাবে তৎপরতার সহিত আক্রমণ করার কৌশলের জন্য। এক কথায় বীরেন্দ্রনাথের অদ্ভুত ওকালতির জন্য। তা হলেও এটা ইতিহাসের একটা পরিহাস যে, প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস দলগুলি নিজেদের হীন কার্যোদ্ধারের জন্য সন্ত্রাসবাদীদিগকে

তোষামোদ করায় তারা গলে গেছল এবং তাদের ত্রাতাকে ভুলে গিয়ে তার সংস্পর্শ ত্যাগ করেছিল। অনেকেই একথা বলতেন যে, স্বাধীনতা আন্দোলনের পরে নয়, আগেই যথার্থ হিন্দু-মুসলমান সংহতি সাধন করতে হবে। একথা শাসমল দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন বলেই তাঁকে কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের লক্ষ্ণৌ চুক্তি যথার্থতঃ যথেষ্ট রকমে কার্য্যে পরিণত করা হয়েছে বলে তিনি মনে করতেন না। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে দেশবন্ধু দাস যে বঙ্গীয় হিন্দু-মুস্লিম ঐক্যচুক্তি প্রণয়ন করেছিলেন তা পূর্ণরূপে কার্য্যকরী করতে হবে, নতুবা মুসলমানগণ কংগ্রেস সংগঠন ছেড়ে চলে যাবে। এমন কি, চিত্তরঞ্জনও দেখে দুঃখিত হয়েছিলেন যে, ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনে মাত্র একজন ছাড়া বাকী সকল মুসলমান কংগ্রেসপ্রার্থী অতিশয় অসম্মানজনক ভাবে পরাজিত হয়েছিলেন। শাসমল চিত্তরঞ্জনের আগেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, যদি এ-প্রবণতা রোধ করে বিপরীতমুখী করা না হয় তা হলে তা বাংলা ও ভারতের পক্ষে বড় দুঃখের বলে পরিগণিত হবে। কিন্তু অন্যান্য কংগ্রেস নেতা এবং সন্ত্রাসবাদীরাও মনে করতো যে, মুসলমানরাও গেছে, মানে বাঁচা গেছে। তাঁরা বুঝতে পারেন নি যে, এইভাবে তাঁরা দেশভাগের পথটা শুধু পরিষ্কারই করছেন মাত্র। অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের কার্জন-বিরোধী আন্দোলনগুলি সবই ছিল অবিচেনাপ্রসূত এবং বহ্বাড়ম্বরে লঘুক্রিয়া অর্থাৎ তুচ্ছ বিষয় নিয়ে অনেক জল ঘোলা করা হয়েছিল। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কার্জন যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন তা আমরা ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে মেনে নিয়ে বাংলা ভাগ করেছি।

শাসমলকে কংগ্রেস থেকে অপসারণের আর একটা বড় কারণ হ'ল রাজনীতিক নেতা ও কর্ম্মীদের মধ্যে টাকাপয়সার ব্যাপারে যে দুর্নীতি ছিল সে-বিষয়ে তাঁর আপোষবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী ও তদনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সংশ্লিষ্ট উপর মহলে চাপ সৃষ্টি। আমাদের

অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, তৎকালে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধিকাংশ লোকেই ছিলেন বিবেকবান ও সৎ। পুলিশ বাহিনী ও আইন আদালতে টাকাপয়সার দুর্বলতা খুব বেশী ছিল না। দুর্নীতির যে একটি মাত্র সুরক্ষিত স্থান ছিল তা হ'ল বঙ্গীয় কংগ্রেস, বিশেষতঃ সেই দলটি যারা নিজেদিগকে গান্ধীবিরোধী বলত। শাসমল চিত্তরঞ্জনকে একখানি অপ্রকাশিত চিঠিতে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, তিনি যেন দুর্নীতির প্রশ্রয় না দেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ২২শে এপ্রিল তারিখের 'দি বেঙ্গলী' পত্রিকায় "ক্যালকাটা উইক্‌লি নোটস্"-এর প্রতিষ্ঠাতা যোগেশ চৌধুরীও অনুরূপ সতর্কতা অবলম্বনের কথা জানিয়েছিলেন। কংগ্রেস যেরূপ দ্রুত গতিতে বিশ্বাসঘাতক ও রাজনীতিক প্রতারকদের একটা আখড়া হয়ে যাচ্ছিল তা দেখে অবশেষে গান্ধীজীও ভীষণভাবে বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি অনেক বছর পরে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখের 'হরিজন' পত্রিকায় এক প্রবন্ধ লিখে একথা স্বীকার করেছিলেন। সরোজিনী নাইডু শাসমলচরিত্রের এই দিকটি তুলে ধরে বলেছিলেন—"দেশপ্রাণ শাসমল তাঁর ঋজু ও অকুতোভয় চরিত্র নিয়ে অসত্যের সঙ্গে আপোষ করতে ঘৃণা বোধ করতেন।"

এই কারণেই এই দ্রষ্টা-স্বদেশপ্রেমিক ও নিঃস্বার্থ নেতার জন্ম-শতবার্ষিক উৎসব পালন জাতির পক্ষে একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। জন্মশতবার্ষিক দিনটি আমাদের এই নেতাকে স্মরণ করার দিন; আর এই দিনটি আমাদের ভাল-মন্দ কাজের হিসাব-নিকাশেরও দিন।

এক আগুনের দুই শিখা : বীরেন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র

ডঃ সতীশচন্দ্র মাইকাপ, এম্. এ., পি-এইচ. ডি.

কলিকাতা, টালিগঞ্জস্থিত দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ ইনষ্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক

ইতিহাস রচনা ও তার ব্যাখ্যানে মানুষের মন যাহাতে কুয়াশাচ্ছন্ন না হয়, সে-বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। নতুবা তাহা সত্য বা যথার্থ ইতিহাস হইবার সম্ভাবনা হারায়। ফলে রাজনীতি-কূটনীতির অমোঘ বিষক্রিয়ায় অনেক সময় ভবিষ্যতের সমাজদেহ দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে, মানুষের অন্তরে অনেক শ্রদ্ধেয় ও শিক্ষণীয় বিষয়ও অশ্রদ্ধার ভারে অশুভ ফল দান করে।

বাংলার দুই দামাল সন্তান বীরেন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র। বীরেন্দ্রনাথ বয়সে সুভাষচন্দ্র অপেক্ষা প্রায় ষোল বৎসরের বড়—প্রথম জনের জন্মকাল ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ ও দ্বিতীয়জনের ১৮৯৭। দুইজনেই মহাতেজস্বী, বীর্যবান, উজ্জ্বল-ও-বিরলব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ। উভয়েই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অনুরক্ত এবং উভয়েই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ছিলেন। গান্ধীজী-পরিচালিত কংগ্রেসের আপোষ-আবেদন-নীতির নিকট তাঁহারা নিজ-নিজ আদর্শকে বিকাইয়া-বিলাইয়া দিতে পারেন নাই, তাঁহারা বিপ্লববাদী, সে-কারণে উভয়েই ঐ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইতিহাসেব সূক্ষ্ম বিচারে ঐ কারণেই অর্থাৎ ক্রমাগত আপোষ-আবেদন-নীতির বিরোধী চিন্তা-আদর্শের জন্যই সমগ্র দেশবাসীর শ্রদ্ধার শীর্ষদেশে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। উভয়কেই জীবনসাধনায় অনেক মূল্য দিতে হইয়াছিল; স্বদেশবাসীর নিকট অনেক নিগ্রহ-নির্য্যাতন, বিদেশী শাসকমণ্ডলীর নিকট অনেক ভ্রূকুটি ও রক্তচক্ষুর আঘাত এবং কারাবাস দণ্ড সহ্য

করিতে হইয়াছিল। তবুও দেশজননীর মুক্তিযজ্ঞে নিবেদিতপ্রাণ বীর পুরোহিতরূপে তাঁহারা নন্দিত ও বন্দিত।

ইংরেজ কর্তৃক ভারত শাসনের অধিকার হস্তান্তরের প্রত্যক্ষ কারণ যে নেতাজীর আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট-ফৌজের কার্য্যকলাপে ভারতের সৈন্যবাহিনীর ইংরেজ শাসনের প্রতি আনুগত্য লোপ, বোম্বাই নৌ-বিদ্রোহ এবং হিন্দু-মুসলিম-শিখ সকল সম্প্রদায়ের জাতীয় ঐক্য-বোধের উদ্বোধন—এই তত্ত্ব ও তথ্য আজ সর্ব্বত্র স্বীকৃত। কিন্তু কোন সময়ে ধূর্ত্ত ইঙ্গ-মার্কিন কূটনীতি ও ভারতের রক্ষণশীল রাজনীতি সুভাষচন্দ্রকে সেই স্বীকৃতি কি দিয়াছে? দেশভাগের পঁয়ত্রিশ বৎসর পরেও কি সেই অর্ধসত্য ঘোষণা ভারতের রাজধানী হইতে ধ্বনিত হয় না যে, গান্ধীজী ও তাঁহার অহিংস কংগ্রেস ভারতের স্বাধীনতা আনয়ন করিয়াছেন, যদিও তাঁহারাই মাতৃবক্ষ দ্বিধা-বিভক্ত করিয়াছিলেন?

একমাত্র হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও বিপ্লবের পথেই স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব, কেবল সমাজের মুষ্টিমেয় অভিজাত ব্যক্তির অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানেই সম্ভব নয়—অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত কৃষক-শ্রমিক জনমজুরের মধ্যে থাকিয়া তাহাদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগরণের দ্বারাই স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইবে—জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সম্মানিত নাগরিকরূপে স্বায়ত্তশাসন লাভ নয়, পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জনই কাম্য—দেশপ্রাণের এইসব আদর্শগত উক্তির জন্য কংগ্রেস হইতে তাঁহার বহিষ্কারের পশ্চাতে যে-ইতিহাস, আজ তাঁহার জন্মশতবর্ষে তাহার উদ্‌ঘাটন কতই না জ্বালাযন্ত্রণার বিষয়ে পরিণত হইতে পারে। কিন্তু সন-তারিখ-ঘটনা-সাক্ষ্য উপস্থিত করিয়া জাতীয় জননায়কদের একজনকে অপরের তুলনায় ক্ষুদ্র প্রমাণ করিবার চেষ্টায় ঐতিহাসিকের কলম কলঙ্কিত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু যে ব্যক্তি জীবিতাবস্থায় কোন নীতির নিকট কদাপি মস্তক অবনত করেন নাই এবং মৃত্যুর পর তাঁহার দেহকেও দণ্ডায়মান অবস্থায় দাহ করিবার

নির্দেশ দিয়া গিয়াছিলেন সেই দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথের দেশসেবার কিছু আদর্শের কথা অবশ্যই বলিতে হইবে এবং দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র ও দেশপ্রাণ শাসমল একে অপরের আদর্শের প্রতি, কি কারাগারের মধ্যে, কি জনসাধারণের সম্মুখে, কত প্রীতি ও শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিতেন এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা কিভাবে ঘটিতে পারে, তাহার রূপরেখা কিভাবে তাঁহারা কার্য্যকর করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত করিব।

দেশপ্রাণের বিপ্লববাদ ছিল তাঁহার নিজের কথায় এইরূপ ঃ "বাংলা তথা ভারতের পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবার একটিমাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা রহিয়াছে এবং তাহাকে লোকে চলতি ভাষায় রিভল্যুসন বা বিপ্লব বলে। রিভল্যুসন বা বিপ্লবকে নানা কারণে আমি স্বরাজ লাভের আদর্শ পন্থা বলিয়া মনে করি। এখানে দুইটি কারণের কথা উল্লেখ করিব।

"প্রথম, জগতের সকল স্বাধীন ও পরাধীন জাতির মধ্যে ইহার স্থান এখনও অতি উচ্চে। কেহ-কেহ বলিয়াছেন যে, রিভল্যুসন বা বিপ্লব হিংসামূলক, কেন না, ইহাতে রক্তপাত হয়, মানুষে-মানুষে মারামারি কাটাকাটি হয়। বাংলার রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সভাপতিরূপে আমি আজ সবিনয়ে তাহার প্রতিবাদ করিতেছি। রক্তপাত হইলেই যে তাহা হিংসাপ্রসূত, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে না।...মানুষে-মানুষে মারামারি কাটাকাটি হইলেই যে তাহা হিংসাপ্রসূত তাহাই বা কেমন করিয়া বলি? কোন পাষণ্ড যদি পথিপার্শ্বে কোন দুর্বল অবলাকে একলা পাইয়া তাহার উপর অত্যাচারের চেষ্টা করে এবং আমি যদি বিনা মারামারি ও কাটাকাটিতে তাহাকে সে কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে না পারি তবে আমার সেই মারামারি ও কাটাকাটিকে কেহ কি হিংসামূলক বলিবেন? হিংসার এইরূপ কদর্থে জগতের সৎ প্রবৃত্তিসমূহের যাবতীয় উৎস অচিরে শুষ্ক ও নীরস হইয়া যাইবে। ভিতরের উদ্দেশ্যকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া আমরা যদি কেবল বাহ্যিক

ক্রিয়াকলাপের দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহা হইলে পদে-পদে আমরা ভ্রমে নিপতিত হইব। তাহা হইলে গেরুয়া পরিয়া ডাকাতি করিতে গেলে কিম্বা হরিনাম করিতে করিতে কেহ অর্থলোভে মানুষ খুন করিলে ধর্মের নিকট তাহাকে পাপী এবং আইনের সম্মুখে তাহাকে দণ্ডনীয় করা যাইবে না। আমি একথা শতবার স্বীকার করি যে, হিংসা ভারতের প্রকৃতির বিরুদ্ধ। কিন্তু সে কারণে রিভল্যুসান বা বিপ্লব হিংসামূলক কে বলিল? কিম্বা তাহা ভারতের আদর্শবিরুদ্ধ হইবে কেন?

"আমি বিশ্বাস করি যে, আমার পরাধীন জন্মভূমিকে স্বাধীন করিবার আমার যদি 'ডিভাইন রাইট' থাকে তবে রিভল্যুসন-এর সাহায্যে তাহা কার্যে পরিণত করিবারও আমার 'ডিভাইন রাইট' রহিয়াছে।

"দ্বিতীয়তঃ, রিভল্যুসন-এর জন্য এ দেশকে প্রস্তুত করিতে হইলে, আমাদের যে নৈতিক, মানসিক ও দৈহিক শক্তি আবশ্যক হইবে তদ্দ্বারা আমরা রিভল্যুসন-এর পরের সমূহ সমস্যা সমাধান করিতে পারিব। অন্য সমস্ত পন্থাকে যে-পরিমাণে ধ্বংসমূলক বলা যায় এই পন্থাকে তুলনায় তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে গঠনমূলক বলিয়া স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য। কারণ 'সর্টকাট'-এ পৃথিবীর কোন দেশে রিভল্যুসান কখনও জয়যুক্ত হয় নাই, এখানেও বিনা গঠনমূলক কার্যে তাহা হইবে না।

"সুতরাং কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন যে, স্বরাজ কোন্ পথে, বাংলা তথা ভারতের পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জ্জনের আদর্শ পন্থা কি, তবে অবিসম্বাদিত চিত্তে বলিব—রিভল্যুসান-এর পথে, বিপ্লবের পথে, তাহা ছাড়া অন্য কোনও উপায়ই চিন্তা করা যায় না।"

উপরে উদ্ধৃত অংশ বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সভাপতি রূপে ১৯২৬ সালের ২১শে মে কৃষ্ণনগরে প্রদত্ত দেশপ্রাণ শাসমলের দীর্ঘ ভাষণের অংশ। ঐ একই ভাষণে তিনি বলিয়াছিলেন—"বিনা

বিচারে সুভাষচন্দ্র প্রভৃতিকে আটকাইয়া রাখিয়া গভর্ণমেণ্ট যে ভুল করিতেছে না, তাহা কে সাহস করিয়া বলিবে? সুভাষচন্দ্র ও সত্যেন্দ্রচন্দ্রের মত প্রতিভাশালী ও জনপ্রিয় বাঙ্গালী যুবকগণকে বিনা বিচারে মান্দালয়ের অস্বাস্থ্যকর স্থানে আবদ্ধ রাখিয়া গভর্ণমেণ্ট যে জনসাধারণের নিকট দিনে-দিনে হেয় এবং ঘৃণ্য প্রতিপন্ন হইতেছেন, তাহা বোধ হয় কাহাকেও স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না। বাহিরে কোন চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইতেছে না বলিয়া, সুভাষচন্দ্রের দুর্ভাগ্যে বাঙ্গালী যুবকগণের হৃদয়েও যে গভীর অশান্তির ভাব উদয় হয় নাই, ইহা মিথ্যা কথা। গভর্ণমেণ্ট যখন এই সত্যের আবিষ্কার করিবেন, তখন হয়তো কোন কিছু সংশোধনের আর সময় থাকিবে না।"

দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথের ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক আরোপিত ইউনিয়ন বোর্ড ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি অদ্ভুত বিস্ময়কর সম্ভবতঃ অতুলনীয় পরিচ্ছেদ। কারণ, এই আন্দোলন এমনই উত্তাল, শক্তিশালী ও পরিপূর্ণ হইয়াছিল যে, ঐ সময় সম্ভবতঃ বিশ্বের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী গভর্ণমেণ্ট ব্রিটিশ সরকার তাহাদের ঐ আইন প্রত্যাহার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিল। ইহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হয় যে, এই আন্দোলন ছিল পূর্ণ-মাত্রায় অহিংস ও নিরুপদ্রব। ১৯৪২এর অগ্নিগর্ভ মেদিনীপুর লাঠির সাহায্যে রাইফেল-মেসিনগানের সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল—পাখীর ঝাঁকের মত প্রাণ দিয়াছিল, কোন-কোন অঞ্চলে কিছুদিনের জন্য স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, কিন্তু ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থার সম্মুখে সকল দেশীবিদেশী মিলিটারী পুলিস, এমন কি, সৈন্যবাহিনীর সকল অত্যাচার পরাভূত হইয়াছিল। আপন-আপন ঘাড়ে করিয়া পুলিস কনস্টেবল শেষ পর্য্যন্ত লক্ষ-লক্ষ টাকার ক্রোক-করা জিনিসপত্র ঘরে-ঘরে ফেরত দিয়া আসিয়াছিল, কারণ সহস্র-সহস্র টাকার জিনিস এক-এক টাকায়ও কেহ নিলামে ক্রয় করে

নাই। সমস্ত শক্তি ও প্রেরণা ছিল একমাত্র দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের। ১৯৪২-এ স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুরের সর্বস্বদানেরও উৎস ছিলেন শাসমল। সে-সংগ্রামে প্রায় প্রতিটি গৃহ এক-একটি দুর্গে পরিণত হইয়াছিল। নেতাজী সুভাষচন্দ্র কর বন্ধ আন্দোলন প্রসঙ্গে তাঁহার 'দি ইনডিয়ান স্ট্রাগল' (The Indian Struggle) বইতে লিখিয়াছেন—

"Under the leadership of Mr. B. N. Sasmal, an advocate, the people of Midnapore started an agitation for the withdrawal of the Act (Village Self-Government Act) from their district, and to strengthen their demand they refused to pay the taxes imposed by the newly-established Union-Boards. The usual repressive measures were taken to force the new Act on the district. Forcible seizure of property, harassment and prosecution of the villagers, intimidation by military police and by soldiers—all were tried but without success The orgy of repression continued throughout the year 1921, but the Act had ultimately to be withdrawn in 1922. The success of this no-tax campaign gave considerable strength and self-confidence to the people of Midnapore and popularity to their leader, Mr. B. N. Sasmal."

গান্ধীজী-উদ্ভাবিত ও তাঁহার নিজের দ্বারা পরিচালিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সার্বিক জয় সম্ভবতঃ সেভাবে কোথাও কখনও হয় নাই, যেভাবে দেশপ্রাণের দ্বারা সংগঠিত উপর্যুক্ত অসহযোগ আন্দোলন সম্পূর্ণ সফল ও গৌরবময় হইয়াছিল। অথচ নেতাজী

সুভাষচন্দ্রের উল্লিখিত সপ্রশংস স্বীকৃতি ছাড়া কংগ্রেসের ইতিহাসে শাসমলের এই অপরূপ নেতৃত্বের উল্লেখ নাই। ইহা ঐতিহাসিক বিকৃতি ও হিংসামূলক মনোবিকার—সত্যের অপলাপ।

সুভাষচন্দ্রের প্রতি গান্ধী-নেহেরু-প্যাটেল প্রমুখ নেতার কি অদ্ভুত দৃষ্টিভঙ্গী, তাহা আজ সর্ব্বজনবিদিত। এ-বিষয়ে একটি ক্ষুদ্র উদাহরণই যথেষ্ট হইবে বিবেচনা করি। ১৮ই আগষ্ট, ১৯৪৫-এর সন্ধ্যায় বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হইয়াছে বলা হয়। জাপানের রাজধানী টোকিওতে দুইদিন নীরবতার পর তৃতীয় দিনে ২০শে আগষ্ট তাহা ঘোষণা করা মাত্রই স্বয়ং জওহরলাল নেহেরু দিল্লীতে তাহা নির্দ্বিধায় নির্বিস্ময়ে স্বীকার করিয়া লয়েন, ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়, তিনি প্রধান মন্ত্রীত্বে অধিষ্ঠিত হন—কে জানে, যদি নেতাজী জীবিত থাকিয়াও থাকেন। বহু কোটী মানুষ, ইংলণ্ড-আমেরিকার গোয়েন্দা বিভাগ, এমন কি, স্বয়ং গান্ধীজী যে সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন, অন্য কারুর লাশ হয়ত জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। একমাত্র ভারতীয় প্রত্যক্ষদর্শী হবিবুর রহমানের বর্ণনার একটা কথাও তিনি বিশ্বাস করেন নাই। তবু নেহেরুজী নেতাজীর সরকারী মৃত্যু হয়ত চাহিয়াছিলেন, সেইজন্য উহাই প্রচার করা হয়।

দেশপ্রাণ শাসমলের নিকট ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের উল্লিখিত পরাজয় শাসকগোষ্ঠীকে শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল, শঙ্কিত করিয়াছিল কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে, এইজন্য যে, তাহা হইলে এবার বাংলা কংগ্রেসের সে-সময়ের সর্ব্বাপেক্ষা খ্যাতনামা জননেতা—ক্ষুদ্র একটি গ্রামে যাঁহার উদ্ভব তিনি—আরও কত উচ্চপদের দিকেই না হস্ত প্রসারিত করিবেন। ক্ষুদ্র বীজপুরের শিবাজীর যে মহাপ্রকাশে বুঝি দিল্লীর মসনদ কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল, না, তাহা কদাপি হইতে দেওয়া যাইবে না। ঐ যে তাঁহার সেই বজ্রকণ্ঠ কোটী-কোটী বঞ্চিত-লাঞ্ছিত মানুষের বেদনায় আপ্লুত হইয়া সর্ব্বদিক পরিব্যাপ্ত করিয়া তুলিতেছে।

"For whom shall I live, if not for the people! I'm

born of the people, trusted by the people, I'll die for the people."—'কাহার জন্য আমি প্রাণ ধারণ করিব যদি না সাধারণ মানুষের সেবাকর্ম্মে নিজেকে সমর্পণ করি। জনসাধারণের মধ্য হইতেই ত' আমার উদ্ভব, উহাদের বিশ্বাসের মধ্যেই আমার অস্তিত্ব, উহাদের কারণেই আমি মৃত্যু বরণ করিয়া লইব'। কম্যুনিজম, সোস্যালিজম, ডেমোক্র্যাসী প্রভৃতি মতবাদের সম্বন্ধে বর্ত্তমান বিশ্ববাসীর যে ধারণা, তাহা এখন হইতে অর্দ্ধশতাব্দীরও বেশী পূর্ব্বে দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথের মতবাদের মধ্যে কত সুষমামণ্ডিত হইয়া তাঁহার জীবন ও কর্ম্মে প্রকটিত হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলে বিস্মিত হইতে হয়।

'The Indian Struggle' বইতে নেতাজী লিখিয়াছেন—"In Bengal, after the death of Deshabandhu Das, through the influence of the Mahatma, the late Mr. J. M. Sengupta had succeeded to the leadership. He had not been in office for a year before opposition to his leadership appeared. The opposition ultimately crystalised under the leadership of Mr. B. N. Sasmal, at one time a most popular figure in Bengal Congress Circles. The fight went on till 1927."

'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর বাংলায় মহাত্মার প্রভাবে স্বর্গত জে. এম. সেনগুপ্ত নেতৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যেই তাঁহাকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হইতে হইল। এই প্রতিপক্ষ এক সময়ে বাংলার কংগ্রেস মহলের সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় নেতা মিষ্টার বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং এই সংঘর্ষ ১৯২৭ সাল পর্য্যন্ত চলিয়াছিল।' ১৯২৬-এর কৃষ্ণনগর কংগ্রেস অধিবেশনের পর দেশপ্রাণ শাসমল পদত্যাগ তথা বহিষ্কারের দ্বারা কংগ্রেস রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু পরাধীনতার

জ্বালা ও দেশের দারিদ্র্য তাঁহাকে সমাজগঠনের দুরূহতর কর্ম্মে ব্রতী করিয়া তুলে।

আর নেতাজীর আদর্শ ও ত্যাগ, সে যেন এক রূপকথার ইতিহাস। দেশপ্রাণ শাসমল যে বলিয়াছিলেন 'রিভল্যুসন-এর জন্য এদেশকে প্রস্তুত করিতে হইলে, আমাদের যে নৈতিক, মানসিক ও দৈহিক শক্তির আবশ্যক হইবে, তদ্দ্বারা আমরা রিভল্যুসন-এর পরের সমূহ সমস্যা সমাধান করিতে পারিব'—তাহাই যেন প্রথম প্রকাশেই মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় সুভাষচন্দ্রের মধ্যে পরিস্ফুট হইল। সেকালে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিকে রাষ্ট্রপতি বলা হইত। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ ৫৩ বৎসর বয়সে গত হইয়াছেন। গান্ধী-নেহরু-প্যাটেল-আজাদ-কৃপালনী-নাইডুর মিলিত শক্তিতেও যখন তাঁহাদের মনোনীত প্রার্থী পরাধীন ভারতের সর্ব্বোচ্চ পদের জন্য নির্ব্বাচনে জয়ী হইতে পারিলেন না—বিপ্লবী যুবক সুভাষচন্দ্র বসুই পর-পর দুইবার ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হইলেন, আর রবীন্দ্রনাথ আশীর্ব্বাদ-অভিনন্দন জানাইলেন, তখন বিপক্ষদলের অন্তরের হিংসা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল—সুভাষচন্দ্রকে বাধাদান করা হইল, বহিষ্কার করা হইল, কারণ পন্থ-প্রস্তাব অনুসারে মহাত্মাজীর সমর্থন না হইলে যে কিছুই হইতে পারিবে না। অতএব সুভাষচন্দ্রের বিদায় এবং দেশজননীর মুক্তির জন্যই তাঁহার দেশত্যাগ। পর্ব্বতমালা, সমুদ্র, সৈন্যসামন্ত, কামান-শ্রেণী, মাইন, টর্পেডো সহস্র গোয়েন্দা নেকড়ের কোন ভয়ভীতিই এই মহাজীবনের দুর্দ্দমনীয় গতিপ্রবাহকে রোধ করিতে পারিল না। মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত সন্ন্যাসীর জীবনকুসুম যে পুষ্পাঞ্জলি দানের জন্যই প্রস্ফুটিত এবং সেইভাবেই আত্মোৎসর্গ, সেইভাবেই হয়তো বা মাতৃপূজার মহাযজ্ঞে নিজেকে আহুতি দান।

দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথের জীবনের পরিসমাপ্তি—সেও এক প্রেরণা ও প্রাণের মহতাদর্শের কথা। "দাঁড়াইব কি? যেখানে সত্য কথা বলিলে censure (নিন্দা) ভোগ করিতে হয় সে রকম রাজনীতিতে

আমি থাকি না; দুই-দুইবার যাহার উপর no-confidence (অনাস্থা) প্রকাশ করা হইয়াছে, সে কাহার ভরসায় দাঁড়াইবে? কংগ্রেসের কাহাকেও আমি বিশ্বাস করি না।" বিড়লা ভবনে বসিয়া পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য দেশপ্রাণের এইরূপ কথায় বিচলিত হইলেন। মালব্যজী বলিলেন—"একবার বাংলার কথা ভাবিয়া দেখ। ব্যবস্থা পরিষদে এক নিয়োগী (৺ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী) ছাড়া বাংলার আর কেহ আমল পায় না।...আমি বিদ্যাসাগর হইতে আরম্ভ করিয়া চিত্তরঞ্জন পর্য্যন্ত বাংলার নেতৃত্ব দেখিয়াছি, কিন্তু এমন দুরবস্থা আর দেখি নাই। বাংলা কি সহসা তাহার সমস্ত শক্তি কর্ম্মক্ষেত্র হইতে ফিরাইয়া লইল, তোমরা যে যাহার ঘরে বসিয়া রহিবে; আর বাংলা-দেশ এমন করিয়া ডুবিবে তাহাই চাহিয়া দেখিবে?"

মালব্যজীর প্রদীপ্ত নেত্রের দিকে চাহিয়া বাংলার কথা শুনিতে-শুনিতে শাসমল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন। বহুবেদনাভরা অভিমান সরিয়া গেল, বলিলেন, "রাজী হইলাম, দাঁড়াইব।" ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভ্যপ্রার্থী হইলেন বীরেন্দ্রনাথ। সেকালের নিয়মে বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী, হাওড়া, বীরভূম ও মেদিনীপুর এই ছয়টি জেলা লইয়া মিলিত বর্ধমান বিভাগ কেন্দ্র হইতে অমুসলমান নাগরিকদের জন্য একটি মাত্র আসন ব্যবস্থা পরিষদে নির্দ্দিষ্ট ছিল। অন্য দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিয়া দেশপ্রাণ শাসমল জয়ী হইলেন এবং সেই জয়বার্ত্তা ঘোষণার দিনই মেদিনীপুর হইতে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তনের পথে সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হইলেন। জীবনবেদীর বহু উর্দ্ধে যে অদৃশ্য আসনটি অনন্তকালের জন্য নির্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, সেই স্থানেই তিনি যাত্রা করিলেন এবং বীরের মত। বিশ্ব-ইতিহাসে একটি অতুলনীয় নজির লিপিবদ্ধ হইল। জ্বলন্ত চিতার উর্দ্ধগামী সহস্র শিখার মধ্যে দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল উর্দ্ধশির দীপ্তিতে চির-ভাস্বর রহিয়া গেলেন।*

---

* ঋণ স্বীকার :—(১) দি ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগ্‌ল্‌—সুভাষচন্দ্র বোস, (২) ইণ্ডিয়া উইন্‌স্‌ ফ্রিড্‌ম্‌—আবুল কালাম আজাদ, (৩) স্রোতের তৃণ—বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, (৪) স্বাধীনতার ফাঁকি—ডঃ বিমলানন্দ শাসমল, (৫) দেশপ্রাণ শাসমল—শ্রীপ্রমথনাথ পাল, (৬) স্বাধীনতাসংগ্রামে মেদিনীপুর—বসন্তকুমার দাস।

ভারতপথিক দেশপ্রাণের আধ্যাত্মিকতা

শ্রীবেণীমাধব শাসমল

নিষ্ঠাবান হিন্দু পরিবারে ও প্রাচীন জমিদার বংশে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথের জন্ম। মাতাপিতার ধর্ম্মানুশীলনের ফলে শিশু বীরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে ধর্ম্মের প্রতি আকর্ষণ অঙ্কুরিত হয়। লেখাপড়ার সঙ্গে-সঙ্গে দেহ-মন-আত্মার সামঞ্জস্যমূলক উন্নতির ব্যবস্থা করেন মাতাপিতা।

হিন্দুধর্ম্মের অনুশীলনের তিনটি প্রধান পথ। এক শ্রেণীর মানুষ প্রতিমাপূজা বা মূর্ত্তিপূজার মাধ্যমে ভগবানের আরাধনা করেন। এক শ্রেণীর মানুষ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার মাধ্যমে এবং অপর শ্রেণীর মানুষ পতঞ্জলি ঋষি প্রদর্শিত যোগসূত্র অবলম্বনে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেন।

বীরেন্দ্রনাথের মাতৃদেবী অত্যন্ত দয়াবতী রমণী ছিলেন। তিনি সেকালের পল্লী অঞ্চলের পুরাতন শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারের পর্দ্দানসীন মহিলা হইলেও তাঁহার মধ্যে ধর্ম্মের গোঁড়ামী ও সামাজিকতা-আচারাদি পালনের অন্ধ ও অর্থহীন সংস্কার ছিল না। তখনও তাঁহাদের গ্রামে মানবপূজারী স্বামী বিবেকানন্দের নিছক মানবসেবামূলক অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের উপদেশ বা পরবর্ত্তীকালের গান্ধীজীর রাজনীতিক স্বার্থসাধনকৌশলসম্পৃক্ত অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ প্রয়াসের বার্ত্তাও গিয়া পৌঁছে নাই। কিন্তু বীরেন্দ্রজননী সে-যুগেও অস্পৃশ্যতা পরিহার করিয়া চলিতেন। বোধ হয়, মুখে-মুখে প্রচারিত চৈতন্যদেবের বাণী তাঁহার অন্তর স্পর্শ ও উদ্দীপ্ত করিয়া তাঁহার প্রাণ-মন আলোকিত করিয়া তুলিয়াছিল। এই সংস্কারমুক্ত পরিবেশে বীরেন্দ্রনাথ এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিপিনচন্দ্র ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা

যোগেন্দ্রনাথ মানুষ হইয়াছিলেন। বিপিনচন্দ্র ও যোগেন্দ্রনাথ বড় হইয়া লেখাপড়া শিখিয়া ব্রাহ্মমতাবলম্বী হন। কিন্তু বীরেন্দ্রনাথ মাতার স্থায় গোঁড়ামিবর্জ্জিত হিন্দুধর্ম্মের অনুশীলন করিতেন। মানবসেবাই ছিল তাঁহার মুখ্য লক্ষ্য ও আদর্শ।

দেশপ্রাণ শাসমল অধ্যাত্ম শক্তিবলে বলীয়ান ছিলেন। নিজের জীবন ও কর্ম্মশক্তিকে ভগবানের ইচ্ছাশক্তিপ্রবাহ মনে করিতেন। আপন ইচ্ছাকে শ্রীভগবানের ইচ্ছা বলিয়া জানিতেন। অহঙ্কার তাঁহার মনে কখনও স্থান পায় নাই। প্রেসিডেন্সি কারাগারে বন্দী জীবন-যাপনকালে বীরেন্দ্রনাথ "স্রোতের তৃণ" গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। এই পবিত্র গ্রন্থে তাঁহার আধ্যাত্মিক সাধনার চিন্তাধারা প্রকট হইয়াছে। কারাগার তাঁহার কাছে আশ্রমস্বরূপ ছিল। তাঁহার অন্তরের কথা হইল মানুষ অধ্যাত্ম সম্পদের অধিকারী হইলে পৃথিবীর কোন শক্তি তাহার মনোবলকে পরাস্ত করিতে পারে না।

এক সময় বঙ্গদেশের লাটসাহেব দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথকে মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। তখন বীরেন্দ্রনাথ লাটসাহেবকে বলেন—"আমি জানতাম ইংরেজ জাতি বুদ্ধিমান, কিন্তু এখন বুঝলাম তাদের বুদ্ধি কম, নতুবা তারা আমাকে মন্ত্রীত্বের লোভ দেখাতে চায় কেন।" দেশমাতৃকার চরণে যিনি সর্ব্বসুখ উৎসর্গ করিয়াছেন, দেশমাতৃকার মুক্তি যাঁহার ব্রত তিনি কি কখনও প্রলোভনে বা আত্মসুখে কর্ত্তব্য ভুলিতে পারেন ?

"সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই" ভক্তপ্রধান চণ্ডীদাসের এই উক্তি বীরেন্দ্রনাথ হৃদয়ে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেজন্য তাঁহার আচরণে ও আহ্বানে আকৃষ্ট হইয়া আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সমগ্র মেদিনীপুরবাসী সর্ব্বসুখ বিসর্জ্জন দিয়া সর্ব্বপ্রকার লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া আইন অমান্য আন্দোলনকে সফল করিয়া তুলিয়াছিলেন। জেলার প্রত্যেক স্বাধীনতা-আন্দোলনকর্ম্মী তাঁহার এই আদর্শ কার্য্যকে শ্রদ্ধা জানাইয়াছিলেন।

"জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।" যুগাচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দের এই বাণী বীরেন্দ্রনাথ নিজ জীবনে সার্থক করিয়া তুলেন। আপন-পর বিচার তাঁহার ছিল না। ঐশ্বর্য্যের লোভ বিলাসিতার লোভ বিসর্জ্জন দিয়া সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর বেশে তিনি যেদিন জনসেবায় জীবন উৎসর্গ করেন, সেদিন তাঁহার সম্বল ছিল ভগবানের ইচ্ছার উপর একান্ত নির্ভরশীলতা। আমরা যদি তাঁহার আদর্শ গ্রহণ করিতাম তবে ভারতের চেহারা কত উন্নত হইত। "দেখিয়া ভারতে পুনঃ জাতির উত্থান—জগজন মানিবে বিস্ময়" কবির এই আশা রূপায়িত হইত। আজ যদি দেশের প্রথম শ্রেণীর মানুষ মহাপুরুষদের আদর্শ রূপায়ণকে প্রাধান্য দিতেন তাহা হইলে দেশের মানুষ আত্মকেন্দ্রিক হইত না। দেশভাগের পর চৌত্রিশ বৎসরে আমরা ক্রমে-ক্রমে ঈশ্বর ভুলিয়া বসিয়াছি। ছাত্রদিগকে রামায়ণ, মহাভারত ও গীতাশাস্ত্রের অনুশীলন করানোও ভুলিয়াছি—সেইজন্য আমাদের এত দুর্দ্দশা।

ভারতের যে সকল মহান্ সন্তান এদেশের রাষ্ট্রনীতিক মুক্তির জন্য বিপ্লবী দলে যোগদান করেন এবং আত্মাহুতি দেন, তাঁহাদের শিক্ষার প্রধান বিষয়বস্তু ছিল—এই দেহ নশ্বর, দেহস্থিত আত্মা অমর ; দেহের মৃত্যু আছে, আত্মার মৃত্যু নেই। গীতা ও চণ্ডী তাঁহাদের মনোবল বৃদ্ধির উৎস ছিল। তাঁহাদের হৃদয়ের মণিকোঠায় এই সব গ্রন্থের অধ্যাত্ম সম্পদ স্থান পাইয়াছিল। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথও এই "কোটি"র মানুষ ছিলেন।

আর্য্য-সভ্যতার প্রথম হইতে ভারতীয় সমাজে প্রত্যেক মানুষের জীবনকাল চারটি আশ্রমের মাধ্যমে বিকশিত হইত। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ। বীরেন্দ্রনাথের মাতাপিতা এই আশ্রম-আদর্শে পুত্রগণকে প্রকৃত মানুষ করার প্রয়াস পান।

রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনা "পদপ্রান্তে রাখ সেবকে, শান্তিসদন সাধন-ধন দেব দেব হে," বীরেন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করিয়াছিল। হরিনাম

মাধ্যমে সংশোধনবাদের প্রবক্তা শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবপ্রচারিত সংকীর্তন আসরে যোগদানের সুযোগ পাইলেই তিনি যোগ দিতেন, আত্ম-ভোলা হইতেন, আত্মোৎসর্গের তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ হইতেন।

বীরেন্দ্রনাথ যে তাঁহার জীবনের প্রথম হইতে পূর্ণ ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁহার মধ্যে যথেষ্ট কবিত্বশক্তি ছিল তাহা তাঁহার রচিত কবিতাবলী হইতে পরিস্ফুট হয়। এখানে তাঁহার একটি কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি :

কৃপাভিক্ষা

(১)

হরি। রাজা তুমি মোর, আমি প্রজা তব,
এ জীবনটুকু তোমারি দান।
তোমার হাতের গড়া এ পুতুল
তোমা হ'তে সে তো পেয়েছে প্রাণ।

(২)

তোমার শকতি সারা হৃদিময়
শিরাধমনীতে খেলিছে খেলা,
শয়নে স্বপনে আহারে বিহারে
সন্ধ্যা কি সুখের সকাল বেলা।

(৩)

তোমার ইচ্ছায় এ সৌরজগতে
আরো কোটি-কোটি কেমনে চলে,
এ ক্ষুদ্র নগণ্য এতটুকু আমি
চলিব তো প্রভু তোমারি বলে।

(৪)

কোথায় কি কাজ করিতে হইবে
কাহার কারণে কিসের তরে,

তব তাড়নায় পারিব কি হরি,
সবটুকু দিতে হৃদয় ভরে'।

(৫)

তোমার সুখের এ জগৎ মাঝে
দুঃখ খুঁজি-খুঁজি হারায়ে যাব,
পতিত পাতিত কাঙ্গালের হৃদে
কভু কি গো প্রভু বিরাম পাব।

(৬)

চিরহাস্যময় ধনকোলাহলে
চিরদিন কি গো পরের লাগি'
শোষিতের পাশে তোমার কৃপায়
সহ-অনুভূতি রহিবে জাগি'?

(৭)

পরদুঃখ হেরি' নয়নের কোণে
বিষাদের লোর আসিবে ভাসি'
পরসুখ শুনি' এ মুখ ভরিয়া
উঠিবে কি ফুটি' সরল হাসি?

(৮)

অতি ছোট আমি কোন গুণ নাই,
তুমি যদি দয়া না কর নাথ,
কি ক্ষমতা আছে—উঠিব অতটা
তুমি যদি বিভু না ধর হাত।

বীরেন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকীর শুভলগ্নে ভক্তিবিনম্র চিত্তে তাঁহাকে শ্রদ্ধা জানাই। আর আমরা সকল দেশবাসী যেন তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করিয়া ভারতীয় মহাজাতি গঠনের স্বপ্নকে রূপায়িত করিতে পারি—পরম মঙ্গলময়ের পদপ্রান্তে এই প্রার্থনা করি।

জননায়ক দেশপ্রাণের মৌল অবদান

অধ্যাপক সমর গুহ

ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামের যুগে যে কয়জন জননেতার আবির্ভাব ঘটেছিল সেদিনের অখণ্ড বাংলায়, বীরেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। অন্যতম বললেও বীরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বের যথার্থ মূল্যায়ন হয় না,—বস্তুত, নেতৃত্বের মৌলিকতায় তাঁর স্থান ছিল অনন্য। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং পরোক্ষভাবে গান্ধীজীও বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বীরেন্দ্রনাথের স্থান নির্ণয় করেছিলেন চিত্তরঞ্জন দাসের পরেই। চিত্তরঞ্জন জনচিত্ত রঞ্জন করে জনসম্ভাষণ লাভ করেছিলেন 'দেশবন্ধু' রূপে এবং সেভাবেই বীরেন্দ্রনাথও জনমনে স্থান লাভ করেছিলেন 'দেশপ্রাণ' এই আন্তরিক সম্বোধনে।

চিত্তরঞ্জন জননেতার সমাদর লাভ করেছিলেন তাঁর উচ্চ আদর্শ ও মহান্ ত্যাগের পরোক্ষ অবদানে। কিন্তু বীরেন্দ্রনাথের নেতৃত্ব গড়ে উঠেছিল প্রত্যক্ষ গণ-সংযোগ এবং গণ-সংগ্রামের ফলশ্রুতিরূপে। স্বাধীনতাসংগ্রামের যুগে কংগ্রেসী নেতারূপে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন অনেকে, কিন্তু অসহযোগের অধ্যায়ে যুক্ত বাংলার জনসাধারণের ভিতর থেকে জননায়করূপে আবির্ভাব ঘটেছিল একজন মাত্র ব্যক্তির এবং তিনি হলেন দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। অন্যান্য নেতা ছিলেন দলীয় নেতা অথবা সহুরে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নেতা। তাঁদের নেতৃত্বের গুরুত্ব প্রচার হয়েছে সংবাদপত্রের মাধ্যমে, কিন্তু সেযুগে সর্বশ্রেণীর গ্রামীন জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতিতে এবং সহরের নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের শ্রদ্ধায় যাঁর পরিচয় গড়ে উঠেছিল জননায়করূপে তিনি বীরেন্দ্রনাথ শাসমল।

অসহযোগকালে এবং তার পরবর্তী যুগে মাত্র দু'জন যথার্থ জননেতার উদ্ভব হয়েছিল যুক্ত বাংলার জনজীবনে। তাঁদের একজন ছিলেন বরিশালের ফজলুল হক এবং অপরজন মেদিনীপুরের বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। অন্যান্য নেতার জন্মক্ষেত্র ছিল সহর এবং তাঁরা ছিলেন সহুরে নেতা,—যে গ্রামীন বাংলায় জনগণের বাস সেই মাটির নেতা, গ্রামীন নেতা তাঁরা নন। মাত্র দু'জন নেতা—বীরেন্দ্রনাথ ও ফজলুল হকের উদ্ভব হয়েছিল গ্রামের মাটি থেকে, গ্রামীন মানুষের স্বতোৎসারিত জনপ্রিয়তা থেকে। বীরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বের মৌলিকত্ব এখানে। দেশভাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মুসলীম সমাজের বিস্তৃতি ছিল সহরে নয়,—প্রধানতঃ গ্রামে। তাই, ফজলুল হকের নেতৃত্বকে বিশেষ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়নি—তাঁর নেতৃত্ব ছিল অব্যাহত। কিন্তু সেযুগে বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামের ভিত্তিভূমি ছিল প্রধানত মধ্যবিত্ত হিন্দু সম্প্রদায় এবং তাদের প্রাধান্য ছিল যেমন গ্রামে তেমনি সহর-জীবনে। সহরই নিয়ন্ত্রণ করতো স্বাধীনতাসংগ্রামের সংগঠন ও নেতৃত্ব। এই সহুরে নেতৃত্ব বীরেন্দ্রনাথের জননেতৃত্বকে সাদরে বরণ করেনি। তারই ফলে অপূর্ব্ব জননেতৃত্বের কৃতিত্ব ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেও সহরের নেতৃত্বের কিছুসংখ্যক নেতার সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা ডিঙিয়ে বীরেন্দ্রনাথের পক্ষে স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাসের নিষ্কণ্টক ও সর্ব্বোচ্চ সাংগঠনিক নেতৃত্ব লাভ করা সম্ভব হয়নি—যদিও জনচিত্তে তাঁর স্থান ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বীরেন্দ্রনাথ যদি দেশবন্ধুর পরে বাংলা কংগ্রেসের নেতারূপে সকলের স্বীকৃতি লাভ করতেন তা'হলে বাংলাদেশের কংগ্রেসের সাংগঠনিক প্রকৃতি এবং জনসংযোগের প্রকৃতিও ভিন্ন তাৎপর্য্য লাভ করতো—সেদিনের জাতীয় কংগ্রেস যথার্থ জনসংগঠনে পরিণত হতো।

প্রথম অসহযোগীর প্রথম প্রত্যক্ষ রাজনীতিক গণসংগ্রাম

অসহযোগ আন্দোলনের পথিকৃৎ ও প্রবক্তা ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। সর্ব্বভারতের এই অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম সমর্থক ও সহযোগী

বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। শুধু অসহযোগের পথে তিনি প্রথম পদক্ষেপ করেন নি,—সারা ভারতে তিনিই সর্ব্বপ্রথম ব্যক্তিগত দায়িত্বে একটি ঐতিহাসিক গণসংগ্রাম পরিচালনা করেন ১৯২১ খৃষ্টাব্দে। এই দিক থেকে গান্ধীযুগে নূতন গণ-আন্দোলনের ঐতিহ্য প্রবর্ত্তনে বীরেন্দ্রনাথ সারা ভারতের পথিকৃৎ। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেওয়ার আগে গান্ধীজী কংগ্রেস নেতা হিসাবে চম্পারণ ও খয়রাতে কৃষক আন্দোলন করেছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে এই দুটি ছিল জনস্তরের সর্ব্বপ্রথম আন্দোলন। কিন্তু গান্ধীজীর এই আন্দোলনের ক্ষেত্র শুধু কৃষক এবং নীলচাষী কৃষকদের মধ্যে সীমিত ছিল। এই সীমিত কৃষক আন্দোলন সর্ব্বস্তরের জনসাধারণের সংগ্রাম ছিল না এবং কোন সরকারী আইনকে চ্যালেঞ্জ করে প্রত্যক্ষ কোন সরকারবিরোধী আন্দোলনও ছিল না। কিন্তু বীরেন্দ্রনাথ যে গণ-সংগ্রাম পরিচালনা করেন তা' ছিল সর্ব্বস্তরের গ্রামীন জনসাধারণের আন্দোলন এবং এই আন্দোলন ছিল ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্ব শাসন আইনের বিরুদ্ধে চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধের। এই আন্দোলনটি ছিল সর্ব্বভারতীয় ক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রথম সরকারবিরোধী আইন-অমান্যের আন্দোলন।

গান্ধী-নেতৃত্বের অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ছিল নগণ্যসংখ্যক বিপ্লবীদের কার্য্যক্রমে এবং কনস্টিটিউশন রিফর্ম্ম (শাসন ব্যবস্থা সংস্কার)-এর জন্য কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনের প্রস্তাব পাশের কর্ম্মসূচীতে। কি বিপ্লবী, কি কংগ্রেসী—কারও কার্য্যক্রমের পরিধিতে জনগণের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের কোন অবকাশ ছিল না। গান্ধীজীর নেতৃত্বে সর্ব্বপ্রথম সুযোগ এল গণসংযোগ এবং গণ-আন্দোলনের। গান্ধীজীই সর্ব্বপ্রথম কংগ্রেসকে গণ-প্রতিষ্ঠানে এবং ভারতের স্বরাজ আন্দোলনকে জনসাধারণের আন্দোলনে রূপান্তরিত করার কার্য্যক্রম নিয়ে অগ্রসর হলেন। তিনি ডাক দিলেন অসহযোগ আন্দোলনের,—সংগ্রামী পন্থারূপে দিলেন অহিংস ও শান্তিবাদী অসহযোগ, বয়কট ও আইন অমান্যের ত্রয়ী কর্ম্মসূচী।

বীরেন্দ্রনাথের মনে প্রশ্ন উঠলো,—কারা এই জনগণ? সহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেই কি সীমাবদ্ধ থাকবে এই জনগণের সংজ্ঞা? গান্ধীজী চেয়েছেন জনগণকে অসহযোগ আন্দোলনের শরীক করতে। বীরেন্দ্রনাথ ভাবলেন চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধের আন্দোলন যদি আরম্ভ করা যায় তা হলে গ্রামীণ বাংলার সর্ব্বশ্রেণীর জনসাধারণকে অসহযোগ আন্দোলনে টেনে আনা যাবে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে বরিশালের কংগ্রেস সম্মেলনে তিনি এই চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধের প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিলেন। কিন্তু তখনও প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হয়নি এবং তখনও গ্রাম্য জীবনে কংগ্রেসের নেতৃত্বে জমিদার-শ্রেণীর ছিল প্রচণ্ড প্রতাপ। এই ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন হয়তো শেষে জমিদারীর খাজনাবন্ধের আন্দোলনে পরিণত হবে। এই আশংকায় বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির এক বিশেষ অধিবেশনে বরিশালের প্রস্তাব বাতিল করে দেওয়া হ'ল। বীরেন্দ্রনাথের সংগ্রাম পরিকল্পনা সম্বন্ধে অপ্রত্যাশিতভাবে গান্ধীজীও অসম্মতি জ্ঞাপন করলেন। দুরূহ বাধা সৃষ্টি হ'ল বীরেন্দ্রনাথের সামনে। কি করবেন তিনি—পিছে হটে যাবেন,—না, বিদ্রোহীর ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে যাবেন গণ-সংগ্রামের কর্ম্মসূচী রূপায়নে।

বীরেন্দ্রনাথের চরিত্রে ছিল দুর্জ্জয় আত্মবিশ্বাস—তিনি কৃতনিশ্চয় ছিলেন তাঁর সংগ্রামী পরিকল্পনার রাজনীতিক ও সামাজিক উপযোগিতা এবং সাফল্য সম্বন্ধে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধের যৌক্তিকতা দেখিয়ে কর্ত্তৃপক্ষকে এক দীর্ঘ চিঠি দিলেন তিনি। ট্যাক্স বন্ধের স্বপক্ষে যুক্তি, তর্ক ও বিচারের এক ঐতিহাসিক দলিল এই চিঠিটি। এই চিঠিতে তিনি স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিলেন যে, নিতান্ত রাজনীতিক উদ্দেশ্যেই তিনি এই আন্দোলনে অগ্রণী হননি,—তিনি এই সংগ্রাম আরম্ভ করছেন গ্রামীণ জনগণের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে। বীরেন্দ্রনাথ ১৯২০ খৃষ্টাব্দে নাগপুর কংগ্রেস থেকে ফিরেই কংগ্রেসের অসহযোগ এবং কোর্ট-কাচারী বয়কটের সিদ্ধান্ত

কার্য্যকরী করার সংকল্পে সমগ্র বাংলাদেশে সর্ব্বপ্রথম আইন ব্যবসা বর্জ্জন করলেন। তখনও সত্যাগ্রহ কাজটির প্রচলন করেন নি গান্ধীজী —তাই প্রথম অসহযোগীর গৌরব অর্জ্জন করলেন কাঁথির বীরেন্দ্রনাথ। খাজনা বন্ধের যে আন্দোলন তিনি আরম্ভ করলেন তার কার্য্যক্রমেও সর্ব্বপ্রথম তিনিই সরকারকে তাঁর চৌকিদারী ট্যাক্স না-দেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানালেন এবং জানালেন যে, তিনি এই খাজনা বন্ধ আন্দোলনের সংকল্প নিয়েছেন নিজের ব্যক্তিগত দায়িত্বে—কংগ্রেসের পদাধিকারীরূপে নয়। সর্ব্বপ্রথম নিজে আইন অমান্য করবার সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি সরকারকে লিখলেন: "I have decided not to pay any tax or rate under the Bengal Village Self-Government Act···in my individual capacity." দীর্ঘ পত্রের একাংশে স্বায়ত্বশাসন আইনটির অন্তঃসারশূন্যতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি জানালেন:—"The Act does not make any provision, nor does it say that the Union Board will be able to chalk-out their own educational policy and impart such moral, spiritual and special political training as are absolutely necessary for Village Self-Government. (The) Government derive from every Union in Bengal certain income annually....as land revenue, road cess, public works cess, court fees, excise and so on and if all or a good portion of these incomes had been handed over to the Union Board for education, sanitation and other purposes....it could then possibly be said that it is Self-Government, which the Act has given us." তিনি আরও দেখালেন যে, এই আইন কার্য্যকরী হলে শীঘ্রই ভূমিকর ২৫ থেকে ৩০ গুণ বৃদ্ধি করা হবে।

যে লবণ-কর বন্ধের দাবীতে গান্ধীজী ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের লবণ-আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করেন, সেই লবণ-কর সম্বন্ধেও এই পত্রে সর্ব্বপ্রথম ১৯২১ খৃষ্টাব্দে প্রতিবাদের ধ্বনি তোলেন বীরেন্দ্রনাথ।

যে ইউনিয়ন বোর্ড বর্জ্জন আন্দোলন বীরেন্দ্রনাথ পরিচালনা করেন তা ছিল গান্ধী-নীতি অনুযায়ী সম্পূর্ণরূপে শান্তিপূর্ণ ও অহিংস। সর্ব্বশ্রেণীর মানুষ এই আন্দোলনে যোগ দেন এবং এই ইউনিয়ন বোর্ডের করবন্ধ আন্দোলন এক সার্ব্বজনীন সংগ্রামের রূপ ধারণ করে। সরকারের সঙ্গে জনগণের অসহযোগিতা এমন এক সামগ্রিক রূপ লাভ করে যে, পুলিসী হুমকি, ধমক, নির্য্যাতন এবং স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও নীলামের সমস্ত সরকারী দমননীতি ব্যর্থ হয়ে যায়। এমন সর্ব্বাত্মক অহিংস এবং সর্ব্বভাবে সফল ও সার্থক গণসংগ্রাম এর আগে ভারতের কোথাও দেখা যায়নি। এই সংগ্রামেই সর্ব্বপ্রথম সরকারী আইন অমান্য করে কারাবরণের নজীর সৃষ্টি হয়। বস্তুতঃ, মেদিনীপুরের ইউনিয়ন বোর্ড আন্দোলনটি ছিল গান্ধী-পরিকল্পিত অসহযোগ আন্দোলনের অগ্রণী পথ-প্রদর্শক পদক্ষেপ (পাইওনিয়ারিং মুভ)। এই আন্দোলনের কাছে ব্রিটিশ সরকার মাথা নত করতে বাধ্য হয়। জনগণের কাছে এমন পরাজয় স্বীকার বৃটিশ সরকার পূর্ব্বে আর কখনও করে নেয় নি। তারা মেদিনীপুর জেলার ২৩৫টি ইউনিয়ন বোর্ডের সব কয়টি বাতিল করে দিতে বাধ্য হয়। এমন কি, বীরেন্দ্রনাথের জীবনকালে এই ইউনিয়ন বোর্ডগুলি পুনরায় কার্য্যকরী করতে এই সরকার সাহসী হয় নি।

বীরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে পরিচালিত গণ-সংগ্রামের এই অপূর্ব্ব বিজয়ের পরে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় আবেগভরে এই গণ-সংগ্রামের জননায়ককে 'Uncrowned king of Midnapur' অর্থাৎ মেদিনীপুরের মুকুটহীন রাজা নামে সম্ভাষিত করেন এবং জনগণ বীরেন্দ্রনাথকে বরণ করেন বাংলার 'দেশপ্রাণ' আখ্যার মহান গৌরবের আসনে।

মেদিনীপুর বনাম বারদোলী

যে গান্ধী-পন্থী আন্দোলনকে ইতিহাসে সত্যাগ্রহ আন্দোলন নামে অভিহিত করা হয়েছে, সেই আন্দোলনের ইতিহাসে মেদিনীপুরের এই চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনের স্থান অদ্বিতীয়। এই গণ-সত্যাগ্রহের আট বছর পরে বল্লভভাই প্যাটেল গুজরাটের বারদোলী তালুকে ভূমিকর বন্ধের সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনা করেন। ১৯২২ সালে স্বয়ং গান্ধীজীর এই সংগ্রাম পরিচালনার কথা ছিল, কিন্তু চৌরিচৌরার হিংসাত্মক ঘটনার ফলে এই সত্যাগ্রহ বন্ধ হয়ে যায়। গান্ধীজী ও সমগ্র কংগ্রেসের পূর্ণ সমর্থনে এবং উচ্চস্তরের বিভিন্ন কংগ্রেস নেতার সাহচর্যে ২৫০ জন কংগ্রেস-মনোনীত স্বেচ্ছাসেবকের সহযোগিতায় এই বারদোলী সত্যাগ্রহ পরিচালিত হয়। প্রায় ছয় মাস সত্যাগ্রহের পরে ১৬ শতাংশ খাজনা হ্রাস হলে এই আন্দোলন বন্ধ হয়।

বারদোলী সত্যাগ্রহকে "a landmark in the history of Satyagraha movement in India"—বলা হয়েছে। এই সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে কংগ্রেসের ইতিহাসে লেখা হয়েছে যে, এই আন্দোলন প্রতিরোধ করবার জন্য, "The Goverment tried flattery, bribery, threats, fines, imprisonment, forfeiture and lathi charges. It attempted to divide communities. Property on a large scale was attached and sold to ontsiders, as no local buyers came forward.

যে দমনমূলক পদ্ধতি বৃটিশ সরকার বীরেন্দ্রনাথের আন্দোলনের আট বছর পরে বারদোলী সত্যাগ্রহ দমনের জন্য প্রয়োগ করেছিল—তার সব কয়টিই তারা প্রয়োগ করেছিল কাঁথি-তমলুক তথা মেদিনীপুরের সত্যাগ্রহ আন্দোলন দমন করার জন্য। কিন্তু তথাপি ক্রোক-করা মালপত্র নীলাম করা বা গ্রাম থেকে সহরে বয়ে নেওয়ার জন্য মজুর বা গরুর গাড়ী পর্য্যন্ত পাওয়া যায়নি,—জনগণের সম্পূর্ণ

সমর্থনে কর বন্ধের এমন সর্ব্বাত্মক সত্যাগ্রহ মেদিনীপুরের আগে ভারতের আর কোথাও কখনো পরিচালিত হয় নি।

বীরেন্দ্রনাথ ছিলেন গান্ধীপ্রদর্শিত সত্যাগ্রহের আদর্শ ও পদ্ধতি বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করার অগ্রদূত। তথাপি গান্ধীজী পর্য্যন্ত এই সত্যাগ্রহকে শুধুমাত্র বাম-হস্তের স্বীকৃতি দিয়ে বলেন: "বাংলার বিদ্রোহীরা নিজেদের বিজয়লাভের মাধ্যমে তাঁদের বিদ্রোহের যৌক্তিকতা প্রমাণ করেছেন।" বারদোলী সত্যাগ্রহ পরিচালনার জন্য বল্লভভাই প্যাটেলকে 'সরদার' আখ্যা দেওয়া হয় এবং দু'বছর পরে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে তিনি করাচী কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত হন। কিন্তু যে বীরেন্দ্রনাথ ছিলেন প্রথম সত্যাগ্রহী, যিনি গান্ধীসত্যাগ্রহ-পন্থার সর্ব্বপ্রথম সার্থক প্রয়োগ করে গণ-সত্যাগ্রহের এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি স্থাপন করেন, তিনি ইতিহাসের কাছে তাঁর এই ঐতিহাসিক অবদানের কোন স্বীকৃতি পান নি। কংগ্রেসের গান্ধীবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে সত্যের অপলাপ করে বারদোলী সত্যাগ্রহকে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের 'ল্যাণ্ডমার্ক' বলা হয়েছে। বস্তুতঃ, এই 'ল্যাণ্ডমার্ক' বা পথনির্দ্দেশক হ'ল—বীরেন্দ্রনাথ-পরিচালিত মেদিনীপুরের ইউনিয়ন বোর্ডের কর-বন্ধের সত্যাগ্রহ। একমাত্র সুভাষচন্দ্র বসুর 'ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রাগল' (ভারতীয় সংগ্রাম) বইটি ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থে এই গণ-সত্যাগ্রহের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও তাৎপর্যের কথা উল্লেখ পর্য্যন্ত করা হয় নি। সুভাষচন্দ্র লিখেছেন: "...Under the leadership of Mr. B N. Sasmal, the people of Midnapore started an agitation for the withdrawal of the Bengal Self-Government Act from this district, and refused to pay the taxes imposed by the newly-established Union Boards. The usual repressive measures were taken to force the new Act on the district. Forcible seizure of

property, harrassment and prosecution of the villagers, intimidation by military police and by soldiers—all were tried but without success. The orgy of repression continued throughout the year 1921, but the Act had ultimately to be withdrawn in 1922. The success of this no-tax campaign gained considerable strength and self-confidence to the people of Midnapore and popularity to their leader, Mr. B. N. Sasmal." মেদিনীপুরের জনগণ অবশ্য দেশপ্রাণের অবদান বিস্মৃত হয়নি,—১৯৩০ ও ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর যে অবিস্মরণীয় কীর্ত্তি প্রদর্শন করে এবং খ্যাতি অর্জন করে তার মূল ভিত্তিভূমি ছিল দেশপ্রাণের জন-আন্দোলনের অপূর্ব ঐতিহ্যের প্রেরণা। বস্তুত, জন-আন্দোলন, গণ-সত্যাগ্রহ ও জন-নেতৃত্বের অগ্রদূত ছিলেন দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল এবং এগুলিই ছিল ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাসে তাঁর মৌল অবদান।

গঠনমূলক কাজের অনন্য প্রতিভা

দেশপ্রাণ যে-দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তা পালনে অনন্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। দেশবন্ধু ও মতিলাল যখন গান্ধীপন্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বরাজ্য দল গঠন করেন এবং অসহযোগের পদ্ধতিকে জনতার ক্ষেত্র থেকে আইন সভায় নিয়ে যাওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর হন তখন দেশবন্ধুর দক্ষিণ হস্ত ছিলেন দেশপ্রাণ। তিনি শুধু যে স্বরাজ্য দলের সম্পাদক ছিলেন তা নয়, তাঁরই প্রচেষ্টায় মেদিনীপুর ও অন্যান্য জেলায় স্বরাজ্য দল বিশেষ সাফল্য অর্জ্জন করেছিল। তিনি নিজে কাঁথি ও ডায়মণ্ড হারবার—এই দুই কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়ে কাঁথি কেন্দ্রটি ছেড়ে দেন স্বরাজ্য দলের নেতা দেশবন্ধুকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মর্য্যাদায় বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য করবার জন্য।

আইন সভার মধ্যে স্বরাজ্য দল যেভাবে সরকারকে বার-বার পরাজিত করতে সক্ষম হয়, তার পশ্চাতেও বীরেন্দ্রনাথের পার্লামেন্টারী জ্ঞানবুদ্ধি-বিচক্ষণতা বিশেষভাবে কার্যকরী ছিল।

বীরেন্দ্রনাথ তাঁর নেতৃত্বের বৈশিষ্টের আর এক মৌল পরিচয় দেন মেদিনীপুর জেলা বোর্ড পরিচালনার দক্ষতায়। স্বরাজ্য দলের নীতি অনুযায়ী নির্বাচনের মাধ্যমে তিনি জেলা বোর্ড গঠন করেন। সে-সময় পর্য্যন্ত এই জেলা বোর্ড প্রায় আটত্রিশ বছর যাবৎ প্রচলিত ছিল, কিন্তু প্রতি বছর এই বোর্ডের জন্য বরাদ্দ অর্থের বহু পরিমাণ সরকারকে ফেরৎ পাঠান হতো,—জেলা বোর্ডের গঠনমূলক কার্যকারিতা সম্বন্ধে জনসাধারণের বিশেষ কিছুই জানবার সুবিধা ছিল না।

জেলা বোর্ড দখল করে দেশপ্রাণ বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে এবং জেলার প্রতিটি অঞ্চলে বারবার পরিভ্রমণ করে, জেলা বোর্ডের সীমিত অর্থ ও সুযোগ সত্বেও কিভাবে জনকল্যাণকর কাজ করা যায় তার এক অভূতপূর্ব নিদর্শন স্থাপন করেন। সাধারণ স্বাস্থ্য, পানীয় জলের সরবরাহ এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সাহায্য দান—মাত্র এই তিনটি ক্ষেত্রে জেলা বোর্ডের সীমিত সুযোগ ছিল। তিনি প্রথম বছরেই মেদিনীপুরে ১৫টি নূতন স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করেন এবং প্রথম দু' বছরে ৫২৯টি পুকুর ও কূপ খনন করান, এবং সংস্কার করান আরও ৬৪৩টি। বহু দ্বিতীয় মান পর্য্যন্ত নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়, চতুর্থ মান পর্য্যন্ত উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়, ষষ্ঠ মান পর্য্যন্ত মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় এবং সংস্কৃত শিক্ষার টোলের গৃহ নির্মাণ করার ব্যবস্থাও করে' দেন।

বস্তুতঃ, সেই সময়ে বাংলাদেশ কেন, ভারতবর্ষের আর কোন জেলা বোর্ড এমন গঠনমূলক কর্মদক্ষতা দেখাতে পারে নি, যেমন দেখিয়েছিলেন দেশপ্রাণ শাসমল মেদিনীপুর জেলাবোর্ডে। অন্যান্য জেলাবাসীর তুলনায় মেদিনীপুরজেলাবাসিগণ স্বায়ত্ব শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গ্রামীন উন্নয়নের কাজ করার জন্য বিশেষভাবে সচেতন ও

উৎসাহী। বীরেন্দ্রনাথ যেভাবে জনসাধারণকে তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করেন, তার ঐতিহ্য আজও অব্যাহত রয়েছে মেদিনীপুর জেলায়।

স্বরাজ্য দলের অসহযোগের নীতি দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ জেলা বোর্ডের ক্ষেত্রেও নির্ভীক ভাবে প্রয়োগ করেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তৎকালীন গভর্ণর লর্ড লিটন মেদিনীপুর পরিদর্শনে যান। গভর্ণরের সেক্রেটারী গভর্ণরের সম্বর্দ্ধনায় জেলা বোর্ডের পক্ষ হতে একটি জনসভা (পাব্লিক মিটিং) আহ্বানের জন্য বীরেন্দ্রনাথকে অনুরোধ জানান।

ইতিপূবে অন্যান্য চেয়ারম্যানের কার্য্যকালে অনুরূপ উপলক্ষ্যে জেলা বোর্ড হতে সম্বর্দ্ধনা দানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু জেলা বোর্ড সংক্রান্ত সরকারী আইন-কানুন অনুসারে ঐ সম্বর্দ্ধনার ব্যয় য়্যাকাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল মঞ্জুর করতে না পারায় সম্বর্দ্ধনার ব্যয় বোর্ডের সদস্যদিগকেই ব্যক্তিগত তহবিল হতে বহন করতে হয়েছিল। কাজেই ঐ সম্বর্দ্ধনাকে বোর্ডের প্রদত্ত সম্বর্দ্ধনা না বলে বোর্ডসদস্যদের প্রদত্ত সম্বর্দ্ধনা বলা যায়। এই ধরণের সম্বর্দ্ধনার সহিত বোর্ডের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না বলে বীরেন্দ্রনাথ বোর্ডের সভায় এরূপ সম্বর্দ্ধনা দানের প্রস্তাব বাতিল করেন।

মেদিনীপুর জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হিউবার্ট গ্রেহাম গভর্ণরকে সম্বর্দ্ধনা দান সম্পর্কে আলোচনা করবার জন্য বীরেন্দ্রনাথকে ব্যক্তিগত ভাবে পত্র লিখে তাঁর বাসভবনে ডেকে পাঠান। এই পত্রের উত্তরে বীরেন্দ্রনাথ মিঃ গ্রেহামের সহিত দেখা করতে না গিয়ে স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেন: "I can not take part in His Excellency's visit to this place. The Government which sent me to jail without any evidence whatever can not expect co-operation from me on an occasion like this." অর্থাৎ মাননীয় গভর্ণরের এই জেলা

পরিদর্শনে আমি যোগদান করতে পারি না। যে-সরকার আমাকে বিনা প্রমাণে কারাগারে পাঠিয়েছিল সেই সরকার এরূপ উপলক্ষ্যে আমার সহযোগিতা পাবার আশা করতে পারেন না। অসহযোগের নীতিরক্ষায় এরূপ তেজস্বী আপোষবিরোধী মনোভাব তৎকালে আর কোন কংগ্রেসী নেতা, কি বাংলাদেশে, কি ভারতবর্ষের অন্যত্র, দেখিয়েছেন বলে কোন ঐতিহাসিক সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের নির্বাচনে লোক্যাল বোর্ডের ৭৮টি সদস্যপদের মধ্যে ৭৭টি এবং জেলার বোর্ডের ২২টি সদস্যপদের মধ্যে ২২টি পদই দেশপ্রাণের নেতৃত্বে কংগ্রেসীরা দখল করেন। স্বভাবতঃই তিনি দ্বিতীয়বার জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। কিন্তু বৃটিশ সরকার তৎকালীন গভর্ণরের প্রতি বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের আচরণের কথা ভুলতে পারে নি। বীরেন্দ্রনাথের নির্বাচন সরকার অনুমোদন করবে, কি, করবে না—সে বিষয়ে কয়েকটি কথা আলোচনার জন্য বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার দেশপ্রাণকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য চিঠি দেন। জননেতা বীরেন্দ্রনাথ সে-সময় অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় কমিশনারের অনুরোধ রক্ষা করতে পারেন নি। আলোচনার বিষয়-বস্তু লিখে জানাবার কথা বলেন। ফলে সরকার এতে সন্তুষ্ট হতে না পেরে মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যানের পদে দেশপ্রাণের পুনর্নির্বাচন বাতিল করে দেন। অসহযোগের আদর্শ ও জাতীয় মর্য্যাদা রক্ষার এক নির্ভীক ঐতিহ্য স্থাপন করেন দেশপ্রাণ।

মুসলীম সমাজের আস্থালাভ

কংগ্রেসের পক্ষে মুসলীম সমাজের আস্থা অর্জন করা ছিল এক দুরূহ সমস্যা। গান্ধীজী সাময়িকভাবে খিলাফতের ধর্মীয় দাবী মেনে নিয়ে অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে ভারতীয় মুসলীম সমাজের বিশ্বাস লাভ করেছিলেন। কিন্তু এই বিশ্বাস দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। আত্মদানের পূর্ব পর্য্যন্ত গান্ধীজী মুসলীম সমাজকে বিশ্বাস করাতে

পারেন নি যে, তিনি যথার্থই তাদের পরমাত্মীয় ছিলেন। সেদিনের বঙ্গদেশে শুধু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও দেশপ্রাণ শাসমল মুসলীম সমাজের চিত্ত জয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন। চিত্তরঞ্জনের বেঙ্গল প্যাকট ছিল এক দূরদর্শী রাজনীতিক নীতি। এই বেঙ্গল প্যাকট তৎকালীন পশ্চাৎপর মুসলীম সমাজের উপরে গভীর রেখাপাত করেছিল। কিন্তু অদূরদর্শী কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতাগণ এই প্যাকট অনুমোদনে অস্বীকার করেন।

রাজনীতিক ও সামাজিক স্তরে হিন্দু-মুসলীম ঐক্য সাধন করে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তাবোধ গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় দেশপ্রাণ ছিলেন দেশবন্ধুর ঘনিষ্ঠতম সহযোগী। তৎকালীন হিন্দুপ্রধান কংগ্রেসের সকল নেতা এই প্যাকটের ঘোর বিরোধী ছিলেন, কিন্তু একমাত্র দেশপ্রাণই পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন দেশবন্ধুর এই রাজনীতিক প্রচেষ্টায়। দেশপ্রাণ শুধু মেদিনীপুরের মুসলীম সমাজ নয়—পূর্ব বাংলারও মুসলীম সমাজের কাছে বিশেষ প্রিয় ছিলেন। মুসলীম লীগে যোগ দেওয়ার পূর্ব পর্য্যন্ত কংগ্রেস নেতারূপে মৌলানা আক্রাম খাঁ ছিলেন দেশপ্রাণের বিশেষ সমর্থক। ফজলুল হকও ছিলেন দেশপ্রাণের বিশেষ অনুরক্ত। বস্তুত, দেশপ্রাণের চেষ্টার ফলেই কলকাতা করপোরেশনের প্রথম মুসলীম মেয়র রূপে নির্বাচিত হয়েছিলেন ফজলুল হক—যদিও পরে চক্রান্ত করে এই নির্বাচন বাতিল করে দেওয়া হয়। দেশপ্রাণের মৃত্যুর পরে ফজলুল হক আক্ষেপ করে বলেছিলেন: "দুর্ভাগ্যবশত বীরেন্দ্রনাথ পরাধীন দেশে জন্মেছিলেন, তাই তিনি এদেশে সমাদর পান নি। স্বাধীন দেশে জন্মালে তিনি হিটলার বা মুসোলিনীর মত সম্মান পেতেন।"

দেশবন্ধুর প্রচেষ্টায় সংঘটিত "হিন্দু-মুসলীম প্যাকট" সমর্থন করে অত্যন্ত বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বীরেন্দ্রনাথ বলেন যে, "এদেশে হিন্দু-মুসলমানের সম্পূর্ণ সংমিশ্রণ বা মিলন হইতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে বলিয়া প্যাকট ইত্যাদি দ্বারা ভারতের স্বরাজ-সাধনাকে

মাঝে-মাঝে জয়যুক্ত না করিতে পারিলে প্রকৃত স্বরাজ লাভের জন্য আমাদের সমস্তকাল অপেক্ষা করিতে হইবে। ২৪ কোটি হিন্দু একদিন হঠাৎ ৭ কোটি মুসলমানকে পরাভূত করিয়া হিন্দু-স্বরাজ স্থাপন করিবে, আবার ৭ কোটি মুসলমান একদিন হঠাৎ ২৪ কোটি হিন্দুকে পরাজিত করিয়া এদেশে মুসলমান-স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত করিবে …তাহাও নিছক উপন্যাস ব্যতীত কিছুই নহে। এদেশে হিন্দু-স্বরাজ বা মুসলমান-স্বরাজের স্থান নাই—কেবল এক ভারতীয় স্বরাজের স্থান রহিয়াছে।" (কৃষ্ণনগর ভাষণ, ১৯২৬ খৃঃ)

এই ভারতীয় স্বরাজের আদর্শ বিপন্ন করার বৃটিশ চক্রান্তকে ব্যর্থ করার জন্যই দেশপ্রাণ জীবনের শেষ সংগ্রাম করেন। তিনি ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের কম্যুন্যাল য়্যাওয়ার্ডের বিরুদ্ধে কংগ্রেস ন্যাশন্যালিষ্ট পার্টির পক্ষ থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কিন্তু বিজয়ী হয়েও তিনি ভারতীয় রাজনীতির কেন্দ্রস্থলে নিজের ভূমিকা পালন করার অবকাশ পেলেন না, তার আগেই জগৎ ছেড়ে চলে গেলেন। বস্তুত নিজের প্রাণ দিয়ে বীরেন্দ্রনাথ সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারতভাগের সম্ভাবনা সম্বন্ধে বিপদসংকেত দিয়েছিলেন, কিন্তু কংগ্রেস তার মর্মার্থ যথা সময়ে উপলব্ধি করতে পারে নি। রাজেন্দ্রপ্রসাদ যথার্থই বলেছিলেন ঃ "Had Sasmal survived he would have been a great assest of the Congress in the Indian Legislative Assembly."

যাঁর জন্য মেদিনীপুরবাসী আজও বাঙালী

সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ এবং অগ্রণী নেতৃত্বদানে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে বাঙালীর অবদান ছিল অতুলনীয়। যে বঙ্গদেশের বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন সারা ভারতকে 'বন্দে-মাতরমে'র মন্ত্র দিয়ে প্রত্যক্ষ গণসংগ্রামের দীক্ষা দিয়েছিল, সেই বঙ্গদেশকে কেটে কেটে খর্ব করার চক্রান্তে ইংরেজ যতটা দায়ী,

দিল্লীর কংগ্রেস নেতৃত্বের দায়িত্বও তার চেয়ে কম নয়। বঙ্গভঙ্গ রোধে বাঙালীর ঔদ্ধত্যকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই বাঙালী-অধ্যুষিত কাছাড়, গোয়ালপাড়া ও সিলেট এই জেলা তিনটি আসামকে এবং সিংহভূম, মানভূম, সাওতাঁল পরগণা, পুরুলিয়া, ভাগলপুর ও পুর্ণিয়া এই জেলাগুলি বিহারকে দেওয়া হয়েছে। বাঙালী সেদিনে বঙ্গভঙ্গরোধ করেই খুশি হয়েছিল। বৃটিশ সরকার এই নয়টি বাঙালীপ্রধান জেলা বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে' সাম্প্রদায়িক বিষবৃক্ষ রোপণের উদ্দেশ্যে এই প্রদেশকে একটি মুসলীমগরিষ্ঠ প্রদেশে রূপান্তরের যে চক্রান্ত করেছিল সে-সম্বন্ধে বাঙালীরা ছিল উদাসীন।

আবার চক্রান্ত হয়েছিল চতুর্থ দশকের সূচনায় মেদিনীপুরের একটি বড় অংশকে উড়িষ্যার সঙ্গে যুক্ত করার। ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে মুসলীমগরিষ্ঠতা সৃষ্টি করার এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে প্রোৎসাহিত করার। এই চক্রান্তকে একক প্রচেষ্টায় রোধ করতে যিনি সক্ষম হন তিনি দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ। যে প্রাচীন দলিলপত্র মন্থন করে তিনি যুক্তি, তর্ক ও অকাট্য প্রমাণ দ্বারা মেদিনীপুরবাসীদের বাঙালীত্বের স্বাভিমান রক্ষা করতে সক্ষম হন সেই দলিলপত্র যথার্থ প্রমাণ করার কী অক্লান্ত অধ্যবসায় ও বিচার-শীল পাণ্ডিত্যের দক্ষতা ছিল এই জননায়কের। পরবর্ত্তীকালে কংগ্রেস শাসনও বাঙালীর উপরে সুবিচার করে নি। দেশপ্রাণ যদি জীবিত থাকতেন তা'হলে হয়তো ১৯৪৭ সালে বাঙালীর বিখণ্ডন তিনি রোধ করতে অগ্রণী হতেন,—অন্ততঃ রাজ্য পুনর্গঠনের সময়ে তাঁর ক্ষুরধার বিচারবুদ্ধি দ্বারা বাংলার হৃত অংশগুলিকে পশ্চিম বাংলায় ফিরিয়ে আনতে পারতেন। মেদিনীপুরবাসীরা যে আজও বাঙালী, সেজন্য শুধু তাঁরা নয়, সমগ্র বাঙালী জাতি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবেন দেশপ্রাণের অবদানের কথা।

স্বরাজ অর্জ্জনের বৈপ্লবিক পরিকল্পনা

কি কারণে যে বাংলার বিপ্লবীদের একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠী দেশপ্রাণের নেতৃত্বের বিরোধিতা করেছেন, সে-কথা ভাবলে আজ বিস্মিত হতে হয়। একথা ঠিক যে, বীরেন্দ্রনাথ সন্ত্রাসবাদী পন্থার তীব্র সমালোচক ছিলেন, কিন্তু বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ও গণবিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে যে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জন করা ছিল বিপ্লববাদের মূল লক্ষ্য, তার পদ্ধতি ও অভিপ্রায়ের কথা অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় ও নির্ভীকভাবে ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম যিনি ব্যক্ত করেছেন তিনি হলেন জননায়ক বীরেন্দ্রনাথ। তিনি গান্ধীবাদী হয়েও, এমন কি, অহিংসবাদী হয়েও, যেরূপ স্পষ্টভাবে গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ-পন্থার অকার্য্যকারিতার কথা নিঃসংশয়ভাবে বলেছেন, তাতে বরং বিপ্লবীদের সর্ব্বান্তঃকরণে বীরেন্দ্রনাথকে সমর্থন করা উচিত ছিল। স্বরাজের যথার্থ তাৎপর্য্য কি, কিভাবে স্বরাজ অর্জ্জন করা সম্ভব, গান্ধীপন্থায় যে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জন করা সম্ভব নয়, বড় জোর গান্ধীজীর অসহযোগ আইন-অমান্যের পদ্ধতিতে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস অর্জ্জন করা যেতে পারে—বীরেন্দ্রনাথের আগে সেকথা কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে আর কোন নেতাই এমন সুস্পষ্টভাবে চিন্তা বা ব্যক্ত করার দূরদর্শিতা দেখাতে পারেন নি। পূর্ণ স্বাধীনতার সংগ্রামের শেষ পর্য্যায়ে গণবিপ্লব যে অবশ্যম্ভাবী এবং এরূপ পরিণতির ক্ষেত্রে হিংসা-অহিংসার তত্ত্ব-বিচার যে অর্থহীন—সেকথাও বলেছেন বীরেন্দ্রনাথ। স্বরাজের অর্থ যে সামাজিক সাম্য, বর্ণপ্রথার বিলোপসাধন, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভারতীয়তাবোধের একাত্মতা স্থাপন এবং স্বরাজ অর্জ্জনের জন্য যে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সহায়তা ও আন্তর্জাতীয় সাহচর্য দরকার আর সবচেয়ে বেশী আবশ্যক গঠনমূলক কর্ম্মপন্থার ভিত্তিতে জাতীয় জীবনে নৈতিক শক্তির ভিত্তিস্থাপন করা —সে-তত্ত্বকথা সে-যুগে বীরেন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোন নেতাই এমন সর্ব্বাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চিন্তা করেন নি। সুভাষচন্দ্র তখন মান্দালয়

জেলে বন্দী,—তিনি ভারতবর্ষের জাতীয় সংগ্রামের মঞ্চে তখনও নেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ ও অবকাশ পান নি। পরবর্ত্তী কালে তিনি ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসবিরোধী হয়ে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী তোলেন এবং গান্ধীপন্থার সীমাবদ্ধতা দেখিয়ে গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জাতীয় বিপ্লবের দ্বারা স্বাধীনতা অর্জ্জনের পন্থা প্রদর্শন করেন, বস্তুত, সেই বিপ্লবপরিকল্পনার পথিকৃৎ ছিলেন দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে বীরেন্দ্রনাথ যে ভাষণ দেন তাকে বলা যায় তাঁর political testament বা রাজনৈতিক চিন্তাধারার ঐতিহাসিক দলিল। এই সম্মেলনে সম্ভবত জননায়ক বীরেন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করেই কবি নজরুল ইসলাম এই বিপ্লবের 'কাণ্ডারীকে হুঁশিয়ার' করে দিয়ে তাঁর অবিস্মরণীয় 'দুর্গমগিরি-কান্তার-মরু' গানটি রচনা করেন এবং এই সম্মেলনে নিজেই সেই গানটি গেয়ে শোনান। অত্যন্ত মৌলিকচিন্তার নিদর্শনরূপে ভারতবর্ষের জাতীয় আদর্শবাদের প্রকৃতি নির্ণয়ে দেশপ্রাণ বলেন: "আমাদের সমস্যা politics-কে spiritualize করা নহে—আমাদের সমস্যা আমাদের সনাতন সন্ন্যাস ধর্মকে সময়োপযোগী করিয়া ধীরে ধীরে politicalize করা।...বাংলা তথা ভারতের স্বরাজের আদর্শ—তেত্রিশ কোটি নরনারীর পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন।" পরবর্ত্তীকালে এ-কথাই সুভাষচন্দ্র অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন বারবার। যে বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ও কর্মপন্থার জন্য সুভাষচন্দ্রের পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ এবং স্বাধীনতাসংগ্রামের পদ্ধতি গান্ধীপন্থা থেকে ভিন্ন পন্থার অনুসারী হয়, সেকথাই বীরেন্দ্রনাথ দ্বিধাহীন ভাষায় বলেন ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে। তিনি বলেন: "আমি বিশ্বাস করি যে, Non-violent Non-Co-operation দ্বারা Union Autonomy, Provincial Autonomy, District Autonomy—এমন কি, হয়তো Dominion Status বা Equal Partnership within the British Empire লাভ হইতে পারে। কিন্তু

ভারতের পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ইহা দ্বারা কিছুতেই অর্জ্জিত হইতে পারে না।" [দেশভাগ ও দুইটি ডোমিনিয়নরূপে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভবে একথা প্রমাণিত হয়েছে।]

গান্ধীযুগে কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী তোলা ছিল এক দুঃসাহসিক কাজ। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে হজরৎ মোহানী আহমেদাবাদ কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করে' গান্ধীজী দ্বারা তিরস্কৃত হয়েছিলেন। এ-ঘটনা জানা থাকা সত্ত্বেও চিরবিদ্রোহী বীরেন্দ্রনাথ কৃষ্ণনগরের রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের মঞ্চ থেকে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী উত্থাপনে সংকোচ বোধ করেন নি।

বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদের অকার্য্যকারিতার কথাও দেশপ্রাণ দৃঢ়কণ্ঠে ব্যক্ত করেন: "বাংলা তথা ভারতের পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা Terrorism বা Anarchist Conspiracy দ্বারা কস্মিনকালেও অর্জ্জিত হইবার সম্ভাবনা নাই।" সন্ত্রাসবাদের তীব্র সমালোচনা করায় বীরেন্দ্রনাথ বিপ্লবীদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। যদিও তিনি বিপ্লবীদের স্বদেশপ্রেম ও আত্মদানের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, যদিও বিপ্লবীদের মামলা-মোকদ্দমায় বিনা-পারিশ্রমিকে তাদের পক্ষ সমর্থন করেছেন, তথাপি সেই আদর্শনিষ্ঠ নেতা সন্ত্রাসবাদ সম্বন্ধে তাঁর স্বাধীন চিন্তাধারা ব্যক্ত করতে কখনো দ্বিধাবোধ করেন নি। স্বাধীনতা সংগ্রামের পরবর্ত্তী অধ্যায়ের ইতিহাস বীরেন্দ্রনাথের চিন্তার সারবত্তা প্রমাণ করেছে।

কোন্ পদ্ধতিতে ভারতের পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জ্জন করা সম্ভব তা নির্ণয় করে বীরেন্দ্রনাথ বলেছেন: "Civil disobedience এর দ্বারা আদর্শ স্বরাজ লাভ হইতে পারে না।...ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবার যে একটিমাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা তাহা revolution বা বিপ্লব। ...বলা হয় যে revolution হিংসামূলক, কেননা ইহাতে রক্তপাত হয়।...রক্তপাত হইলেই যে ইহা হিংসাপ্রসূত, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে না।...হিংসা ভারতের প্রকৃতি-

বিরুদ্ধ, কিন্তু সে কারণে Revolution হিংসামূলক কে বলিল? কিম্বা তাহা ভারতের আদর্শবিরুদ্ধ হইবে কেন?...পরাধীন জন্মভূমিকে স্বাধীন করিবার যদি Divine Right থাকে, তবে Revolution-এর সাহায্যে তাহা কার্য্যকরী করিবারও Divine Right রহিয়াছে। Revolution-এর জন্য দেশকে প্রস্তুত করিতে হইলে, আমাদের মানসিক ও দৈহিক শক্তি আবশ্যক। তদ্দারা আমরা Revolution-এর পরের সমস্যাসমূহ সমাধান করিতে পারিব। ...স্বরাজ কোন্ পথে, ভারতের পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জনের পন্থা কি, সে সম্বন্ধে অবিসম্বাদিত চিত্তে বলিব—Revolution-এর পথে, বিপ্লবের পথে, তা' ছাড়া অন্য কোন উপায় চিন্তা করা যায় না।"

বিপ্লবী জননায়ক বীরেন্দ্রনাথ

বাংলার দুর্ভাগ্য, ভারতের দুর্ভাগ্য যে, বীরেন্দ্রনাথের ন্যায় বিপ্লবী জননায়কের মাত্র ৫৩ বছর বয়সে দেহান্ত ঘটেছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে বীরেন্দ্রনাথের কাছে পূর্বেকার ভুল বুঝাবুঝির জন্য অকুণ্ঠ মার্জনা চেয়ে তাঁকে শেষপত্রে লিখেছিলেন: "...I expect you to forgive and forget and rise to the occasion. Bengal expects you to lead." কিন্তু সে-যুগের শুধু সহুরে কংগ্রেসী নেতারা বীরেন্দ্রনাথকে বাংলার রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়ার অবকাশ দেয়নি। আরও দুর্ভাগ্য, দেশবন্ধুর জীবনাবসানের সময়ে সুভাষচন্দ্র ছিলেন ব্রহ্মদেশের জেলে বন্দী। যদি বীরেন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বদ্বয় সংযুক্ত হ'ত, তা'হলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাসংগ্রামে বাংলার নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারত। সুভাষচন্দ্র যখন ইয়োরোপে নির্বাসন ভোগ করার পরে স্বদেশে ফিরলেন, তখন দেশপ্রাণ এ-জগৎ ছেড়ে চলে গেছেন। নিরপেক্ষ ইতিহাস এ-কথা স্বীকার করবে যে, বিপ্লবী মহানায়ক সুভাষচন্দ্রের পূর্বসূরী ছিলেন বিপ্লবী জননায়ক বীরেন্দ্রনাথ এবং

সুভাষচন্দ্রই বীরেন্দ্রনাথের বিপ্লবী চিন্তাধারাকে বাস্তবে রূপায়িত করেন।

আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের ইতিহাসে গান্ধীযুগে বাংলাদেশে যে তিন জন জননায়কের আবির্ভাব ঘটেছিল, তাঁরা ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র। দুর্ভাগ্য আমাদের, আমাদের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাস রচয়িতারা এই জাতীয় সংগ্রামের পটভূমিতে বীরেন্দ্রনাথের ভূমিকা এবং তাঁর মৌলিক অবদানের যথাযোগ্য মূল্যায়ন করেন নি,—এই জননায়ককে যথাযোগ্য স্বীকৃতিও দেন নি। তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষেও বাঙালী সমাজ এই নেতার প্রতি যোগ্য শ্রদ্ধা অর্পণে অগ্রণী হয়নি। সাময়িকভাবে উপেক্ষিত হলেও দেশপ্রাণের ত্যাগ, সংগ্রাম, কর্মনিষ্ঠা, জীবন ও আদর্শের সঙ্গতি, নেতৃত্বের নির্ভীকতা, আত্মবিশ্বাসের দৃঢ়তা, নৈতিক চরিত্রশক্তি এবং জাতীয় জীবনাদর্শের দার্শনিক মানসিকতা আলোকদীপ্ত উৎসরূপে বাঙালীর বৈপ্লবিক মনীষাকে বহুকাল পর্য্যন্ত প্রেরণা যোগাতে থাকবে।

দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের স্মৃতিতর্পণ

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন

(পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী)

১৯০৩-১৯০৫এ অখণ্ড বাংলায় শ্রীঅরবিন্দ, শ্রী পি. মিত্র এবং অন্যান্য বিপ্লবী নেতা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য যে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত করেন এবং যার ফলে বাঙালী-জাতির আত্ম-বলিদানের এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের সৃষ্টি হয় তা আমরা কোন দিনও ভুলবো না। ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গানে বাঙ্গালীর অবদান চিরস্মরণীয়। গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায় যে এক অভিনব আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন আমরা বাঙ্গালীরা তার গুরুত্ব উপলব্ধি করি নাই।

জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর গান্ধীজী জাতীয় কংগ্রেসের মাধ্যমে অহিংস অসহযোগের পথ ধ'রে গণচেতনা এনে সর্বাত্মক আন্দোলনের কথা বলেন। ১৯২০এর সেপ্টেম্বরে কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে যে মুষ্টিমেয় ব্যক্তি সাড়া দেন এবং সর্বস্ব পণ করে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন তাঁদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল মহোদয়। গান্ধীজীর অহিংস কর্মপদ্ধতির মর্মবাণী সম্যক্ উপলব্ধি ক'রে দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ ব্যারিষ্টারী বর্জন করে জনজাগরণের উদ্দেশ্যে গ্রামবাসীদিগকে দেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ করেন। ১৯২০-এর ডিসেম্বরে নাগপুরে কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশনের পর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে নেতৃত্ব দেন। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ গ্রামকে খুব ভালভাবে চিনতেন এবং গ্রামের লোকের মনের কথা বুঝতেন। গ্রামবাসীকে জাগ্রত ও তাদের মধ্যে সাহস সঞ্চারিত করতে হলে কিভাবে কাজে এগোতে হ'বে দেশপ্রাণ তা খুব ভালভাবে বুঝেছিলেন এবং সেইজন্য সমগ্র মেদিনীপুর জেলায় ইউনিয়নবোর্ড স্থাপনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন পদব্রজে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাত্রা ক'রে।

হিংসায় বিশ্বাসী দুঃসাহসী বিপ্লবী বহু নেতা দেশপ্রাণকে সম্যক্‌ভাবে গ্রহণ ক'রতে পারেন নাই—বিরোধিতাও করেন তাঁরা বিশেষ ক'রে কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ আমাকে একদিন বলেছিলেন—"যদি আমরা ভারতবর্ষের জন্য স্বাধীনতা চাই তা হ'লে হিংসার পথ গ্রহণ করব আর যদি ভারতবাসীর জন্য স্বরাজ চাই তাহলে গান্ধীজীর অহিংস পথ গ্রহণ ক'রতেই হবে।" ক্ষমতা হস্তান্তরের সঙ্গে দেশবিভাগ মেনে নিয়ে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান স্বাধীন হ'য়েছে ঠিকই, কিন্তু এই দুই দেশের মানুষ কি স্বরাজ লাভ ক'রতে পেরেছে? গান্ধীজীর পদ্ধতি অনুসরণ না ক'রে আজ ভারতবাসী বহুবিধ বিরাট ও জটিল সমস্যার সম্মুখীন হ'য়েছে। লোকসংখ্যা বাড়ছে, সঙ্গে-সঙ্গে বেকারত্ব, ধনবৈষম্য, দারিদ্র্য বেড়েই চ'লেছে। মুদ্রাস্ফীতি এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য যে অসাম্য, আবার কতিপয় কৃষিজাত ফসলের আনুপাতিক যে স্বল্প মূল্য তাতে আমরা ধ্বংসের দিকেই অগ্রসর হচ্ছি। বর্তমানে এই আশঙ্কা সমস্ত অগ্রগতি রুদ্ধ ক'রে দিচ্ছে। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন তখনই সার্থক হ'বে যখন আমরা গান্ধীজীর নির্দেশিত গ্রাম-স্বরাজের প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ ক'রব। গ্রাম সব হ'বে খাদ্যে, বস্ত্রে, গৃহনির্মাণে, নিত্যব্যবহার্য সামগ্রীতে স্বাবলম্বী। গোবর, মানুষের মলমূত্র, গ্রামের আবর্জনা থেকে গ্যাস বের ক'রে জ্বালানীর ব্যবস্থা ক'রতে হ'বে—গ্রামগুলিকে ক'রতে হ'বে পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর। আমাদের দেশে মঙ্গলময় জঙ্গল আমরা ধ্বংস করেছি। যেখানে অন্ততঃ শতকরা ত্রিশভাগ জমিতে বন থাকা দরকার সেখানে মাত্র তেরো ভাগ জমিতে বন আছে। বায়ু, জল, মাটি দূষিত হ'চ্ছে। নদ-নদীর নিয়ন্ত্রণে কুফলই হয়েছে বেশী। ভারতবাসীর জন্য গান্ধীজী ও দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথের পরিকল্পিত স্বরাজ লাভের উদ্দেশ্যে চাই নিষ্ঠাবান কর্মীদল যারা নূতন পথ গ্রহণ ক'রে কাজ ক'রবে। দেশপ্রাণের স্মৃতির উদ্দেশে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই।

দেশপ্রাণের মহাপ্রাণতা

শ্রীবনবিহারী দাশ

দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ ছিলেন মহাপ্রাণ। এই মহাপুরুষের জীবন বিস্ময়কর। তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা ও নির্ভীকতা, হৃদয়ের বিশালতা, দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা ও অভ্রান্ততা, ব্যক্তিত্বের উদারতা ও অনমনীয়তা প্রভৃতি গুণাবলী সম্পর্কে বিভিন্ন সূত্র থেকে যে-সব তথ্য অনেক দিন থেকে সংগ্রহ করে রেখেছি তা থেকে কিছু এখানে পরিবেশন করছি।

চোখে দেখিনি তাঁরে, বাঁশী শুনেছি আর পাগল হয়েছি। সত্য কথা বলতে গেলে, দেশপ্রাণকে তাঁর জীবন্ত অবস্থায় দেখার সুযোগ আমার কখনও হয় নি। কিন্তু তাঁর কথা ও কাহিনী শুনেছি এবং পড়েছি। আর তাতে শুধু মুগ্ধ হইনি, তাঁর নামগানই আমি আমার জীবনের ধ্যানজ্ঞান করে' ফেলেছি। আমার এই সাতষট্টি বছর বয়সের প্রায় চল্লিশ বছর তাঁর নাম প্রচারে কাটিয়েছি, এই কারণে ভিন্ন-ভিন্ন পর্য্যায়ের বহু লোকের সান্নিধ্যে আসার আমার সুযোগ ঘটেছে আর তাঁর সম্পর্কে অনেক তথ্যও সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে।

আকৈশোর কংগ্রেসী আন্দোলনে গা ভাসিয়েছি। পুলিশের হাতে নির্য্যাতিত হয়েছি। মাঝে মাঝে পড়াশোনায় ব্যাঘাতও ঘটেছে। বীরেন্দ্রনাথের কথা পিতৃদেবের মুখে শুনেছি। শুনে বিস্মিত হয়েছি। বাবা বলতেন—অমন মানুষ হয় না। একবার তিনি জেল থেকে বেরিয়ে মেদিনীপুর হয়ে কাঁথির পথে আসছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে জনতার ভিড়। বেলদা পর্য্যন্ত ট্যাক্সিতে কোনমতে আসতে পেরেছিলেন। তারপর লোকের ভিড়ে আর গাড়ীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া গেল না, বীরেন্দ্রনাথ গাড়ী থেকে নেমে জনতার সঙ্গে পায়ে

হাঁটতে লাগলেন। সারা রাস্তা ফুলের মালা। গাড়ীতেও আর মালা ধরে না, মুহুর্মুহুঃ বন্দেমাতরম্ ধ্বনি। কোন রাজাও বুঝি এ রকম সম্মান কোনদিন পান নি। সারা রাস্তা হেঁটে অনেক রাত্রে কাঁথি সহরে পৌঁছলেন। তখনও তাঁকে দেখবার জন্য, তাঁর কথা শোনবার জন্য অগণিত মানুষ কাঁথির দারুয়া ময়দানে অধীর আগ্রহে বসে-দাঁড়িয়ে আছে।

বীরেন্দ্রনাথ রাজা ছিলেন না। তিনি কোন দেশও ত জয় করেন নি। তবে কেন মানুষ তাঁকে এমন বিপুল সম্বর্দ্ধনা জানিয়েছিল—বাবার বর্ণনা শুনে আমার কিশোর মনে এমন প্রশ্ন বার-বার উদিত হয়েছে। তারপর থেকে এই মানুষকে দেখবার জন্য আমার মন আঁকুপাঁকু করত। আমি যখন কলকাতার কলেজে অধ্যয়ন করতে এলাম তখন দেশপ্রাণ আর ইহজগতে নাই।

বীরেন্দ্রনাথকে দেখিনি, তবে তাঁর অশরীরী মূর্ত্তি যেন আমার চোখের সামনে ভেসে উঠত। তাঁর সম্বন্ধে যতই পড়েছি, যতই শুনেছি ততই মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে গিয়েছি। ফলে বীরেন্দ্রনাথই আমার জীবনের আদর্শ, আমার ইষ্ট হয়ে দাঁড়ালেন।

বহু বিদগ্ধ ব্যক্তি দেশপ্রাণের জীবন, চিন্তা ও কর্মের মূল্যায়ন করেছেন। ভাবীকালের ইতিহাসগবেষকগণ তাঁর জীবন নিয়ে নানা গবেষণা করবেন। মানুষ বীরেন্দ্রনাথকে মানুষে কি চোখে দেখবেন এবং বীরেন্দ্রনাথের জীবনের ছোট-ছোট ঘটনা থেকে কি পাওয়া যায় আমি শুধু সে বিষয়ে কয়েকটি ক্ষুদ্র কাহিনী বিবৃত করে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরছি।

কর্ত্তব্যপরায়ণতা

দেশপ্রাণের রাজনীতিক সহকর্মী ফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন—বীরেন্দ্রনাথ ইতিহাসস্রষ্টা। কলিকাতা হাইকোর্টের ইতিহাসে তিনি একটি নজির রেখে গেছেন। ঘটনাটি হ'ল বীরেন্দ্রনাথ

তাঁর মাতৃবিয়োগের পর নগ্নপদে এক বস্ত্রে ক্ষৌরহীন অবস্থায় যখন অশৌচ পালন করছিলেন, তখন হাইকোর্টে তাঁর একটি মামলা উঠে। শাসমল হাইকোর্টের জজের কাছে আবেদন করেন—এখন আমাকে মাতৃহীন অবস্থায় অশৌচ পালন করতে হচ্ছে, গাউন পরে সওয়াল করতে পারব না। জজ সাহেব তাঁকে ঐ অবস্থায় সওয়াল করবার অনুমতি দেন। বীরেন্দ্রনাথ অশৌচান্তের পরবর্ত্তী কোন একটা দিন নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি মক্কেলের কোন ক্ষতি করতে চান নি। এমনি ছিল তাঁর কর্ত্তব্যপরায়ণতা।

কৃচ্ছ্রসাধন

দেশপ্রাণের মৃত্যুর পর তাঁর পরিবার খুবই আর্থিক অনটনে পড়েন। তাঁদের মাথায় তখন এক বিরাট ঋণের ভার। আমি একবার দেশপ্রাণের মৃত্যু বার্ষিক অনুষ্ঠানে যাবার জন্য তাঁর সহধর্মিনী হেমন্তকুমারী দেবীকে আমন্ত্রণ জানাতে গিয়েছিলাম। আমাকে কাছে বসিয়ে তিনি বললেন, তোমাদের কাজ দেখে আমি খুব আনন্দ পাচ্ছি। আমি তাঁর নাম মনে রেখে বেঁচে আছি। তাঁর উপদেশ স্মরণ করে' মনে বল পাই। তিনি বলতেন, অভাবে-অনটনে পড়লে না খেয়েও মরবে, তবুও সাহায্যের জন্য পরের দ্বারস্থ হ'ও না। বলতে বলতে হেমন্তকুমারী চোখ মুছলেন।

আর একদিনের ঘটনা। সেদিন শিবচতুর্দ্দশী। সাত-সকালে বীরেন্দ্রনাথ কাঁধে গামছা ফেলে কোথায় যেন বেরোচ্ছিলেন। হেমন্তকুমারী জিজ্ঞাসা করলেন—এ অবস্থায় কোথায় বেরোন হচ্ছে শুনি ?

জান না আজ শিবচতুর্দ্দশী। গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে আসি।

হেমন্তকুমারী হাসতে-হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন—আজ তাহলে কি নির্জলা উপবাস ?

তা তো বটেই।

শিবচতুর্দ্দশী তো মেয়েরাই করে।

বীরেন্দ্রনাথ হাসতে হাসতে বললেন—মেয়েরা এ ব্রত ছাড়ছে দেখে পুরুষদের আরম্ভ করতে হচ্ছে। এই বলে তিনি গঙ্গার দিকে রওনা হলেন।

একদিন মেদিনীপুরের অন্যতম দানবীর ঈশ্বরচন্দ্র সাহু বলেছিলেন —"একবার দেশপ্রাণ আমার বাড়ীতে আসেন। তাঁর জন্য খাটের উপর নরম বিছানা করে দেওয়া হয়েছে। তিনি শোয়ার ঘরে ঢুকে বললেন—'আমি বিছানায় শোব না। মেঝেতে কম্বল পেতে ইট মাথায় দিয়ে শোব।' আমরা ত অবাক, ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'সাহেব, আমাদের অপরাধ কি?' বীরেন্দ্রনাথ বললেন—'তোমরা বোধ হয় জান না, সরকার আমাকে শীঘ্র গ্রেপ্তার করে জেলে নিয়ে যাবে। সেখানে আজকের মত কোমল সুন্দর বিছানা পাব না, তাই এখন থেকে শক্ত বিছানায় শোয়া অভ্যাস করছি।' এই বলে তিনি নিজ হাতে মেজেয় বিছানা পেতে শুয়ে পড়লেন। ঈশ্বর কি ধাতুতে তাঁকে গড়েছিলেন তা তিনিই জানেন।"

একক সংগ্রামী

একদিন অবিভক্ত বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক বীরেন্দ্রনাথের কথা প্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন—"একটা কথা জেনে রেখো—শাসমল ছিলেন এক বিরাট পুরুষ। স্বাধীন দেশে জন্মালে তাঁর সম্মান যে কত উপরে হতো তা চিন্তাই করা যায় না। পুরুষসিংহ হিসাবে পৃথিবীতে পূজা পেতেন। তাঁর প্রতি পদক্ষেপে পৃথিবীর বুক যেন কেঁপে উঠত। যোগ্য সহযোগী তিনি পান নি। কেবল একাই লড়ে গেছেন।"

সর্বাগ্রে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা

হেমন্তকুমারী দেবী একদিন বললেন—"চারদিকে হিন্দু-মুসলমান চুক্তি নিয়ে আলোচনা চলছে। বাড়ীর বারান্দায় বসেছেন—ফণিভূষণ

ব্যানার্জি, ত্রৈলোক্য প্রধান, দেশপ্রাণ ও আরো কয়েকজন। ব্যানার্জি বললেন—'ওরা বলছে শাসমল সাহেব যদি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন তবে আমরা দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়তে পারি।' আপনি কি রাজি আছেন? দেশপ্রাণ বললেন—'হ্যাঁ, মুসলমান হলে যদি দেশের স্বরাজ হয় আমি তবে এখনই রাজি। চাই ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা'।"

জাতিভেদের ঊর্দ্ধে

এই ঘটনাটির কথা হেমন্তকুমারী দেবীর নিকট থেকে শুনেছি।

রাত তখন এগারটা। বীরেন্দ্রনাথ ঘরে ঢুকলেন। তাঁর বৌদি তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন—"এ কি, ঠাকুরপো, তোমার ঠোঁট যে লাল দেখছি। তুমি তো কখনও পান খাও না। আজ পান খেয়েছ।"

—"হ্যাঁ বৌদি, আজ পান খেয়েছি। এ পানে মধু আছে।" —"কোথায় খেলে?"—"টালিগঞ্জে মেথর পাড়ায় মিটিং সেরে আস্‌ছি, মেয়েরা ধরে বলল—রাজাবাবু, আমাদের মোকামে যানা হবে।' তারা নাছোড়বান্দা, গেলাম ওদের সঙ্গে। দেখলাম, কি সুন্দর পরিষ্কার ঘর। পীড়াপীড়ি করলো—'সরবত খান, চা খান' বলে'। আমি বললাম—'না কিছুই খাবার ইচ্ছা নেই। তবে খাওয়াতে চাও খাবো একটি পান।' হাসতে হাসতে এক মেথররানী যত্ন করে একটি পান খেতে দিল। অভ্যাস না থাকলেও তাদের আদরের চাপে খেতে হল। বুঝলে বৌদি? তা ছাড়া আমি যে কাউনসিলার হয়ে ওদের রাজা হয়েছি। রাজা হয়ে প্রজার হাতে খাব না—সেকি হয়!

মায়ের জাতের সম্মান আগে

সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী ছিলেন দেশপ্রাণের বিশেষ অনুরাগী কংগ্রেস-কর্মী। তিনি বল্‌তেন—শাসমল সাহেবের মত জনদরদী নেতা

একেবারেই দুর্লভ। একবার আমি সুতাহাটায় একটি জনসভার আয়োজন করি এবং দেশপ্রাণকে সেখানে নিয়ে যাই। সভা আরম্ভ হ'ল, বক্তৃতা চলছে। এমন সময় দেখি শাসমল সাহেব হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে পাশ দিয়ে একেবারে শেষের দিকে গিয়ে হাজির। সেখানে একটি মেয়ে আধ-ঘোমটার আড়াল দিয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুনছিলেন। শাসমল সাহেব তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর হাত ধরে একেবারে সভার প্রথম সারিতে এনে একটি চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। সকলে ত অবাক।

তারপর তিনি বক্তৃতা করতে উঠে বল্লেন, "না জাগিলে সব ভারত ললনা—এ ভারত বুঝি বাঁচে না বাঁচে না।" মায়ের জাতকে পিছনে ফেলে রেখে জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। তাদের এগিয়ে আন্‌তে হবে। মাতৃজাতির সম্মান না দিয়ে কোন জাত বড় হতে পারে না।

দেশপ্রাণের এই কাজের ফলে অতঃপর সুতাহাটার মহিলাগণ স্বদেশী আন্দোলন ও জনসভায় যোগদান করতে আরম্ভ করেন।

ট্রামে-বাসে মহিলাদের আসন সংরক্ষণ

স্বর্গীয়া জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথের একজন খ্যাতনাম্নী সহকর্মিনী ছিলেন। তিনি দেশপ্রাণকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন। একদিন প্রখর রৌদ্রে ঘেমে নেয়ে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী শাসমল মশায়ের বাড়ীতে এসে একেবারে দোতলায় উঠে গেলেন। শাসমল মশায় বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কি ব্যাপার জ্যোতির্ম্ময়ী? তোমাকে খুব বিষণ্ণ ও অস্থির মনে হচ্ছে?

"আপনার কাছে এলাম একটা কথা বল্‌তে, তবে কংগ্রেসের কোন কথা নয়।"

—"বলেই ফেল।"

"ট্রামে-বাসে যাতায়াতে মেয়েদের বড় অসুবিধে। সিট না থাক্‌লে

মেয়েদের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেতে হয়। বাচ্চা-কোলে মেয়েদের ত কষ্টের সীমা থাকে না। ট্রামে-বাসে মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করতে হবে। আপনি একটু চেষ্টা করলেই হবে।"

"এ ত ভাল প্রস্তাব। ব্যবস্থা করা যাবে।"

এরপর শাসমল মশায় সংশ্লিষ্ট বিভাগের সঙ্গে কথা বলে কিছুদিনের মধ্যে ট্রামেবাসে মহিলাদের জন্য মহিলাদের আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। সে ব্যবস্থা আজও চলছে।

কষ্টসহিষ্ণুতা

একবার নির্বাচনী সভা সেরে ডায়মণ্ড হারবার থেকে কল্‌কাতা ফিরার পথে শাসমল সাহেবের মোটর গাড়ী বিগড়ে যায়। তখন রাত্রি দশটা। সঙ্গে ছিলেন কংগ্রেসকর্মী ফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ফণিবাবু বললেন—"এখন জানা-শোনা কারো বাড়ী গেলে হয় না?" শাসমল সাহেব বললেন—"এত রাত্রে কারো বাড়ীতে উঠলে লোকে বিব্রত হবেন। আমাদের একটু সুবিধার জন্য অন্যকে অসুবিধায় ফেলা ঠিক নয়।" ফণিবাবু বললেন—"কিছু ত খাওয়া দরকার। পেট জ্বলছে যে।" শাসমল সাহেব বললেন, "ভাবনা কি? পাশেই তো গাছ কালো জামে ভরা।"

গাড়ীর ড্রাইভারকে গাছে উঠতে পারে কিনা জিজ্ঞাসা করায় সে বলল—"পারি।" ড্রাইভার গাছে উঠে ঝাঁকিয়ে প্রচুর কালো জাম পেড়ে দিল। ফণিবাবু ও শাসমল সাহেব গাড়ীতে বসে জাম খেয়ে রাত কাটিয়ে দিলেন, কিন্তু অন্যকে বিব্রত করলেন না। পরদিন গাড়ী মেরামত করিয়ে নিয়ে কলকাতা ফিরলেন।

বিদ্যাসাগর ও বীরেন্দ্রনাথ

ডঃ সুধীর বেরা, ডি. লিট.

বিপ্লবতীর্থ অযুত শহীদের বুকের রক্তে রাঙা মেদিনীপুরের একটি মূল সুর আছে। সেটি আত্মোৎসর্গের সুর, অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার সুর, আবার করুণায় বিগলিত হয়ে পরের জন্য সর্বস্ব দানের সুর। একটি অনন্যসাধারণ একাত্মবোধ এই জেলায় আছে যা অন্য কোন জেলায় ঠিক এইভাবে গড়ে ওঠেনি। এই একাত্মবোধ কিন্তু কোন ক্ষুদ্র বা সংকীর্ণ অর্থে নয়, এই একাত্মবোধ হচ্ছে আত্মদান, পরোপকার, অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম, জাতিধর্মনির্বিশেষে সমগ্র মানব সমাজ ও সভ্যতার জন্য অপরিসীম দরদের দিক দিয়ে।

এর ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক কারণ অনুধাবনযোগ্য। কিংবদন্তীর ধারা বেয়ে, ইতিহাসের পতন-অভ্যুদয়ের বন্ধুর পথ ধরে' সেই ঐক্য ও সংহতি, সেই ত্যাগ ও আত্মদান, সেই পৌরুষ ও বীর্য শুধু এ-দেশের বা এ-জাতির নয়, সমগ্র মানব জাতির গর্ব ও গৌরবের বস্তু হয়ে আছে এবং থাকবে।

এই মেদিনীপুরের একদিকে যেমন লাল মাটি রক্তদানের প্রতীক, তেমনি শ্যামল বনানী স্নেহশীলতার প্রতীক। আবার অন্যদিকে দীঘার সমুদ্র শান্ত সমাহিত। সন্ধ্যা ও সকালের সূর্য্যাস্ত ও সূর্য্যোদয়ের রশ্মিসমারোহে লোহিত সমুদ্র দেখে মনে হয় যেন শহীদের রক্তে রাঙা সমুদ্র।

যেদিন এই মেদিনীপুরে তাম্রলিপ্তের তাম্রধ্বজের হাতে মহাবীর অর্জুন পরাজিত হয়েছিলেন সেই দিনেই চির-উন্নতশির মেদিনীপুরের ঐতিহাসিক জন্মের সূচনা হয়েছিল। তারপর হাজার-হাজার বছর

নানা দেশী-বিদেশী অভিযানকারী, ভ্রমণকারী, ভাগ্যান্বেষী এখানে এসেছে এবং তাদের একটা বিরাট অংশ মেদিনীপুরের দেহে লীন হয়ে গেছে। এখানকার মাটির এমন গুণ, এখানকার হাওয়ার এমন দাক্ষিণ্য, এখানকার শ্যামল বনানীর এমন পেলবতা, এখানকার দীঘা ও হলদিয়ার সমুদ্রের এবং ঝাড়গ্রামের শালবনের এমন দুর্নিবার আকর্ষণ যে, কেহ মেদিনীপুরে এসে কিছুদিন বাস করলেই তিনি আর বহিরাগত থাকেন না। এই জেলা নবাগতকে অন্তরের জারক রসে পরিপাক করে অচিরেই তাঁকে মেদিনীপুরিয়ায় পরিণত করে।

বিদ্যাসাগর কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। জাতীয়তার জনক, বর্ত্তমান বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জনক, নারীশিক্ষার পথিকৃৎ, বিধবাবিবাহের প্রবক্তা, শিক্ষাবিদ্, সমাজসংস্কারক, দেশপ্রেমী, দয়ার সাগর করুণাময় বিদ্যাসাগরের জন্ম এই জেলারই মাটিতে সম্ভব। বিদ্যাসাগরের জীবন কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না, তবে তাঁর জীবন-কথা বলা আরম্ভ করলে থামা মুস্‌কিল। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "দুর্জয় মনুষ্যত্ব ও অজেয় পৌরুষের এমন সমাবেশ আর কোথাও ঘটেনি।" মধুসূদন লিখেছেন: "He (Vidyasagar) has the wisdom of an ancient sage, the courage and intellect of an English man and the heart of a Bengali mother." বিদ্যাসাগরের মধ্যে 'বজ্রাদপি কঠোরানি, মৃদূনি কুসুমাদপি' যে-চরিত্র তা বিশ্বে সত্যই তুলনারহিত।

বিদ্যাসাগরের জন্মের প্রায় ৬০ বছর পরে জন্মালেন মেদিনীপুরের আর এক মহান সন্তান। তাঁর মধ্যে মেদিনীপুরের তেজোবীর্য, গরিমা, জাতীয়তাবোধ, আপোষহীন সংগ্রামী সত্ত্বা, আত্মোৎসর্গ ও সর্বোপরি করুণায় বিগলিত একটি বাঙালী মাতৃহৃদয় দেখা গেল। তিনি হলেন দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল।

দু'জনের পটভূমি আলাদা, ঐতিহাসিক সময় বিভিন্ন, কর্মক্ষেত্র ভিন্ন-ভিন্ন—কিন্তু দু'জনের মধ্যে চরিত্রগত ঐক্য এবং কর্মক্ষমতার

মৌলিক দিকগুলিতে সাদৃশ্য লক্ষ্য করবার মতো, বস্তুতঃ বীরেন্দ্রনাথ ছিলেন আক্ষরিক অর্থে বিদ্যাসাগরের যোগ্য উত্তরসূরী।

আপাত দৃষ্টিতে বিদ্যাসাগর ও বীরেন্দ্রনাথের মধ্যে তুলনা চলে না বলেই মনে হয়। কারণ একজন কখনো রাজনীতি করেন নি। অন্যজন মুখ্যতঃ জনসেবার মাধ্যমে রাজনীতিক নেতা। একজন দরিদ্রের সন্তান, অন্যজন অভিজাত ধনীর দুলাল ও প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী। কিন্তু বিদ্যাসাগরের যে অসীম তেজ ও বীর্য কাউকে পরোয়া করতো না তা বীরেন্দ্রনাথের মধ্যে স্ফুরিত হতে দেখা গেছে। বাস্তবিক পক্ষে দু'জনেরই তেজ ও বীর্যের চরিত্র ও চেহারা মূলতঃ একই প্রকৃতির। তেজোদৃপ্ত এবং দেশ ও জাতির চিরকালের হৃদয়ের সম্রাট বিদ্যাসাগরের তাই যোগ্য উত্তরাধিকারী তেজোদৃপ্ত ও দরদী বীরেন্দ্রনাথ।

যখন দেশের কাজ করতে হলে প্রাণ দেবার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে সমস্ত রকমের নির্য্যাতন সহ্য করে' সর্বস্বান্ত হবার জন্য তৈরী থাকতে হ'ত, তখন নেতা ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ। এখন রাজনীতি মানেই ধান্ধাবাজি—মায়ের পেট থেকে পড়েই "ওমা দে মা আমায় তফিলদারি / আমি দেখাব তোমায় মজাদারি।"—এই দিয়ে রাজনীতি আরম্ভ হয়। তাই এখন বোঝা শক্ত, কেন বীরেন্দ্রনাথ রাজনীতিক নেতা হয়েও এত শ্রদ্ধেয়, এত বরেণ্য, যার নাম প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগরের সঙ্গে উচ্চারণ করতে কোন বাধা নাই।

বীরেন্দ্রনাথ ছিলেন অনমনীয় ক্ষাত্রতেজে পূর্ণ। কোন অন্যায়, কোন অবিচার তিনি জীবনে কখনো সহ্য করেন নি। বিদেশীর শাসনভ্রূকুটিকে আমল না দিয়ে তিনি অবিচলিত ছিলেন তাঁর পথে। গণ-আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতা, জনজীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে যুক্ত, স্বাধীনতাসংগ্রামী, আপন সুখসুবিধায় উদাসীন, সর্বত্যাগী মহাপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ সত্যই দেশপ্রাণ। জীবনের অত্যন্ত উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ, আইনব্যবসায়ে প্রচুর ধনার্জন—সব কিছু বিসর্জন দিয়ে তিনি দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

তাঁর চরিত্রের আরো একটা দিক ছিল—তা ছিল পুরোপুরি আপোষহীনতা। এইখানেই তিনি অনন্য, এইখানেই তিনি রাজনীতির সংকীর্ণ ক্ষেত্র উত্তীর্ণ হয়ে মানবাদর্শের বৃহত্তর ক্ষেত্রে একটি মহান আদর্শ, একটি প্রতীক, একটি আন্দোলন হয়ে পরিলক্ষিত। যে-নেতা দেশ ও জাতিকে গঠন করে, যে-নেতা মানবসমাজকে ভবিষ্যতের পথ নির্দেশ করে, যে-নেতা মানবমুক্তির পুরোধা—সেই নেতার দুর্লভ গুণাবলি তাঁকে শুধু তার সমকালীন দেশবাসীর মনে বিশিষ্ট স্থান দেয়নি, চিরকালের জন্য সমস্ত মানুষের মনে স্থায়ী আসন দিয়েছে। আদর্শবাদী-বিপ্লবী-সংগ্রামী মনোভাব, চারিত্রিক দৃঢ়তা, অনমনীয় মানসিক শক্তি তাঁকে অনন্যসাধারণ করে' তুলেছিল। তিনি ছিলেন গান্ধীর অনুরাগী, কিন্তু নীতির ক্ষেত্রে তাঁর সমালোচনা করতে তিনি পিছপাও ছিলেন না। দেশবন্ধুর সহকর্মী, মতিলালের বন্ধু, জনগণের সেনাপতি ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ। তাঁর এক পদক্ষেপে সারা মেদিনীপুর উথালপাথাল হয়ে যেত। ব্রিটিশ সিংহ তাঁর সামনে শেয়ালের মতো লেজ গুটিয়ে সম্মুখযুদ্ধ পরিত্যাগ করে পেছনের দরজা দিয়ে তাঁকে হায়রান করত। তিনি বিপ্লবী ছেলেদের মামলা বিনা পয়সায় চালিয়ে নূতন-নূতন বিপদের ঝুঁকি নিয়েছিলেন।

দুর্ভাগ্য এদেশের ও দুর্ভাগ্য এ জাতির যে, এই ইস্পাতদৃঢ় মহান নেতা অকালে মহাপ্রয়াণ করেন। তাঁর কাছ থেকে দেশবাসী যা পেয়েছিল তার তুলনা নাই। তিনি দীর্ঘদিন বেঁচে থাকলে মনুষ্যত্ব ও বীর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর নির্মল ও আদর্শ রাজনীতিক জীবন চিরস্থায়ী আরো অনেক অবদান রাখত।

"জীবনে কখনো মাথা নত করিনি, মরণে যেন আমার মাথা নত না করা হয়। আমাকে যেন উর্দ্ধশিরে দাহ করা হয়।"—একথা বীরেন্দ্রনাথের পক্ষেই বলা সম্ভব। চির-উন্নতশির বীরেন্দ্রনাথ সত্যই যে বীর্য্য ও ব্যক্তিত্বের গরিমা রেখে গেছেন তা আমাদের চিরকালের আদর্শ ও উদ্দীপনার বস্তু।

ঘাটাল মহকুমায় দেশপ্রাণ

শ্রীঅরবিন্দ মাইতি

ঘাটাল মহকুমায় ১৯২০ সালের পূর্ব হইতেই কংগ্রেস কমিটি ছিল, কিন্তু সংগঠনটি অতি দুর্বল ছিল। বীরেন্দ্রনাথ যখন মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেসের ভার লইয়াছিলেন সেই সময় ঘাটাল মহকুমা কংগ্রেসের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং উহা শক্তিশালী করিবার কথা চিন্তা করিতে থাকেন।

দাসপুর থানার রাধাকান্তপুর গ্রামের অধিবাসী উকিল শ্রীমোহিনী মোহন দাস বীরেন্দ্রনাথের সহপাঠী বন্ধু ছিলেন। মোহিনীমোহন মেদিনীপুর কোর্টে ওকালতি করিতেন। ১৯২০ সালে বীরেন্দ্রনাথ মোহিনীমোহনকে ঘাটাল কোর্টে যোগদান করিবার পরামর্শ দেন। উদ্দেশ্য—ঘাটাল মহকুমা কংগ্রেসকে শক্তিশালী করা। তদনুযায়ী মোহিনীমোহন ১৯২০ সালেই ঘাটাল কোর্টে যোগদান করেন এবং ঘাটাল মহকুমা কংগ্রেস পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। মোহিনী মোহন—ঘাটাল, দাসপুর ও চন্দ্রকোণা থানা কংগ্রেস কমিটি তিনটি গঠন করেন এবং ঘাটাল মহকুমায় কংগ্রেস সংগঠন শক্তিশালী করেন। ঐ সময় মোহিনীবাবু ঘাটাল মহকুমা কংগ্রেসের সভাপতি এবং ডাঃ যতীশচন্দ্র ঘোষ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

মোহিনীমোহন ঘাটালে আসার পর বীরেন্দ্রনাথের সহিত ঘাটাল মহকুমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। ডাঃ যতীশচন্দ্র ঘোষ, অলৌকিকচন্দ্র মাইতি, রামচন্দ্র দাস, হৃষীকেশ পাইন, বিনোদবিহারী বেরা, মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কর্মিগণ বীরেন্দ্রনাথের সহিত যোগাযোগ রাখিয়া কংগ্রেস কমিটি সংগঠনের কর্ম করিতে থাকেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ঘাটাল মহকুমার ঘাটাল শহরে, চন্দ্রকোণা শহরে এবং

দাসপুর থানার সোনাখালি হাই স্কুলের খেলার মাঠে বিরাট জনসভা হয়। এই সব সভায় বীরেন্দ্রনাথ ভাষণ দিয়াছিলেন। উক্ত সভাগুলিতে বীরেন্দ্রনাথের অভ্যর্থনার জন্য দাসপুরবাসিগণ রাজকীয় ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কোন নেতাকে দাসপুর থানায় ঐরূপ সম্বর্দ্ধনা ঐ ঘটনার পূর্বে এবং পরে কখনও দেওয়া হয় নাই।

বীরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান হওয়ার পর মোহিনীমোহন ঘাটাল লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। সেই সময় বীরেন্দ্রনাথ বহুবার ঘাটালে পদার্পণ করেন।

ঐ সময়ের একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা এই রূপ : ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান বীরেন্দ্রনাথ ঘাটাল শহরে আগমন করিয়াছেন এবং বন্ধু মোহিনীমোহন দাসের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন এই সংবাদে ঘাটাল মহকুমার তিন থানার বহু ভদ্রলোক বীরেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন এবং কয়েকটি রাস্তা নির্মাণ ও পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারের আবেদন রাখেন। বীরেন্দ্রনাথ চেয়ারম্যান থাকাকালে ঘাটাল মহকুমায় সহস্রাধিক পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিয়া দিয়াছিলেন। ঐদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বহুলোক উপস্থিত হওয়ায় মোহিনী-বাবুর ব্যবস্থাপনায় বীরেন্দ্রনাথ ঘাটাল বালিকা বিদ্যালয়ে আসিয়া বসেন এবং সেইখানেই ঘাটাল মহকুমার গ্রামসমূহের উন্নয়নের কথা আলোচিত হয়।

ঘাটাল শহরের কোন্নগর অঞ্চলে হড়পুকুর নামক একটি পুষ্করিণী রহিয়াছে। উক্ত পুষ্করিণীর মালিক ছিলেন আশুতোষ হড়। পুষ্করিণীর জল স্থানীয় দেবদেবীর সেবাপূজায় ব্যবহার করা হইত এবং গ্রামবাসিগণ পানীয় রূপে ব্যবহার করিত। ঐ 'হড়' পদবীযুক্ত ব্রাহ্মণগণ ও কোন্নগরবাসিগণ উক্ত বালিকা বিদ্যালয়ে সমবেতভাবে বীরেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং হড় পুকুরটির পঙ্কোদ্ধার করিয়া দিবার আবেদন জানান। তাহাতে বীরেন্দ্রনাথ বলেন, "এই পুষ্করিণী ঘাটাল মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত। আমি কিরূপে ইহার পঙ্কোদ্ধারের

ব্যবস্থা করিতে পারি ?" এই কথা বলায় কয়েকটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলেন, "বাবা, আমরা তোমার নাম শুনে এসেছি, মা কালীর ইচ্ছায় তোমার চেষ্টায় সবই সম্ভব হবে। তোমাকে এই পুকুরের পঙ্কোদ্ধার ক'রে দিতেই হবে"। এইরূপ কথা বলায় দরদী বীরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মণদের অবস্থা উপলব্ধি করিয়া তাঁহাদিগকে কথা দিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের আবেদন মঞ্জুর হইবে। তদনুযায়ী পুষ্করিণীটির পঙ্কোদ্ধার হইয়াছিল। মোহিনী-বাবু বলিয়াছিলেন—শাসমল পাওয়ার হাউস (Power House)—শক্তির আধার। ইহার পরবর্তী ঘটনা—মেদিনীপুর জেলাবোর্ডের মিটিংএ বিরোধী পক্ষ প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন চেয়ারম্যান অধিকারবহির্ভূত কাজ করিয়াছেন—মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে কোন টাকা খরচ করিবার অধিকার জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যানের নাই। পরের মিটিং-এ বীরেন্দ্রনাথ এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন। তাহাতে বিরোধী পক্ষ নির্বাক হইয়া যান। মোহিনীমোহন বলিয়াছিলেন, "বীরেন্দ্রনাথ সেদিন পুরাতন রেকর্ড থেকে উদাহরণ দেখিয়ে এবং আইনের সাথে মিলিয়ে ওজস্বিনী ভাষায় যে-বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাতে মনে হচ্ছিল যেন বিদ্যুৎ ঝলকাচ্ছে। বিরোধী পক্ষ চুপ করেছিলেন এবং প্রসঙ্গও শেষ হয়ে গিয়েছিল।"

এইরূপে বীরেন্দ্রনাথ প্রতি থানায় প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই একটি করিয়া পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিয়া দিয়াছিলেন। এখনও বয়স্ক লোকেরা বলেন যে, শাসমলের আমলে যেরূপ পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার হইয়াছিল এরূপ আর কখনও হয় নাই।

ঘাটাল শহরে শীলাবতী নদীর উপর যে-সেতু নির্মিত হইয়াছে সেই সেতুর নাম বিদ্যাসাগর সেতু। জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান থাকা কালে বীরেন্দ্রনাথ ঘাটাল শহরে পদার্পণ করিয়া ঘাটাল মহকুমার তিন থানার মধ্যে যোগাযোগের কথা চিন্তা করেন এবং তিনিই প্রথম ঘাটাল শহরে শীলাবতী নদীর উপর সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা করেন। সেই সময় শ্রীমোহিনীমোহন দাস, ডাঃ যতীশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি বহু

ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। অনেকে বন্যাবিধ্বস্ত ঘাটালের অবস্থা বিবেচনা করিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, এরূপ সেতু নির্মাণ অসম্ভব। কিন্তু আমরা বর্তমানে দেখিতেছি—৬০ বৎসর পূর্বের বীরেন্দ্রনাথের চিন্তাধারা ও পরিকল্পনা রূপায়িত হইয়াছে।

ঘাটাল মহকুমার ঘাটাল থানার অধিকাংশ স্থান বন্যাবিধ্বস্ত হয়। বীরেন্দ্রনাথ বন্যাত্রাণের জন্য এইসব এলাকায় কয়েকবার আসেন। এখনও খাসবাড় অঞ্চলের বয়স্ক লোকেরা সেই ঘটনা স্মরণ করে এবং তাহাদের নিকট দেশপ্রাণের কথা বলিলে 'শাসমল মহাশয়' বলিয়া হাত তুলিয়া নমস্কার জানায়।

ব্যারিষ্টার বীরেন্দ্রনাথ

বীরেন্দ্রনাথ ব্যারিষ্টার রূপে ঘাটাল মহকুমার কয়েকটি মামলার পরিচালনায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য—মোহিনীমোহন দাসের পুত্র ও শ্রীমানবেন্দ্রনাথ রায়ের জীবনী প্রণেতা শ্রীস্বদেশরঞ্জন দাস এবং ঘাটালের কবি শ্রীহরিসাধন পাইনের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনের মামলা। হুগলীর চুঁচুড়া কোর্টে বিচার আরম্ভ হয়। এই মামলায় বীরেন্দ্রনাথ স্বদেশরঞ্জন ও হরিসাধন পাইনকে সমর্থন করিবার জন্য চুঁচুড়া কোর্টে যাইতেন। স্বদেশরঞ্জন ও হরিসাধন বীরেন্দ্রনাথের বর্ণনা দিতেছেন—"এমন মানুষটি আর দেখিনি। প্রতি ধার্য্য দিনে শাসমল মশায় নিজের গাড়ীতে করে চুঁচুড়া কোর্টে আমাদের মোকর্দ্দমা চালাতে যেতেন এবং আমাদের জন্য বাড়ী থেকে খাবার তৈরী করে আনতেন। শাসমলের কৃতিত্বে আমরা খালাস হই। কাগজপত্র সংগ্রহ করার জন্য শাসমল মশায় নিজেই খরচ করতেন। শাসমলকে দেখলে আমাদের প্রাণে যে আনন্দের উদয় হ'ত আমরা ভাষায় তার বর্ণনা দিতে পারি না। তিনি আমাদের উদ্ধার ক'রেছিলেন।"

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে দাসপুর থানার কয়েকটি স্থানে নাপিত বিদ্রোহ ঘটে। কয়েকটি গ্রামের, যথা—দাসপুর থানার গোছাতি, রাণীচক,

জোত কানুরামগড়, জয়রামচক, সাহাচক প্রভৃতি গ্রামের নাপিতগণ প্রকাশ্যে ঘোষণা করে যে, তাহারা তাহাদের যজমানের বাড়ীতে উৎসব ক্ষেত্রে অতিথিদের পা ধুইয়া দিবে না। যেহেতু এই অঞ্চল মাহিষ্যপ্রধান সেইহেতু মাহিষ্যগণ এই বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। তাহারা থানাব্যাপী নাপিতগণকে সামাজিক বয়কট করে, এমন কি, কাপড়-ভুষিমালের দোকান, হাট-বাজারও বন্ধ করে। পুরোহিত-মুনিষ বন্ধ করে। শেষ পর্য্যন্ত গোছাতি গ্রামের উপেন্দ্রনাথ-সুরেন্দ্রনাথ মান্নার বাসগৃহ রাত্রিকালে ঘেরাও করে এবং সেখানে অত্যাচার করে। বিশেষত্ব এই যে, উপেন্দ্রনাথ এবং সুরেন্দ্রনাথ মান্না নাপিতের কার্য্য করিতেন না। তাঁহারা ছিলেন এতদঞ্চলের বিখ্যাত ডাক্তার। উপেন্দ্রনাথের নিজস্ব পাল্কী ছিল, সেই পাল্কীও ভাঙ্গিয়া নষ্ট করিয়া দেয়। গৃহের দরজাজানালা ভাঙ্গিয়া ঘরে ঢুকিয়া আসবাবপত্র নষ্ট করিয়া দেয়। ফলে পুলিশ-কেস হয়। আসামী হন জমিদার রাখালচন্দ্র মণ্ডল ও গ্রাম্য প্রধানগণ। আসামীগণ বীরেন্দ্রনাথকে ব্যারিষ্টার নিয়োগ করেন। অনুরূপ ঘটনা, আরও মারাত্মক ঘটনা, দাসপুর থানার জোতকানুরাম গ্রামেও অনুষ্ঠিত হয়। এই দুই গ্রামের আসামীগণ বীরেন্দ্রনাথকে ব্যারিষ্টার নিয়োগ করিয়াছিলেন। এই মোকর্দ্দমা দুইটিতে, বীরেন্দ্রনাথ যে যথার্থ হৃদয়বান, দরদী ও পুরুষসিংহ ছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। জোতকানুরামগড়ের ঘটনাটি ঘটিয়াছিল ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের একদিন দুপুর বেলায় এবং ঐ গ্রামের নাপিতের বাড়ীতে অত্যাচার আরও ভয়ানক। ঐ সময় ঐ নাপিতের গৃহে একটিমাত্র অল্পবয়স্কা মহিলা ছিলেন। তিনি আসামীদের আসিতে দেখিয়া ভয়ে সদর দরজা খিল দিয়া বন্ধ করেন। আসামীগণ দরজাটি ভাঙ্গিতে না পারিয়া তাহার গৃহের চাল টপকাইয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করে এবং মহিলাটিকে মারধোর করে, গৃহের তৈজসপত্রাদি নষ্ট করিয়া দেয় এবং কতক জিনিষ লইয়া পলায়ন করে। ফলে পুলিশ

কেস হয়। এই দুই মামলায় বীরেন্দ্রনাথ ব্যারিষ্টার নিযুক্ত হন এবং ঘাটাল কোর্টে মামলা চলা কালে মোহিনীমোহন দাস মহাশয় মামলা পরিচালনায় নিযুক্ত থাকেন। ঘাটাল কোর্টে জোতকান্দুরামগড়ের মহিলাটিকে জেরা করিয়া বীরেন্দ্রনাথ বুঝিতে পারেন যে, আসামীগণ তাঁহাকে যাহা বলিযাছিল তাহা সর্বৈব মিথ্যা এবং এরূপ ঘটনা ঘটিবার প্রকৃত কারণ অবগত হইয়া বীরেন্দ্রনাথ দুই গ্রামের মক্কেলদিগকে বলেন, "আমি সমস্ত বিষয় বুঝিয়াছি, তোমরা মানুষ, নাপিতরাও মানুষ, তাহাঁদের দ্বারা পা ধুইয়ে দেওয়াব দাবী তোমাদের সম্পূর্ণ অন্যায়। সেবা স্বেচ্ছায় না হ'লে জবরদস্তী ক'রে আদায় করতে যাওয়া তোমাদের পক্ষে অমানুষের কাজ। তোমরা বাদীর কাছে ক্ষমা চাও।" এইভাবে তিনি এই দুইটি মামলা মীমাংসা করিয়া দিয়া শান্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি ঘাটাল ফৌজদারী আদালতের গ্রন্থাগারে হরি সিং গৌড় রচিত পেন্যাল কোড গ্রন্থ দান করিয়া গিয়াছেন। এখনও সেই পুস্তক গ্রন্থাগারে রহিয়াছে।

রাইমণি হাসপাতাল ও হসপিট্যাল রোড্ নির্মাণ

৺ রাধানাথ মাইতি মহাশয় দাসপুর থানার কেলেগোদা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি কলিকাতার হগ মার্কেটে দীর্ঘদিন সবজি-বিক্রেতা ছিলেন। তাঁহাকে Cabbage King of Calcutta বলা হইত। কালিঘাট রোডের পার্শ্বে তাঁহার একটি বাড়ী ছিল এবং ঢাকুরিয়া লেক এলাকায় তাঁহার সবজি চাষের বহু জমি ছিল। লেক-খননের ফলে তাঁহার বহু জমি গিয়াছে। বীরেন্দ্রনাথ ছিলেন রাধানাথ মাইতি মহাশয়ের বিশেষ বন্ধু লোক এবং রাধানাথের কালিঘাটের বাড়ীতে প্রায়ই যাইতেন। উক্ত রাধানাথ মাইতি মহাশয়ের পত্নীর নাম শ্রীমতী রাইমণি মাইতি। রাধানাথের পুত্র-কন্যা ছিল না। রাইমণি অসুখে ভুগিতেন। কেলেগোদা গ্রাম হইতে কলিকাতা আসিতে হইলে, গ্রাম হইতে পায়ে হাঁটিয়া রূপনারায়ণ নদের গোপীগঞ্জ

ষ্টেশনে পৌঁছিয়া ষ্টীমারে চড়িয়া পরে কোলাঘাটে ট্রেনে উঠিয়া হাওড়ায় আসিতে হইত। কেলেগোদা হইতে গোপীগঞ্জ ষ্টেশন প্রায় ৭।৮ মাইল পথ। এই পথ পায়ে হাঁটিয়া অতিক্রম করা বড়ই কষ্টকর ছিল, বিশেষতঃ বর্ষাকালে। সেইজন্য রাইমণি তাঁহার স্বামী রাধানাথ মাইতি মহাশয়কে প্রায়ই গোপীগঞ্জ যাতায়াতের রাস্তা নির্মাণের কথা, আর একটি হাসপাতাল স্থাপনের কথাও বলিতেন। এই কথা বীরেন্দ্রনাথ শুনিয়াছিলেন। রাইমণি বীরেন্দ্রনাথকেও তাঁহার ইচ্ছার কথা বলিয়াছিলেন। রাধানাথ মাইতি মহাশয়ের কিন্তু এ-বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ ছিল না। কিন্তু বীরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুর জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান হওয়ার পর রাধানাথ মাইতি মহাশয়কে বলেন, "রাইমণির ইচ্ছা তোমাকে পূর্ণ করতেই হবে। জেলাবোর্ডে টাকা জমা দাও, আমি তারপর ব্যবস্থা করছি।" বীরেন্দ্রনাথের চেষ্টায় শেষ পর্য্যন্ত সোনাখালি হাটের পার্শ্বে রাইমণি হাসপাতাল স্থাপিত হয় এবং গোপীগঞ্জ হইতে সোনাখালি হইয়া ঘাটাল পর্য্যন্ত রাইমণি রোড্ প্রস্তুত হয়। রাস্তাটির নাম হইয়াছে রাইমণি হাসপাতাল রোড্। রাস্তাটি নির্মাণের পর ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরের তৎকালীন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বি. ঈ. বার্জ্জ রাস্তা ও হাসপাতালের উদ্বোধন করেন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য

রাইমণি রোড ও রাইমণি হাসপাতাল উদ্বোধনের জন্য ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে বার্জ সাহেব লেডি বার্জ সহ ঘাটাল আসিয়াছিলেন। সাহেবদম্পতি কোলাঘাট হইতে ষ্টীমারে গোপীগঞ্জ ষ্টেশনে নামিয়া প্রথমেই রাইমণি হসপিট্যাল রোডের উদ্বোধন করেন। পরে সেখান হইতে তাঁহারা সোনাখালিতে হাসপাতাল উদ্বোধন করিবার জন্য উপস্থিত হন। বার্জ-দম্পতি বাংলা ভাষা বুঝিতেন এবং উভয়েই ভাল বাংলা বলিতে পারিতেন। হাসপাতাল উদ্বোধন করার পর একটি সভা হয়। সভায় অনেকেই রাইমণির জীবন আলোচনা করেন।

লেডি বার্জ বলেন—'এরূপ মহীয়সী মহিলার গ্রামের গৃহ দেখিতে যাইব।' তদনুযায়ী বার্জদম্পতি কেলেগোদা গ্রামে রাধানাথ মাইতি মহাশয়ের বাড়ীতে আসেন। রাধানাথ-বাবু সঙ্গে আছেন। আরও অনেক লোক রাধানাথ-বাবুর বাড়ীতে আসিলেন। রাধানাথ-বাবুর গৃহের সম্মুখে বার্জদম্পতি দাঁড়াইয়া রহিলেন, রাধানাথ-বাবু সাহস করিয়া অভ্যর্থনার কোন কথা বলিতেছেন না। এইরূপ অবস্থায় বার্জ সাহেব স্বয়ং প্রথমেই কথা বলিলেন—"রাধানাথ-বাবু, আপনি কেন চুপ করিয়া আছেন—আপনি কেন লেডি বার্জকে অভ্যর্থনা করিতেছেন না? লেডি বার্জ আপনার কন্যা আছে। তখন রাধানাথ ভাবাবেগে বলিতে থাকেন, "মা, তুমি কন্যা, আমার কত আনন্দ, আমার ঘরে চল", এই বলিয়া তিনি অভ্যর্থনা জানান এবং বার্জ সাহেবকে বলেন—"বাবা, উনি যখন আমার কন্যা—তুমি তাহ'লে আমার জামাই হ'লে আজ থেকে।" তাহাতে বার্জ সাহেব বলেন, "হাঁ, আপনি আমার শ্বশুর আছেন।" তারপর মাইতি মহাশয় মেয়ে ও জামাই-এর হাত ধরিয়া তাঁহার গৃহের মধ্যে লইয়া যান এবং আমাদের দেশীয় প্রথায় মেয়ে-জামাইকে আসনে বসাইয়া থালায় করিয়া লুচি, মিষ্টি, ফল ইত্যাদি খাদ্য ভোজন করান। সেই সময় রাধানাথ মাইতি মহাশয় প্রায়ই মেদিনীপুর শহরে যাইয়া মেয়ে-জামাইকে দেখিয়া আসিতেন। সে সময় মেদিনীপুর শহরে 'কারফিউ' ছিল। কিন্তু রাধানাথের পক্ষে ম্যাজিষ্ট্রেটের কোয়ার্টার্সে অবাধ গতি ছিল।

পরে মেদিনীপুরে বার্জ সাহেব নিহত হন। তখন লেডি বার্জ বিলাত চলিয়া যাওয়ার সময় হগ মার্কেটে আসিয়া রাধানাথ মাইতি মহাশয়কে বলিয়াছিলেন—"বাবা, বল, তোমার জামাই কি এমন দোষ করেছিল যেজন্য তোমার জামাইকে মেদিনীপুরের লোক এমনভাবে হত্যা করল।"

দেশপ্রাণ-স্মৃতি

শ্রীরাখালচন্দ্র মাইতি

মেদিনীপুর জেলার রাজনীতিক গুরু, ভারতবর্ষের অন্যতম নির্ভীক জননায়ক দেশপ্রাণ সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত জ্ঞান সংক্ষেপে লিখছি।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে শাসমল মশায়ের সঙ্গে আমার পরিচয়। তখন তিনি একজন অসহযোগী ব্যারিস্টার এবং আমি কাঁথি হাই স্কুলের ফার্স্ট ক্লাশের (বর্তমান ১০ম শ্রেণীর) পড়া ছেড়ে দিয়ে একজন অসহযোগী ছাত্র। তাঁর কাঁথির পাকা জীর্ণ দোতলা ঘরে সদ্য-প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যালয়ে আমি যোগ দিয়েছি। ঐ জাতীয় বিদ্যালয় সমগ্র কাঁথি মহকুমার কংগ্রেসী আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ছিল।

বোধ হয়, ১৯২২ খৃষ্টাব্দে আমি তাঁর সঙ্গে কাঁথি মহকুমার সমগ্র রামনগর থানা পরিভ্রমণ করেছি। প্রায় প্রতি বিকালে থানার কোন না কোন জায়গায় তিনি গান্ধীজীর কর্মধারা প্রচার করতেন এবং পরদিন সকালে আমরা সঙ্গীস্বেচ্ছাসেবকগণ গ্রামে গ্রামে গিয়ে তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের চাঁদা সংগ্রহ করতাম। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে একবার আমরা সকলে তাঁদের বীরকুল কাছারীতে গিয়ে থাকি। সেখানে একদিন বা দুইদিন রাত্রে তাঁকে হারমোনিয়ম বাজিয়ে একটি গানের যে দুটি ছত্র গাইতে শুনেছি, এখনো আমার মনে আছে :

"সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি নন্দনফুলহার।
তুমি অনন্ত নব বসন্ত অন্তরে আমার ॥"

তারপর বোধ হয়, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান তখন একদিন সকালে আমার এক কাকা সহ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছলাম। তিনি বোর্ডের দক্ষিণ বারান্দায় বসে' জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের জন্য সাহিত্য পাঠ্য পুস্তক

বাছাই করছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, "দেখ, আমি যে বইর প্রথম পৃঠায় রাজারাণীর ছবি দেখছি সে বই ছিঁড়ে অকেজো কাগজের বাক্সে ফেলে দিচ্ছি।" তারপর কথা প্রসঙ্গে গ্রামে তুলা চাষ, ভাগে সুতা কাটানো প্রভৃতি বিষয়ের কথা বললেন। তাঁর সেকথা আমি ভুলিনি। তারপর বোধ হয়, ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে যখন আমি প্রথম কংগ্রেসী ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট, সে সময় আমাদের ইউনিয়ন বোর্ড কার্যালয়ে তুলা, তুলাবীজ ও সূতাকাটাব কিছু সরঞ্জাম রেখে থানায় একটি খাদি সমিতি প্রতিষ্ঠা করি—নাম দিই বীরেন্দ্র খাদি সমিতি।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে শাসমল মশায় কলিকাতা থেকে গৌহাটি কংগ্রেসে যান। কাঁথি থেকে কাঙাল চাঁদ গিরি প্রমুখ কয়েকজন এবং আমি গৌহাটি যাই। ঐ কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি তরুণরাম ফুকন। কংগ্রেস উপলক্ষে নেতাদের থাকা-খাওয়ার আলাদা ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু শাসমল মশায় নেতাদের জায়গায় থাকলেন না—আমাদেরই সঙ্গে প্রতিনিধি ক্যাম্পেই থাকলেন। দিনের বেলা প্রতিনিধিদের সাধারণ ভোজনাগারেই খেতেন। রাত্রে ভাত খেতেন না—পুরি এনে দিতাম আমরা। এমনি তাঁর নিরহংকার চরিত্র এবং কর্মীদের প্রতি প্রীতি। এ সব গুণের জন্যই তিনি অবিসংবাদী জননায়ক হ'তে পেরেছিলেন।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে যখন লবণ আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয়, তখন কাঁথি মহকুমার সব থানাতেই ঐ আন্দোলন চ'লেছিল। বৃটিশ সরকারের পুলিশ মাঝে-মাঝে লবণ তৈয়ার কেন্দ্রগুলিতে গিয়ে কিছু ভাঙচুর করত, কিছু স্বেচ্ছাসেবককে মারপিট ও গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে যেত। এইভাবে বেশ কিছুদিন চলার পর আমরা কাঁথির কয়েকজন কলিকাতায় শাসমল মশায়ের বাসায় তাঁর পরামর্শের জন্য গেছলাম। তিনি আমাদের বললেন, "তোমরা একটা দিন 'বিজয়দিবস' বলে' ঠিক করে' তারিখটা সরকারকে জানিয়ে দিয়ে প্রতি গ্রামে লবণ তৈরী করতে লেগে যাও। দেখা যাক পুলিশ কত জায়গায় যায়।"

দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথের রাজনীতিক জীবন

শ্রীবসন্তকুমার দাস

(প্রাক্তন সংসদসদস্য)

১৯১৪ হ'তে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রথম মহাযুদ্ধ সমগ্র বিশ্বে এক অভূতপূর্ব রাজনীতিক বিপর্য্যয় ঘটে। ভারতবাসী যে আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ঐ যুদ্ধ হাজারে-হাজারে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল, কোটি-কোটি টাকা দিয়ে যুদ্ধের উপকরণ যুগিয়েছিল, খাদ্য ও শিল্পজাত নানা দ্রব্য দিয়ে যুদ্ধোদ্যমকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য প্রচুর প্রচেষ্টা চালিয়েছিল, তা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছিল।

যুদ্ধশেষে ভারতবাসীকে প্রকৃত শাসন ক্ষমতার অংশীদার করা হয় নি। ভারতের ধনসম্পদ, সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধির কোন আয়োজন করা হয় নি। ভারতবাসীর প্রতি ইংরেজের চিরপোষিত অবিশ্বাস মূর্ত হ'য়ে উঠেছিল রৌলট আইনের শৃঙ্খল সৃষ্টির মধ্যে। তারপর জেনারেল ডায়ারের মেশিনগানের গুলিতে শত-শত নিরস্ত্র ব্যক্তির রক্তে রঞ্জিত হয়ে উঠেছিল জালিয়ানওয়ালাবাগের ধূসর ক্ষেত্র। অপর দিকে বৃটিশ মন্ত্রীমণ্ডলী-প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে' খালিফা পদের বিলোপসাধন করা হয়েছিল বিশ্বের মুসলমান সমাজের তীব্র প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে'।

এই সংকট মুহূর্তে আশাহত ক্ষুব্ধ ভারতবাসীর নেতা রূপে গান্ধীজী যে অসহযোগ কর্মধারা ভারতবাসীর মুক্তির পথ রূপে নির্দেশ করেছিলেন, আসমুদ্রহিমাচল সমগ্র দেশ তার প্রবল প্রবাহে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসের যে বিশেষ অধিবেশন আহুত হয়েছিল গান্ধীজী তাতে স্বৈরতন্ত্রী শয়তান সরকার

পরিচালিত শাসনের নিষ্পেষণচক্রকে সম্পূর্ণ অচল করে' দেওয়ার জন্য ও আত্মশক্তির হোমানল প্রজ্জ্বলিত করে' মুক্তিযজ্ঞের সাধনায় ব্রতী হবার জন্য ভারতবাসীকে আহ্বান জানিয়েছিলেন।

সেদিন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নগরী কলিকাতায় এদেশের বহু জননেতা চিন্তা- ও দ্বিধামুক্ত হতে পারেন নি। গান্ধীজী-উত্থাপিত অসহযোগ প্রস্তাবের কার্য্যকারিতা তাঁদের নিকট কুয়াশাচ্ছন্ন প্রতিপন্ন হয়েছিল। চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিনচন্দ্র পাল, ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ বঙ্গের রাজনীতিক ধুরন্ধরগণ তাঁদের ক্ষুরধার বুদ্ধির বিচারে গান্ধীজীর প্রস্তাবকে ছিন্নভিন্ন করে' তুলেছিলেন, কিন্তু গান্ধীজীর প্রাণপ্রদ মুক্তিযজ্ঞের আহ্বান যাঁদের অন্তঃকরণকে উদ্দীপ্ত করে' তুলেছিল বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ছিলেন তাঁদের অন্যতম। আইন ব্যবসায়ে যাঁরা সাফল্য অর্জন করেছিলেন, ব্যারিষ্টার বীরেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি বিনা দ্বিধায় গান্ধীজীর প্রস্তাব সমর্থন এবং অসহযোগ-কার্য্যধারা বরণ করেছিলেন।

বীরেন্দ্রনাথের রাজনীতিক জীবনের ইহাই ছিল শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত। তিনি প্রাণেমনে অনুভব করেছিলেন অসহযোগ ব্রত গ্রহণের তাৎপর্য্য কি। জমিদার পরিবারের সন্তান রূপে আবাল্য সুখ ও প্রাচুর্য্যের ক্রোড়ে লালিতপালিত বীরেন্দ্রনাথকে প্রস্তুত হতে হয়েছিল ক্লেশকর, বিলাসবিভববর্জ্জিত এক কঠোর জীবন গ্রহণের জন্য। তাঁর 'স্রোতের তৃণ' পুস্তকে তিনি লিখেছেন (পৃঃ ৪) "ব্যবসায় ছাড়তেই হবে এবং ব্যবস্থাপক সভা পরিত্যাগ করতেই হবে স্থির করেছিলাম। কিন্তু একটু লজ্জা হচ্ছিল যে, সে-সময় বাংলার অন্য কোন ব্যারিষ্টার আমার সঙ্গে এই কাজে যোগ দিতে প্রস্তুত ছিলেন না এবং একটু দুঃখ হচ্ছিল যে, যাঁদিগকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধাভক্তি করতাম, যাঁদের হৃদয়ের সরলতা ও গভীরতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম, তাঁদের সম্মুখেই তাঁদের বিরুদ্ধে আমাকে ভোট দিতে হবে। আমার কোন কোন বন্ধু উপযাচক হয়ে যুক্তি দিয়েছিলেন যে, এ সময়ে একবার মহাত্মা

গান্ধীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হওয়া উচিত, কিন্তু পাছে কেহ মনে করেন যে, আমি প্রতিপত্তি বিস্তারের চেষ্টা করছি, সেইজন্যে তাঁর সঙ্গে একেবারেই সাক্ষাৎ করি নি। তার প্রায় এক বৎসর পরে সর্বপ্রথম মে দনীপুরে তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত আলাপ হয়েছিল।

"যাহা হউক, ভোট দিবার সময় উপস্থিত হ'লে স্রোতরাশির চঞ্চল তরঙ্গমালার উপর আমার তৃণ-বিনির্মিত ক্ষুদ্র তরণীখানিকে নিজের হাতে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম। ফলে ব্যবস্থাপক সভায় আসবার জন্যে যে আয়োজন করেছিলাম, তাহা প্রকাশ্যভাবে সংবাদপত্রে লিখে বন্ধ করে দিই। নূতন মক্কেলগণকে বলতে সুরু করি যে, আমি আর তাদের কোন কাজ করতে পারবো না। আমার কলকাতার বাসায় বসবাস করে যে কয়জন মেদিনীপুর ও হাওড়া জেলার ছাত্র স্কুলকলেজে অধ্যয়ন করত, তাহাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত অন্যত্র বসবাসের ব্যবস্থা করতে বলি।...শেষে রাষ্ট্রীয় মহাসমিতির ষট্‌ত্রিংশ অধিবেশনের জন্য নাগপুরের কংগ্রেস নগরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম।"

বীরেন্দ্রনাথ অসহযোগ ব্রত গ্রহণের পূর্বে পনর বছর স্বদেশী আন্দোলনের (১৯০৫) একজন উৎসাহী কর্মী ছিলেন। তিনি ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইংলণ্ড থেকে দেশে ফিরেন এবং তাঁর আইন ব্যবসায়ের মধ্যেও স্বদেশী প্রচারে সাধ্যমত সময় ব্যয় করেন। তখন 'বিলাতফের্তা'দের পোষাক-পরিচ্ছদ ও চালচলন তিনি গ্রহণ করেন নি। তিনি খাঁটি বাঙালী পোষাক ও আহারাদির পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বিলাত গমন কালে মাতার নিকট যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ব্যারিষ্টার রূপে দেশে বাসকালে তাঁর মধ্যে তার কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। কলিকাতা থেকে মেদিনীপুর কোর্টে এসে তিনি মেদিনীপুর মিউনিসিপ্যালিটি ও জেলা বোর্ডের কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলেন এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে সদস্য নির্বাচিত হলেন। এই সময় মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস কমিটির

পুনর্গঠনেও তিনি বিশেষ সহযোগ দেন। তখন আইনজীবীগণই কংগ্রেসের সর্বময় পরিচালক ছিলেন। বীরেন্দ্রনাথ বিশেষভাবে চেষ্টা করেছিলেন যাতে জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ কংগ্রেসে যোগদান করেন। এ-বিষয়ে 'মেদিনীপুর' পত্রিকার সম্পাদক দেবদাস করণ মহাশয় তাঁর বিশিষ্ট সহকর্মী ছিলেন।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত মেদিনীপুর জেলা রাজনীতিক সম্মেলনেরও তিনি একজন উল্লেখ্য প্রতিনিধি ছিলেন। এই সম্মেলনে 'গরম দল' ও 'নরম দল'-এর সৃষ্টি হয়। তার প্রতিক্রিয়া ভারতীয় রাষ্ট্রীয় মহাসমিতিতে বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। সুরাট কংগ্রেসের (১৯০৮) দক্ষযজ্ঞ একটি স্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনা। বীরেন্দ্রনাথ গরম দলের 'অরবিন্দপন্থী' না হয়ে নরম দলের নেতা সুরেন্দ্রনাথকেই সমর্থন করেছিলেন। তাঁর ছাত্রজীবনে বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথই তাঁর আদর্শ ছিলেন।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দ থেকে মেদিনীপুর জেলার বীর বিপ্লবীগণ ফাঁসির মঞ্চে ও দ্বীপান্তরের লোমহর্ষক বন্দীজীবনের মধ্যে আত্মবলিদানের যে-আদর্শ দেখিয়েছিলেন, বীরেন্দ্রনাথ আন্তরিক শ্রদ্ধার সঙ্গে তা স্মরণ করেছেন তাঁর 'স্রোতের তৃণ' পুস্তকে। মেদিনীপুরের কয়েকজন দ্বীপান্তরপ্রত্যাগত বিপ্লবীর সংস্পর্শে এসে তিনি তাঁদেরকে "দ্বীপান্তর-ফেরতা নরদেবতা" আখ্যায় ভূষিত করেছেন। যদিও তিনি তাঁদের কারো-কারো কার্য্যপ্রণালীর সঙ্গে একমত হতে পারেন নি তথাপি তাঁদের সেবাভাবে মুগ্ধ হয়েছিলেন একথা অকপটে প্রকাশ করেছেন। (স্রোতের তৃণ, পৃঃ ১২৮)। রাজনীতিক জীবনে বিপ্লবাদের কর্মপন্থার সহিত তাঁর মতপার্থক্য নিয়ে তিনি তাঁর কৃষ্ণনগর অভিভাষণে যে-কথা প্রকাশ করতে গিয়ে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন তার মধ্যে নিঃসন্দেহে কোন ব্যক্তিগত ঈর্ষা বা বিদ্বেষ ছিল না।

অসহযোগ ব্রত গ্রহণের ফলে বীরেন্দ্রনাথ বঙ্গের অন্যতম জন-নেতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যেমন রাজ-

ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করে সম্পূর্ণভাবে জনসেবার উত্তরীয় গ্রহণ করায় গান্ধীজীর পরেই ভারতনেতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হলেন, বীরেন্দ্রনাথও সেইভাবে দেশবন্ধুর উত্তরাধিকারিত্ব গ্রহণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত হ'লেন। নাগপুর কংগ্রেস অধিবেশনের পর ১৯২১ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি এবং দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ উহার সম্পাদক নির্বাচিত হন।

অসহযোগ কর্মধারার রাজনীতিক কার্য্যকারিতার দিকটি জনগণের সম্মুখে উপস্থিত করার সঙ্গে-সঙ্গে উহার নূতন ভারত গঠনের দিকটি গান্ধীজী তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে ভারতের জনগণের দৃষ্টিপথে এনেছিলেন।

বীরেন্দ্রনাথ গান্ধীজীর পথ অনুসরণ করে' অসহযোগ কর্মধারাকে একটি জীবনবেদ রূপে গ্রহণ করে'ছিলেন।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে সরকার মেদিনীপুর জেলাতে পল্লী স্বায়ত্তশাসন আইন অনুসারে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। বীরেন্দ্রনাথ বিচার করে' দেখেছিলেন ঐ আইন অনুসারে প্রচলিত ট্যাক্সের সর্বোচ্চ পরিমাণ সাত গুণ বৃদ্ধি ক'রেও একদিকে যেমন গ্রামের পথঘাট, পানীয় জল, পায়খানা ইত্যাদির উন্নতি সাধন সম্ভব হবে না, অন্য দিকে তেমনি বিদেশী সরকারের প্রভাব-প্রতিপত্তিবৃদ্ধি, নিজস্ব লোক সৃষ্টি এবং বিদেশী জীবনযাত্রার অন্ধ অনুকরণের পথ পরিষ্কার করা হবে। পল্লীর জনসাধারণ অযথা করভার বহন করেও গ্রামে সরকারী ঘাঁটি স্থাপনের যন্ত্রস্বরূপ হ'য়ে উঠলে গ্রাম্য জীবনে ক্রমে বিদেশী আদর্শের প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা হবে। বরিশালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে ইউনিয়ন বোর্ড বর্জনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'ল, কিন্তু প্রদেশ কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি এই প্রস্তাবের প্রতিকূল হলেন। বীরেন্দ্রনাথ এই কার্য্যকরী সভার অধিবেশনে যোগদান করতে পারেন নি। তখন তিনি যে-সংকটের সম্মুখীন হ'য়েছিলেন তাঁর 'স্রোতের তৃণ' পুস্তকে (পৃঃ ৯ ও ১০) তিনি বিশদরূপে তার বর্ণনা করেছিলেন।

তিনি কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই আন্দোলন করা উচিত নয় মনে ক'রে' সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত দায়িত্বেই 'ইউনিয়ন বোর্ড বর্জন' আন্দোলন আরম্ভ করলেন এবং জেলার প্রতি মহকুমার জনসভাগুলিতে সহস্র-সহস্র লোকের সম্মুখে বক্তৃতা দিয়ে এবং সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখে তাঁর মনোভাব ও কার্য্যপদ্ধতি ব্যাখ্যা করলেন। বীরেন্দ্রনাথ যে কিরূপ শক্তিমান সংগঠক, দক্ষ নেতা, মনোজয়ী বক্তা ও উপযুক্ত জনসংগ্রাহক তার পরিচয় জাজ্জ্বল্যমান হ'য়ে উঠল। তিনি বললেন যে, তিনি নিজে ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স দেবেন না? তাঁর কাঁথির বসতবাটীর দ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত রাখবেন যাতে ট্যাক্স-আদায়কারীরা বিনা বাধায় তাঁর মাল ক্রোক করতে পারেন। গ্রামে-গ্রামে বিপুল সাড়া পড়ে' গেল। পুলিশসহ আদারকারীরা গৃহস্থের বাড়ীতে উপস্থিত হ'লে তাঁরা তাঁদের উপর নির্ধারিত ট্যাক্সের দশ-বিশ গুণ দামের মাল ওঁদের সামনে ধ'রে দিলেন। ওঁদের গ্রাম-প্রবেশকে গ্রামের মহিলাগণ শঙ্খ-ধ্বনি দ্বারা ঘোষণা ও অভ্যর্থনা করলেন। হরিনাম সংকীর্ত্তন করতে-করতে গ্রাম্য মন্দিরে সমবেত হ'লেন। সরকারী লোকেদের সহিত পূর্ণ অসহযোগিতা করলেন। মাল ক্রোক পূর্ণ উদ্যমে চলতে লাগল—মাল বইবার লোক পাওয়া গেল না। গরুর গাড়ী বা অন্য যানবাহন পাওয়া গেল না। বহু কলাকৌশল প্রয়োগ ক'রে মহকুমার সদরে যে মাল এনে স্তূপীকৃত করা হ'ল তার একটিও মাল নীলামে বিক্রয় করা গেল না। ট্যাক্স আদায়ের জন্য ক্রোকী মাল নীলামের সর্বপ্রকার চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হ'ল। শাসকসম্প্রদায়ের রক্তচক্ষু জনসাধারণের উপহাসের বস্তু হ'য়ে উঠল। তাঁরা সর্বত্র নিরুপদ্রব প্রতিরোধের জয় ঘোষণা করলেন। নেতার প্রতি তাঁদের আনুগত্য, তাঁদের সর্ব্বশক্তি, দৃঢ় মনোবল, কর্মীদের কঠোর কর্ত্তব্যানুসরণ প্রবলশক্তির অধিকারী সরকারকে পরাজয় স্বীকারে বাধ্য করল। সমগ্র জেলাতে যে ২৩৭টি ইউনিয়ন বোর্ড প্রবর্তিত হ'য়েছিল তা সমস্তই বাতিল ঘোষিত হ'ল এবং সমুদয় ক্রোকীমাল ফেরৎ দেওয়া হ'ল।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁর 'Indian Struggle' পুস্তকে লিখেছিলেন :—"The news of the 'no-tax' campaign gained considerable strength and self-confidence to the people of Midnapore and popularity to their leader Mr. B. N. Sashmal"

প্রকৃতপক্ষে রাজশক্তির এই পরাভব ও জনশক্তির এই জয়ে মেদিনীপুরবাসীর লবণ সত্যাগ্রহ, চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ এবং শেষ 'ভারতছাড়' আন্দোলনের ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছিল। বীরেন্দ্রনাথ 'দেশপ্রাণ' আখ্যা লাভ ক'রেছিলেন এবং ক্রমে হ'য়ে উঠেছিলেন 'মেদিনীপুরের মুকুটহীন রাজা'।

কংগ্রেস থেকে স্থির করা হ'ল যে, যুবরাজ 'এডোয়ার্ড'-এর ভারত আগমন কর্মসূচী সম্পূর্ণভাবে বয়কট করতে হবে। এই বয়কট ব্যবস্থার ভার বঙ্গদেশে স্বভাবতঃ বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির উপর ন্যস্ত হ'ল। ঐ সমিতির সম্পাদক হিসাবে বীরেন্দ্রনাথ তাঁর কর্ত্তব্য পালনে রত হ'লেন। বঙ্গদেশে এজন্য যে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠনের ব্যবস্থা হ'ল এবং সভাপতিরূপে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও সম্পাদকরূপে বীরেন্দ্রনাথ স্বেচ্ছাসেবক দল গঠনের যে আহ্বান প্রচার করলেন আর প্রদেশ কংগ্রেসের প্রচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সুভাষচন্দ্রের দক্ষ পরিচালনায় 'বয়কটে'র যে অভূতপূর্ব সাফল্য ১৭ই নভেম্বর (১৯২১) দেশবাসীকে বিশেষতঃ শাসকমহলকে বিস্মিত ক'রে তুললো, তাতে শাসক ও শাসিতের শক্তিপরীক্ষায় পরাভূত সরকার পক্ষ দমন নীতির আশ্রয় গ্রহণ না ক'রে পারল না। দেশপ্রাণ শাসমল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ কলিকাতার নেতৃবৃন্দ সহ ১০ই ডিসেম্বর গ্রেপ্তার হলেন। প্রতি জেলাতে ধরপাকড়ের ধূম পড়ে গেল। বে-আইনী ঘোষিত স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর কর্মীরূপে শত-শত যুবক কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন।

পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়জীর মধ্যস্থতায় গান্ধীজী, চিত্তরঞ্জন প্রমুখ নেতার সঙ্গে বড়লাটের আপোষ-মীমাংসার চেষ্টা বিফল হ'ল। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দুইমাস হাজত বাসের পর ছয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হ'লেন।

কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পর দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ সমগ্র মেদিনীপুর জেলাতে রাজার সম্মানে অভ্যর্থিত হ'লেন। কাঁথির শোভাযাত্রা ও সভাতে প্রায় লক্ষ লোকের সমাগম ঘটেছিল।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন সভাপতিপদে বৃত হ'লেন। ইতিমধ্যে উত্তর প্রদেশের চৌরীচৌরাতে জনতার আগুনে যেভাবে থানা ভস্মীভূত হ'ল এবং একদল পুলিশ পুড়ে মরল, গান্ধীজীর বিচারে স্থির হয় যে, সেগুলি অহিংস অসহযোগ ও আইন অমান্যের পরিবেশকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে' দিয়েছে এবং সেইজন্যেই কিছুকালের জন্য আন্দোলন স্থগিত রাখা উচিত। সাময়িকভাবে এই কর্ম পন্থা প্রত্যাহৃত হ'ল। দেশবন্ধু গয়া কংগ্রেসের অধিবেশনের সভাপতি-রূপে দেশের সম্মুখে কাউন্সিল প্রবেশের কার্য্যধারা উপস্থিত করলেন। গান্ধীজী তখন কারাগারে। দেশে যে উৎসাহের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল এবং আইন অমান্যের পথে অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে যে দ্বিধার সৃষ্টি হ'য়েছিল, তার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে এবং আমলাতন্ত্রের সঙ্গে সংগ্রামের মনোভাব জাগিয়ে তোলার জন্যে দেশবন্ধু কাউন্সিলাদি প্রতিষ্ঠানে প্রবেশের কর্মধারা অবলম্বন করা উচিত বিবেচনা ক'রে-ছিলেন। কিন্তু গয়া কংগ্রেসে কাউন্সিল প্রবেশ প্রস্তাব পরাজিত হয়, এবং দেশবন্ধু কংগ্রেস-সভাপতি পদে ইস্তফা দিয়ে 'নিখিল ভারত স্বরাজ্যদল' গঠন করেন। বীরেন্দ্রনাথকে স্বরাজ্য দলের বঙ্গীয় শাখার সম্পাদকের পদ গ্রহণ করতে হয়।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে স্বরাজ্যদলের সদস্যরূপে বীরেন্দ্রনাথ যুগপৎ বঙ্গীয় আইন সভার কাঁথি ও ডায়মণ্ডহারবার নির্বাচন কেন্দ্র থেকে সদস্য নির্বাচিত হন। নিয়মানুযায়ী একটি আসন রক্ষার জন্য তিনি কাঁথির

নির্বাচকমণ্ডলী থেকে পদত্যাগ ক'রে ডায়মণ্ডহারবারের আসনই বজায় রাখেন এবং দেশবন্ধু বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কাঁথির আসনে সদস্য হন।

ইতোমধ্যে বীরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের কার্য্যে মনোযোগ দিয়েছিলেন। তিনি সরকার অনুগামী সদস্যদের তীব্র বাধা অতিক্রম করে' জেলাবোর্ডে নূতন প্রাণ সঞ্চারে সক্ষম হন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পথঘাট, পানীয় জল ইত্যাদি সকল বিভাগেই তাঁর কৃতিত্বের ছাপ সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে; জেলাবোর্ড যে একটা জীবন্ত জনহিতকর প্রতিষ্ঠান এবং উহা যে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বা বিভাগীয় কমিশনারের আজ্ঞাবহ না হ'য়ে নিজ গৌরবে স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকারী, তিনি নানা-ভাবে তা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। তিনি এরূপ তেজস্বিতার সহিত জেলার লক্ষ-লক্ষ অধিবাসীর নির্বাচিত প্রতিনিধিরূপে কাজ করতে থাকেন যে, বঙ্গদেশে তা অতুলনীয় হ'য়ে ওঠে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুরোধ সত্ত্বেও লাটসাহেবের অভ্যর্থনায় যোগদানে বিরতি এবং অন্যান্য নানা বিষয়ে তাঁর স্বাধীনচিত্ততা সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। তাঁর অনুপ্রেরণায় জেলার কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানগুলি এবং কংগ্রেস কর্মীগণ দৃঢ়তার সঙ্গে কংগ্রেসের কার্য্যধারা অনুসারে জেলাসংগঠনে কৃতসঙ্কল্প হ'য়েছিলেন।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র পদে বৃত হন। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথের ন্যায় একজন সুদক্ষ সংগঠককে কর্পোরেশনের প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ (Chief Executive Officer) রূপে গ্রহণ করা তাঁর মনোগত ইচ্ছা ছিল। সেই ইচ্ছা প্রকাশেও তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না। কিন্তু রাজনীতির কুটিল চক্রে জড়িত হ'য়ে শেষ পর্য্যন্ত তিনি তাঁর প্রিয় সহকর্মী বীরেন্দ্রনাথকে এই পদে গ্রহণ করতে পারেন নি। একদল বিপ্লবী কর্মী সুভাষচন্দ্রকেই অধিক গ্রহণ-যোগ্য বিবেচনা করে' নানা কৌশলে দেশবন্ধুর ইচ্ছাকে পরাজিত করেন। দেশপ্রাণ শাসমল দেশবন্ধুর এই অক্ষমতাকে তাঁকে যোগ্য সম্মান দানে অবহেলা ব'লে গণ্য ক'রে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। তিনি

স্বরাজ্যদলের সদস্যরূপে আইনসভা থেকে পদত্যাগ করা শ্রেয়ঃ বিবেচনা করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পর দেশপ্রাণ শাসমলই বঙ্গদেশে নেতৃত্ব করার উপযুক্ত ব্যক্তি এই বিশ্বাস অনেক সর্বভারতীয় নেতার মনে জাগ্রত ছিল। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, তুলসীচরণ গোস্বামী প্রমুখ ব্যক্তিগণ তাঁকে পুনরায় রাজনীতি ক্ষেত্রে সক্রিয় হ'য়ে বঙ্গদেশকে পরিচালনার কাজে যোগদানের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান। দেশপ্রাণ ছিলেন একজন ঋজু, স্বাধীনচেতা পুরুষ, তিনি জোড়াতালি দিয়ে কাজ করা পছন্দ করতেন না। তিনি ছিন্ন রজ্জুতে গ্রন্থিবন্ধনে অস্বীকৃত হ'লেন এবং বিষম অর্থকৃচ্ছ্রতার মধ্যেও অনমনীয় রইলেন। দেশবন্ধুর ঘনিষ্ঠ কর্মীদের মধ্যে তিনি আন্তরিকতার অভাব লক্ষ্য ক'রেছিলেন এবং শক্তিশালী একদল কর্মীর সক্রিয় বিরূপতা ও অপকৌশলের মধ্যে নিজ কর্মধারা অক্ষুণ্ণ রেখে অগ্রসর হ'তে পারবেন না বলে তাঁর ধারণা হ'য়েছিল। এইজন্য তিনি ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ফরিদপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতিপদ গ্রহণের জন্য দেশবন্ধুর অনুরোধ রাখায় অসম্মত হন।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে এক মহীরুহ পতনের ন্যায় দেশবন্ধুর জীবনাবসান ঘটল। সমগ্র দেশ শোকসাগরে নিমজ্জিত হ'ল। বীরেন্দ্রনাথ ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সভাপতির পদ গ্রহণে স্বীকৃত হলেন। পুনরায় দুই মতবাদের সংঘর্ষ ঘটল। বীরেন্দ্রনাথ বিপ্লবী দলের কর্মীদের কারো কারো মধ্যে যে দ্বিমুখী কার্য্যপদ্ধতি লক্ষ্য ক'রেছিলেন তা হ'তে বিরত হওয়ার জন্য তিনি অভিভাষণে অভিমত প্রকাশ করলেন। অহিংস গণসংগ্রাম হিংসার পথে বিশ্বাসযুক্ত কর্মপদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক থাকা উচিত এবং কংগ্রেসের কর্মপন্থার মধ্যে দুইপ্রকার বিশ্বাসপোষণকারী কোন কর্মীর থাকা উচিত নয়—এইমত তিনি দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেন। এই অভিমত নিন্দিত হওয়ায় দেশপ্রাণ সম্মেলনের সভাপতির পদ ত্যাগ করেন এবং অত্যন্ত বিশৃঙ্খলার মধ্যে সম্মেলন শেষ হয়।

এই সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণে বীরেন্দ্রনাথ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করেন—বৃটিশ সংস্রবহীন স্বাধীনতাই ভারতবাসীর লক্ষ্য হওয়া উচিত। কংগ্রেস তখনও সুস্পষ্টভাবে এই লক্ষ্যের কথা ঘোষণা করে নাই। ১৯২৯ সালের কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করা হ'য়েছিল কিন্তু বীরেন্দ্রনাথের কৃষ্ণনগর অভিভাষণে তা অতি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ লাভ ক'রেছিল। এ-বিষয়ে একমাত্র শ্রী অরবিন্দের সঙ্গে তাঁর তুলনা চলে। প্রকাশ্য রাজনীতির সহিত যুক্ত শ্রীঅরবিন্দ ব্যতীত কেবল বীরেন্দ্রনাথই দেশের একমাত্র রাজনীতিক নেতা হিসাবে ভারতবাসীর এই লক্ষ্য প্রকাশের কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন।

দেশপ্রাণের অন্তরের মণিকোঠায় পূর্ণ স্বাধীনতার যে অনুরণন সৃষ্টি হ'য়েছিল তা কৃষ্ণনগরের বিশৃঙ্খলার মধ্যে নিমজ্জিত হ'য়ে গেল। দেশবাসী তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে পারলেন না ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় হ'য়েছিল।

এই ঘটনার পর ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির পুনর্গঠনের সময় বীরেন্দ্রনাথ এই সমিতির সম্পাদক নির্বাচিত হ'য়েছিলেন, কিন্তু কলিকাতার প্রভাবশালী নেতাদের কৌশলে কৃষ্ণনগরের জেরস্বরূপ বীরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে একটি অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং তিনি কংগ্রেস হ'তে বহিষ্কৃত হন। যে মহাপ্রাণ নেতা ঝড়ঝঞ্ঝায় কংগ্রেসের সেবায় অটল ছিলেন, মন্ত্রীত্বের প্রলোভন যাঁকে কংগ্রেসের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি, যিনি দেশবন্ধুর পর বঙ্গদেশের নেতৃত্ব গ্রহণের যোগ্যতম ব্যক্তি ছিলেন এবং যিনি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বঙ্গের যোগ্য প্রতিনিধির আসন গ্রহণ করতে পারতেন তাঁর এই শোচনীয় পরিণাম সৃষ্টির ব্যাপারে দায়ী ব্যক্তিদের বিবেচনার প্রশংসা করা যায় না। বীরেন্দ্রনাথের সমকক্ষ গণনেতা বিরল। মেদিনীপুরবাসীর পূর্ণ সমর্থন লাভ ক'রে তিনি ইউনিয়ন বোর্ড বর্জন, আমলাতন্ত্রের কবল থেকে জেলা বোর্ড প্রভৃতি লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানের রক্ষা ও পুষ্টি-

সাধন, প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে দেশবাসীর প্রাণ রক্ষা, জাতীয় শিক্ষা, জাতীয় শিক্ষা প্রচারের সুযোগ গ্রহণ ক'রে নিষ্ঠাবান দেশবাসী গড়ে তোলা প্রভৃতি অসংখ্য কর্মের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর এই কর্মকৌশল বঙ্গের গণ্ডী অতিক্রম ক'রে সর্বভারতীয় রূপ গ্রহণ করতে পারলে পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনের এক অপূর্ব সংগঠনের সৃষ্টি হ'তে পারত। দুর্ভাগ্যক্রমে রাজনীতিক ক্ষেত্র থেকে তাঁর বহিষ্কার তাঁর দুর্বার কর্মপ্রবাহকে পঙ্গু ক'রে দিয়ে দেশের দ্রুত অগ্রগতিকে প্রভূত পরিমাণে ক্ষীণ ক'রে তুলেছিল।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার কার্য্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পার্শ্বে তাঁর সমকক্ষ সহযোগী আর কেউ ছিলেন না। 'বেঙ্গল প্যাক্ট'কে সফল করার জন্য তিনি অদম্যভাবে কার্য্য করেছিলেন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর দেহাবসানের পূর্বেও তিনি সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের প্রতিবাদ-কারী 'ন্যাশন্যালিস্ট' দলের প্রার্থীরূপে কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ের গৌরব অর্জন করেন। বঙ্গের রাজনীতি ক্ষেত্রে দেশপ্রাণের প্রবেশাধিকার রুদ্ধ হ'য়ে যাওয়া সত্ত্বেও মেদিনীপুরের জনসেবার ক্ষেত্রে অপরাজেয় ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে লবণ সত্যাগ্রহের সময় মেদিনীপুর জেলাতে যে অত্যাচারের স্রোত প্রবাহিত হ'য়েছিল, 'বেসরকারী তদন্ত সমিতি' ক'রে জগতবাসীর সমক্ষে বৃটিশের সেই অত্যাচারের নগ্নমূর্তি প্রকাশের ব্যবস্থার কৃতিত্ব তাঁরই। তিনি সর্বপ্রকার বিপদের আশঙ্কা অগ্রাহ্য ক'রে অগ্রসর হ'য়েছিলেন। গ্রেপ্তার ও ১৪৪ ধারার কবলে পতিত হয়েও তিনি নির্ভীকভাবে কর্মরত থেকে জেলাবাসীর মনে যে সাহসের সঞ্চার করেছিলেন তা অতুলনীয়।

মেদিনীপুর জেলার একটি বিরাট অংশকে জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যে প্রচেষ্টা হয়েছিল দেশপ্রাণের অক্লান্ত কর্মসাধনার ফলেই তাও প্রতিহত করা সম্ভব হয়েছিল।

মেদিনীপুরের বীর সন্তান বীরেন্দ্রনাথের প্রকৃত মূল্যায়ন হ'লে দেশ ও সমাজ উপকৃত হবে।

আত্মজীবনীর আলোকে বীরেন্দ্রনাথ

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী "স্রোতের তৃণ" তাঁর সমগ্র রাজনীতিক জীবনের ইতিহাস নয়। বরং বইটিকে তাঁর প্রথম কারা-জীবনের কাহিনী বলাই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। কিন্তু এই অসম্পূর্ণ কাহিনীকে আত্মজীবনীর মর্য্যাদা দেবার কয়েকটি সঙ্গত কারণ আছে। এই কারণগুলির মধ্যে যেটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য, তা হ'ল, তাঁর অন্তর্জীবনের অন্তরঙ্গ পরিচয়। এটা "স্রোতের তৃণ"-এ গভীরভাবে চিত্রিত। এখানে বাইরের বিচিত্র ঘটনাবলীর সীমারেখা পেরিয়ে বীরেন্দ্রনাথের কবি ও দার্শনিক মনের এক নির্জন সুর শোনা যায়। সে সুর হয়ত উচ্চকণ্ঠ নয়। এমন কি, অপরিচিত কাণে সে সুরের প্রতিধ্বনি নাও বাজতে পারে। কিন্তু যে-কাণ সুর চেনে, তার কাছে এই কবি ও দার্শনিক মনের পরিচয় অপ্রকাশিত থাকতে পারে না। বস্তুতঃ স্রোতের তৃণ" দেশপ্রাণকে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে আমরা মনে করি।

একটি উদাহরণ দিয়ে, বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করা যেতে পারে। বিশ্বসাহিত্যের পাঠকগণ জানেন, টলস্টয় প্রায় অখ্যাত হেনরি এমিয়েলের (Henri Amiel, ১৮২১-১৮৮১) জার্ণাল পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এমিয়েল ছিলেন সৌন্দর্যতত্ত্ব ও দর্শনের অধ্যাপক। দিনলিপির আকারে তাঁর এই জার্ণাল এক আশ্চর্যজনক সম্পদ। রবীন্দ্রনাথও এমিয়েল'স্ জার্ণালের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন।

আমরা জানি, টলস্টয়ের কাছে মহৎ সাহিত্যের একটা নির্দিষ্ট মানদণ্ড ছিল এবং তার প্রথম ও শেষ কথা—সৌন্দর্য এবং জীবনের কল্যাণবোধ। মানুষের অন্তর্জীবনই এই সৌন্দর্য ও কল্যাণবোধের

একমাত্র উৎসভূমি। হেনরী এমিয়েলের জার্ণালে টলস্টয় তাঁর অন্তর্জীবনের এই উৎসভূমি দেখে মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছিলেন। এই জার্ণালের ভূমিকা লিখতে গিয়ে টলস্টয় বলেছিলেন, এমিয়েলের অন্তর্জীবনের আলোড়িত যন্ত্রণাই এই লেখাকে মহৎ করে তুলেছে। টলস্টয় বিষয়টিকে স্পষ্টতর করার জন্য প্যাসক্যাল-এর (Pascal) একটি উক্তি তুলে দিয়েছিলেন। প্যাসকেল বলছেন, তিন ধরণের লোক সংসারে থাকেন, (১) যিনি ঈশ্বরকে জেনে, তাঁর চেতনায় পরিপূর্ণ হয়ে সেই অচেনার জন্য কাজ করে যান ; (২) যিনি ঈশ্বরকে জানেন না, তাঁর চেতনায় জীবন পরিপূর্ণও নয়—অথচ তাঁকে জানার জন্য আজীবন অন্বেষণের প্রদীপটি জ্বেলে রাখেন ; (৩) যাঁরা ঈশ্বরকে জানার, তাঁর চেতনায় অবগাহন করার প্রয়োজনও মনে করেন না।

প্রথম পর্যায়ের লোক সুখী, প্রজ্ঞাবান, জ্ঞানী। তৃতীয় শ্রেণীর লোক সুখী নয়, প্রজ্ঞাবান নয়, জ্ঞানীও নয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক অসুখী, কিন্তু প্রজ্ঞাবান ও জ্ঞানী। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক ছিলেন হেনরী এমিয়েল। তিনি তাঁর জীবনের যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের অন্বেষণ করে গেছেন। এই অন্বেষণ হয়ত তাঁর নিজের জন্য। কিন্তু এই অন্বেষণের আলোকেই অন্য মানুষ পথ খুঁজে পায়।

বীরেন্দ্রনাথ এই দ্বিতীয় পর্যায়ের মানুষ। তাঁর রাজনীতিক কর্মজীবনের কোলাহলের মধ্যে, এমন একটি নিভৃত এবং নির্জন মানসিক গৃহকোণ ছিল যেখানে তাঁর ঈশ্বরচেতনা ও অন্বেষণ প্রার্থনা হয়ে উঠেছে। "স্রোতের তৃণ"-এ বার-বার সেই বৈরাগ্যদীপ্ত মানুষটির সন্ধান আমরা পাই। বস্তুতঃ, এই চেতনা বীরেন্দ্রনাথকে এমন এক মহত্ত্বের পটভূমিকায় স্থাপন করেছে, যেখানে তাঁর উজ্জ্বল রাজনীতিক জীবনও ছায়াচ্ছন্ন ধূসর হয়ে ওঠে। এ জীবন মানুষের চিরকালের প্রার্থিত জীবনের অমূল্য উপাদান। "স্রোতের তৃণ" এই উপাদানের সঞ্চয় হয়ে আছে।

দুই

"স্রোতের তৃণ" বইটির উদ্যোগ পর্বে বীরেন্দ্রনাথ বার্ট্রাণ্ড রাসেলের একটি উক্তি দিয়েছেন। প্রায় প্রতি পর্বেই, তাঁর কোন-না-কোন মহাপুরুষের বাণীর উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায়, রাজনীতিক জীবনের বাইরেও তাঁর অন্য জীবন ছিল। তিনি পড়াশোনা করতেন, বিশেষতঃ দর্শনের যত কঠিন বিষয়। এখানে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের যে উদ্ধৃতি আমরা পাচ্ছি তাতে তিনি বলছেন: 'শ্রদ্ধা, পূজা, মানবসেবা প্রভৃতি যে বিষয়গুলিকে আমরা স্বর্গীয় প্রেরণা বলে মনে করে থাকি, সেগুলি আত্মার জীবনের উপাদান। এই বিষয়গুলির গভীরতম অন্তর-প্রদেশে এক ঘন রহস্য নিহিত এবং এই রহস্যের অন্তরালে বিশ্বের পরমতম সত্যের আভাস। এই আভাসই ধর্মের উৎস, ধর্মের অনুভূতি। এই অনুভূতির মৃত্যু ঘটলে, জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদই হারিয়ে যাবে।' (সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ—প্রবন্ধকার)

চিন্তাশীল পাঠক বুঝতে পারলেন, বীরেন্দ্রনাথ তাঁর কারাজীবনের কাহিনী বলতে গিয়ে, শুধু ঘটনাবলীর বর্ণনা করতে প্রস্তুত নন। তিনি সব কিছুকে এক গভীর ধর্মচেতনার আলোকে বিচার করে দেখছেন। তাঁর জীবনকাহিনীর মূল্য বিচারের বাটখারা হ'ল এই ধর্মচেতনা।

অতএব "স্রোতের তৃণ"কে (বীরেন্দ্রনাথ নিজেকেই স্রোতের তৃণের প্রতীক ধরেছেন) বিচার করবার মূল চাবিকাঠি আমরা খুঁজে পেলাম। এবার ঘর খুলে দেখার চেষ্টা করব, কি আছে এখানে। এ ঘর অবশ্যই তাঁর অন্তরের আবাসভূমি, কেবলমাত্র বাইরের রাজনীতিক জীবন নয়। এবং অন্তরের আবাসভূমিই জীবন বিচারের শ্রেষ্ঠ বিচারালয়।

বীরেন্দ্রনাথ আরম্ভ করেছেন: "সে বেশী দিনের কথা নয়—১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাস। তখন কলিকাতায় ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসমিতির অধিবেশন আরম্ভ হয়েছে। আমার উদ্যোগ পর্বের অবতারণা সূচিত হয়েছিল সেই সময়। তৎপূর্বে এদেশে ছুটির অবকাশেই রাজনীতিক

নেতা হওয়া যেতো, নিজের সুখশান্তিকে ষোল আনা বজায় রেখে, এমনকি, নিজের ঐশ্বর্য ও সুনাম বৃদ্ধির জন্যও, দেশভক্ত সাজা অসম্ভব ছিল না।"

এই হ'ল বীরেন্দ্রনাথের দেশের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার উদ্যোগ পর্ব। এ যেন সন্ন্যাস-জীবন গ্রহণ করার পূর্ব প্রস্তুতি। সব কিছু ছেড়ে, সব কিছু পাওয়ার প্রার্থনা আরম্ভ হয়ে গেছে। ব্যারিষ্টারি ছাড়ছেন, এবার এতো বড়ো বাড়ী, আরামের জীবন, গাড়িঘোড়াও ছাড়তে হবে। যাতায়াতের জন্য থাকবে ট্র্যাম। এ তো সেই রাজপুত্রের সন্ন্যাস নেবার আরেক নীরব কাহিনী। এই সময় অবশ্যই তিনি এক গভীর মানসিক সংকট এবং অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়েছিলেন। সকলেই হন। এই সংকট মুহূর্তে তিনি তাঁর অন্তর্দেবতার কাছেই হাত পেতে দাঁড়ালেন। বিনীত প্রশ্ন রাখলেন—বল, কোন্ দিকে যাব। তাঁর অন্তর্দেবতা তখন বলছেন: "তুমি কে? তোমার করবার বা না করবার, পারবার বা না পারবার আছে কি! দেখছ না, তুমি যে 'স্রোতের তৃণ'। তোমাকে চিরদিনই স্রোতের সঙ্গে ভেসে চলতে হয়েছে, ভেসে চলতে হবে। ······তুমি এক বিরাট বিশ্বব্যাপী স্রোতরাশির মধ্যে ক্ষুদ্র নগণ্য তৃণখণ্ড মাত্র।······স্রোতই তোমাকে সৃষ্টি করেছে, স্রোতেই তোমার লয় হবে। ······এই শিব সুন্দর অনন্ত স্রোতরাশির মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে অবগাহন কর—তোমার প্রত্যেক অণুপরমাণুর ভিতর এই স্রোতরাশির অপূর্ব মহিমা ফুটে উঠুক। তখন কর্ম ও ধর্মের মাদকতায় প্রেম ও ত্যাগের অমৃত পানে তুমি উন্মত্ত হয়ে উঠবে।"

আমরা বীরেন্দ্রনাথের অন্তর্জীবনের সেই দ্বারমুক্ত ঘরের সামনে এসে এবার দাঁড়ালাম। কি দেখলাম? দেখলাম—এই কথাগুলি জীবন-দর্শনের অবয়ব পেয়েছে। কি সেই জীবন-দর্শন? তার নাম কি? তার নাম, যোগের ভাষায়—সমর্পণ যোগ। অর্থাৎ, বিশ্বচেতনার বেদীতলে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ কর, কারণ এই বিরাট সৃষ্টির

মহান কর্মশালায় ব্যক্তি-মানুষের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবন এতো অনুল্লেখ্য যে, তা নিয়ে সামান্যতম গর্বের কিছু নেই। সে শুধু বিরাট বিশ্বস্রোতে ভেসে যাওয়া একটা তৃণখণ্ড মাত্র এবং এই স্রোতের তৃণকে "সুনাম-দুনাম ও সুখ্যাতি-অখ্যাতির অতীত হতে হবে।"

আগে পেয়েছি, বীরেন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের মধ্যে সমর্পণ যোগের পরিচয়। এবার আমরা পেলাম, তাঁর লক্ষ্য-স্থলের একটা ঠিকানা। সে-ঠিকানা হ'ল জীবনের তারগুলিকে এমন পর্দায় বাঁধতে হবে যেখানে সুনাম-দুর্নাম, সুখ্যাতি-অখ্যাতি কোন শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি না করে। সমর্পণ যোগের পরে আর একটি উন্নত স্তর এই দর্শন, এই মানসিক প্রার্থনা। প্রথমে কাজ আরম্ভ—সব কিছু কর্মভার নামিয়ে রাখো বিশ্বদেবতার পদপ্রান্তে। কারণ তোমাকে অখ্যাতি-সুখ্যাতির উর্দ্ধে উঠতে হবে, শুধু সত্য থাকতে হবে অন্তর্দেবতার কাছে।

এই অন্তর্দেবতার নির্দেশে যাঁরা চলেন, তাঁদের জীবন কখনও সহজবোধ্য হয় না। আমাদের পরিচিত যুক্তির আলোয়, আমাদের পরিচিত জ্ঞানের আলোয় তাদের সকল কষ্টের বিচার, সকল কষ্টের হিসেব ঠিকভাবে মেলে না। দেশপ্রাণেরও তা মেলেনি। গান্ধীজীর বহু কাজের হিসেবও আমাদের কাছে অমিল ঠেকে। তার কারণ আমাদেরই অক্ষমতা। আমাদের মনের তারযন্ত্রটি ঠিক সুরে যে বাঁধা নেই। কিন্তু এই নিজের বিচার নিজে না করে', আমরা অপরের ওপর দোষ চাপাই। বৃহৎ কিছুকে চেনার ক্ষেত্রে, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এই আমাদের প্রথম ব্যর্থতা।

তিন

কারাগারে যাওয়ার প্রস্তুতি পর্ব, কারাবাস এবং কারামুক্তি—এই তিনটি পর্যায়ের মধ্যেই দেশপ্রাণের "স্রোতের তৃণ"—আত্মজীবনীর পরিধি শেষ হয়েছে। মুক্তির দিন বীরেন্দ্রনাথ খুবই অসুস্থ। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন গায়ে থার্মোমিটার দিয়ে দেখলেন ১০৪ ডিগ্রী জ্বর। রাত্রি

আটটার একটু পরে সেলের দরজা খোলা হ'ল। মেজর সলসবেরী (জেলার) সাহেব এসে বললেন "আপনি মুক্ত"। আপনি বাড়ী যেতে পারেন। দেশপ্রাণ জিজ্ঞেস করলেন, "দেশবন্ধু মুক্ত কিনা?" মেজর বললেন—"হ্যাঁ, তিনিও মুক্ত।"

মেজর তাঁর বাঁ হাত ধরে এবং দেশবন্ধুর ডান হাত ধরে বীরেন্দ্রনাথকে সেলের বাইরে নিয়ে এলেন। মেজর বললেন—"গুড্ নাইট। আশা করি, আপনাদের সঙ্গে জেলের বাইরে দেখা হবে মাঝে-মাঝে।"

বাইরে এসে চিত্তরঞ্জন এবং বীরেন্দ্রনাথ দেখলেন, চিররঞ্জন একটি গাড়ি নিয়ে উপস্থিত। "স্রোতের তৃণ" এই মুহূর্তে কূলে এসে ঠেকল বটে—কিন্তু তিনি মনে মনে জানেন, কূলের এই স্থায়ী বালি-মাটি তাঁর জন্য নয়। এই নগণ্য তৃণখণ্ডকে একটা মহাসমুদ্রের মহাস্রোতে ভাসতে হবে। সেই মহাস্রোত-যাত্রার একটা প্রাথমিক "মাইলষ্টোন" তিনি পেরিয়ে এলেন মাত্র।

বীরেন্দ্রনাথের জীবন মহাস্রোতে ভাসমান জীবন। সে-জীবন দীর্ঘ নয়, কিন্তু বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং ব্যর্থতা তার আপাতঃ সঙ্গী। কারণ তিনি জীবনকে একটা বৃহতের পটভূমিকায় দেখেছিলেন। তাঁর কাছে রাজনীতিক স্বাধীনতা শেষ কথা নয়। তিনি বলছেন, "এতোদিনে আমি বুঝতে পেরেছিলাম, স্বরাজ সত্যই আত্মার বস্তু। এবং সেই প্রকৃত স্বরাজলাভ হবার যাঁর সম্ভাবনা হয়েছে, তাঁর কাছে রাজনীতি কখনই সর্বোচ্চ আদর্শ হতে পারে না।"

বীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে অন্যান্য অনেক রাজনীতিকের এইখানে মৌল পার্থক্য। তাঁর কাম্য বস্তু প্রেয়ঃ নয়—শ্রেয়ঃ। স্বরাজকে তিনি আত্মার বস্তু মনে করেন। গান্ধীজীকে বিচারের ক্ষেত্রেও তিনি স্বতন্ত্র মানদণ্ডের পক্ষপাতী। তাঁর মতে "মহাত্মার জীবনেরও দুটি দিক দেখতে পাওয়া যায়—একটি তাঁর জীবনের ভারতীয় এবং অন্যটি তাঁর বিশ্বজনীন দিক।"

আমার আলোচিত বিষয় ছিল আত্মজীবনীর আলোকে বীরেন্দ্রনাথ। আমরা তার কিছু আভাস দিলাম। এখন মনে হয়—এই বিষয়টি গভীর গবেষণার বিষয়। এখানে শুধু রাজনীতির ঘটনা ও তার কোলাহলের মধ্যে বীরেন্দ্রনাথকে যথার্থভাবে চেনা যাচ্ছে না। মনে হয়, চেনা উচিতও নয়। রাট্রাণ্ড রাসেলের ভাষায় আলটিমেট ট্রুথ—পরমতম সত্যকে সামনে রেখে বীরেন্দ্রনাথের জীবনকে বিশ্লেষণ করা দরকার।

সেই পরম সত্যটি কি? সেই পরম সত্যটি হয়ত কোন এক অন্বেষণ—পরম কিছুকে খুঁজে বেড়ানো। এই খোঁজার যন্ত্রণা—"Inner labour of the Soul"—অর্থাৎ অন্তর্জীবনের যন্ত্রণার হোমাগ্নি-আলোকেই তাঁর বিচার, তাঁর কর্মজীবনের বিশ্লেষণ হওয়া উচিত। "স্রোতের তৃণ" মূলতঃ বীরেন্দ্রনাথের এই পরম সত্য অন্বেষণের কাহিনী—নিজের আত্মার সঙ্গে এক নিভৃত সংলাপ। এই সংলাপের ঠিক সুরটিকে চিনে নেওয়াই তাঁকে জানার প্রথম কথা। "স্রোতের তৃণ"-এর মধ্যে এমন সংলাপ আশ্চর্যজনকভাবে উচ্চারিত হয়েছে।*

---

* প্রবন্ধে বীরেন্দ্রনাথের উক্তি "দেশপ্রাণ স্মৃতিরক্ষা সমিতি" কর্তৃক প্রকাশিত "স্রোতের তৃণ" বইটি থেকে গৃহীত। প্রকাশক: শ্রীবনবিহারী দাশ। টলস্টয়ের উক্তিগুলি তাঁর "What is Art" বইটি থেকে দেওয়া হয়েছে।

দেশপ্রাণের জীবনাদর্শ

সুরেন্দ্রনাথ ঘোড়াই, বার-য়্যাট-ল

সাংসারিক মানুষের অনিত্যতা সম্বন্ধে দেশপ্রাণের যে গভীর আধ্যাত্মিক ধারণা ছিল, তাতে দেখা যায় যে, তিনি ঈশ্বরের হাতে ক্রীড়নক হিসাবে মানুষের জীবনকে উৎসর্গ করবার পক্ষে ছিলেন। এ-বিষয়ে তিনি গীতায় উল্লিখিত নিষ্কাম কর্মের আদর্শ অনুসরণ করতেন। সেই নিষ্কাম কর্মের যিনি পথিক তাঁর জীবনের কর্মের ফলাফলের বিচার করবার অধিকার আমার নেই। যে কর্ত্তব্য কর্ম সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে সেই কর্ত্তব্য কর্মকে কোন লাভের আশা না রেখে নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পাদন করাই নিষ্কাম কর্মের আদর্শ। এই নিষ্কাম কর্মের আদর্শকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেশপ্রাণ লিখেছেন—

"তুমি কে? তোমার করবার বা না করবার—পারবার বা না পারবার—আছে কি? দেখছ না তুমি যে স্রোতের তৃণ। তোমার না বলবার উপায় নেই—ভালমন্দ বিবেচনা করবার ক্ষমতা নেই। তোমাকে চিরদিনই স্রোতের সঙ্গে ভেসে চলতে হয়েছে ও ভেসে চলতে হবে। তুমি কখন হেলবে—কখন দুলবে, কখন ডুববে—কখন ভাসবে। তুমি আজ কোন নদীতীরবর্ত্তী দেবালয়ে দেবতার পদতলে শোভাবর্দ্ধন করতে পার, কিন্তু কাল তোমাকে হয়তঃ আবার সমুদ্র-তীরবর্ত্তী শ্মশানে কোনও মৃতের পদতলে লুটিয়ে প'ড়তে হবে। তোমার চন্দন-বিষ্ঠা-স্বর্গমর্ত্ত্য-শুভ-অশুভ কোন কিছুর বিচার ক'রবার অধিকার নেই। তোমার ঊর্দ্ধে স্রোত—নিম্নে স্রোত, তোমার বামে স্রোত—দক্ষিণে স্রোত। তুমি এক বিরাট বিশ্বব্যাপী স্রোতরাশির মধ্যে ক্ষুদ্র নিতান্ত নগণ্য তৃণখণ্ড মাত্র। তুমি সে স্রোতরাশির গতিরোধ করতে পারবে কেন? এ জগতে কেহ কখন পারেনি—কেহ

কখনও পারবে না। সাংসারিক বুদ্ধি ও বৈষয়িক বিজ্ঞতার কথা গভীরভাবে চিন্তা করবার কোন আবশ্যকতা নেই, কারণ তারাও এই স্রোতরাশির অন্তর্গত সামগ্রী। বস্তুতঃ স্রোতের টানে যেমন তোমার প্রাণ, স্রোতের গতিতে যেমন তোমার শক্তি, সেইরূপ স্রোতের বর্ত্তমানতায় জগৎ বর্ত্তমান, স্রোতের অভাবে জগতের অভাব। দিব্য চক্ষে চেয়ে দেখ, দেখতে পাবে, স্রোতেই তোমার সৃষ্টি হয়েছে ও স্রোতেই তোমার লয় হবে। স্রোতই তোমার স্বর্গের দেবতা এবং স্রোতই তোমার মর্ত্তের সংসার। এই শিব সুন্দর অনন্ত স্রোতরাশির মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হ'য়ে অবগাহন কর—তোমার প্রত্যেক অণু-পরমাণুর ভিতর এই স্রোতরাশির অপূর্ব্ব মহিমা ফুটে উঠুক। তখন কর্ম্ম ও ধর্ম্মের মাদকতায় প্রেম ও ত্যাগের অমৃত পানে তুমি উন্মত্ত হয়ে উঠবে।"—(দেশপ্রাণ রচিত 'স্রোতের তৃণ' ২য় সং ৩-৪ পৃঃ)

ভারতবর্ষের সামাজিক অবনতি এবং সেই সঙ্গে স্বাধীনতা বিলুপ্তির প্রধান কারণ হচ্ছে আমাদের জাতীয় জীবনে সামগ্রিকভাবে শিক্ষার অভাব এবং অনগ্রসরতা। যে দেশে সাধারণ মানুষ শিক্ষার আলোকে সমাজ জীবনে সম্মানজনক স্থানে অধিষ্ঠিত থাকে সে দেশের স্বাধীনতা লোপ পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম থাকে। কিন্তু ভারতে এই শিক্ষার সুযোগ বহু যুগ থেকে আপামর জনসাধারণকে দেওয়া হয়নি। সেজন্য দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ প্রথমেই বুঝেছিলেন, জাতিকে যদি যথার্থ স্বাধীনতার অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তবে চাই শিক্ষার আলোকে তাদের নব জীবনের উদ্বোধন এবং সে-শিক্ষা হওয়া চাই প্রকৃত শিক্ষা। সেই প্রকৃত শিক্ষা দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে, কিভাবে তা হবে তারই আলোচনা করতে গিয়ে দেশপ্রাণ লিখেছেন—"আমি সর্ব্ব প্রথমে জাতীয় বিদ্যালয়গুলির দিকেই বিশেষভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলাম; কেননা আমি বিশ্বাস করি যে, বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির দোষে, আমাদের দেশের তথাকথিত শিক্ষিতব্যক্তিদের ধর্ম্মনীতি, চরিত্র, স্বার্থত্যাগ ও দেশভক্তিতে তাঁদের

যে প্রকার উন্নতি লাভ করা উচিত ছিল, সেরূপ উন্নতি লাভ করতে পারছে না, আমাদিগের দেশের তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যেমন একদিকে আপনাদিগের জাতীয় বা নিজস্ব মঙ্গলজনক যা কিছু তার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা হারিয়েছেন তেমনি অন্যদিকে বিজাতীয় বা পরস্ব মঙ্গলজনক বস্তুসমূহকে সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি। আমাদিগের শিক্ষা আমাদিগের কথঞ্চিৎ পরিমাণে জ্ঞান বৃদ্ধি করেছে বটে, কিন্তু সে জ্ঞানকে বাস্তব জীবনে কার্য্যে পরিণত করবার ক্ষমতা বা আন্তরিকতা আমরা আমাদের শিক্ষার ভিতর পাই নাই। বস্তুতঃ আমাদের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের জ্ঞানবৃদ্ধিও হয় নাই, কেবল অশিক্ষিতের তুলনায় কতকগুলি ঘটনা সম্বন্ধে তাঁদের বিদ্যাবৃদ্ধি হয়েছে মাত্র, কারণ জ্ঞান বৃদ্ধি হ'য়ে থাকলে বিদ্যাকে কার্য্যে পরিণত ক'রবার ক্ষমতাও তাঁদের বৃদ্ধি হতো। তবে একথা অবশ্যই স্বীকার ক'রবো যে, বর্তমান অবস্থায় প্রকৃত জাতীয় শিক্ষা প্রদান ক'রবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আমাদিগের হাতে নেই। কিন্তু ক্ষমতা লাভ করতে হ'লে কেবল বক্তৃতা দ্বারা তা লাভ হ'তে পারে না ব'লেই, সংস্থাপিত জাতীয় বিদ্যালয়গুলির সংরক্ষণের দিকে সর্ব্বাগ্রে বিশেষভাবে মনোনিবেশ ক'রতে হ'য়েছিল।"
—(স্রোতের তৃণ, ২য় সং, ২১-২২ পৃঃ)

মানুষের জীবনে যখন কঠিন কর্ত্তব্যের আহ্বান আসে সে কর্ত্তব্য সম্পাদনে তাকে ক্ষুদ্র সুখ ও নিরাপত্তার বিবেচনা পরিত্যাগ করতে হয়। কর্ত্তব্য বড়, না, ব্যক্তিগত সুখ ও নিরাপত্তা বড়—এ প্রশ্ন নিয়ে মানুষের প্রায়ই মানসিক আলোড়নের সৃষ্টি হয়। যিনি এই ব্যক্তিগত সুখ ও নিরাপত্তার প্রশ্নকে বিসর্জ্জন দিয়ে মহান কর্ত্তব্যের ডাকে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারেন তিনি জীবনে যথার্থতঃ জয়ী। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার হওয়ার মুখে মানসিক দ্বন্দ্বের কথা বলতে গিয়ে লিখেছিলেন—"আজ মনে হতে লাগলো, আমার বহু যত্নের ভিক্ষার ঝুলি বুঝি বা শেষে এ কাঙালীর কাঁধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পথিমধ্যে কোথাও পড়ে যায়। রক্ত ও মাংস! তোমাদিগকে

সহস্রবার ভক্তিভরে নমস্কার করি। তোমরা না ক'রতে পার, এ পৃথিবীতে এমন কাজ নেই। তোমরা গৃহীকে সন্ন্যাসী করেছ, এবং সন্ন্যাসীকেও গৃহী সাজিয়েছ। তোমরা সৃষ্টি রক্ষার যেমন সহায় হয়েছ, তেমনি সৃষ্টি বিনাশেরও তোমরা সাহায্য কম কর নি। মাতৃ-স্নেহের উৎস খুলে দিয়ে, বিশ্বজগতকে তোমরাই চিরদিন নব-বৃন্দাবন সাজিয়ে রেখেছ, তোমরাই আবার রাজ্যলোভী কত পুত্র নরাধমকে তাদের জন্মদাতা পিতার হন্তারক সাজাতে কুণ্ঠিত হও নি। তোমরা পতি-পত্নীর প্রেম সৃষ্টি করেছ, ভায়ে-ভায়ে স্নেহ-ভালবাসায় বেঁধেছ। তোমরা দিবারাত্রি যেমন গ'ড়ছ, তেমনি প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতিপলে তোমাদের ভাঙ্গবার শক্তিও সমানে সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে আজ পর্য্যন্ত কার্য্যকরী র'য়েছে। তোমরা সেদিন সত্যই আমাকে ভাবিত করে তুলেছিলে, কিন্তু তোমাদিগকে আমার অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, শেষ পর্য্যন্ত তোমরা তোমাদের এই শরীর-লীলাভূমিতে গড়ছো বৈ কিছু ভাঙ্গো নি।

"সেদিন কতটা হৃদয়হীন কতটা পাষাণ হ'তে পেরেছিলাম, এখন সে-কথা ভাবলে অবাক্ হ'তে হয়। কারাগারের এই বিজন কুটীরে ব'সে যতদিন যতবার সে ঘটনা স্মরণ করেছি, ততদিন ততবার দু-চোখ ব'য়ে অকাতরে নয়নের জল ঝরে প'ড়েছে—শত চেষ্টাতেও তার গতিরোধ ক'রতে পারিনি। বস্তুতঃ এ পৃথিবীতে যতদিন এই নশ্বর দেহ নিয়ে আমি বেঁচে থাকবো ততদিন সে ঘটনা আমার রক্তের শিরায় শিরায় ও মাংসের পেশীতে পেশীতে সোনার অক্ষরে ছাপা থাকবে।

"কিন্তু বলছিলাম কি যে—ভগবানের অপার করুণায় আমি শেষে এ পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হয়েছিলাম। এমন কি, গভীর অন্ধকারের উজ্জ্বল ছায়ায় গাঢ় নিদ্রার করুণ স্পন্দন যখন ধীরে ধীরে প্রকৃতি দেবীকে আলিঙ্গনে সমাহিত ক'রছিল, তখন দেখেছি—আমার ভিতরের চিরজাগ্রত পুরুষ দেবতাটি, কঠিন প্রাণের কঠিন প্রতিজ্ঞায়, কঠিনতর

হ'তে কঠিনতম হ'চ্ছেন। অর্দ্ধ-জাগরণে ও অর্দ্ধনিদ্রায় ৯ই ডিসেম্বরের সুদীর্ঘ রাত্রি কিন্তু ক্রমে শেষ হয়ে গিয়েছিল। ব'লতে দুঃখ হয়—স্বরাজ্যের মোহন বেণুরব আমার শ্যামের কুঞ্জে সে-রাত্রে কেউ শুনে নি। ১০ই ডিসেম্বর প্রাতে গাত্রোত্থান ক'রেই কুইনাইন 'ইনজেকস্থান' নেবার বন্দোবস্ত করেছিলাম, কেননা মানসিক যন্ত্রণার সম্ভাবনার সঙ্গে শারীরিক যন্ত্রণার সংমিশ্রণ হ'তে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয় ব'লে উপলব্ধি হ'য়েছিল।"—স্রোতের তৃণ, ২য় সং, ৪৯-৫০ পৃঃ

কর্ত্তব্যের সম্পাদনায় মানুষ যখন নিজের সুখদুঃখের ঊর্দ্ধে উঠতে পারে তখন সে এক দিব্য জীবন লাভ করে, তখন মানুষের ক্ষুদ্রত্ব বিলীন হয়ে গিয়ে এক বিশ্বজীবনের মধ্যে তার দিব্যজীবন প্রকাশ পায়। তখন আমরা সাধারণ দৃষ্টিতে যাকে দুঃখকষ্ট যন্ত্রণা বলি, অনেক সময় মহান কর্ত্তব্যের জ্যোতিতে তা আনন্দের রূপ নিয়ে আমাদের জীবনে দেখা দেয়, সেই মহৎ জীবনের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ লিখে গেছেন—"যাকে আমরা কারাগার বলি তা আসলে আমাদের মনের ভুল, অজ্ঞতা। আসলে মহৎ কর্ত্তব্য সম্পাদনের পথে কারাগার এক মহান তীর্থস্থান।" সেই তীর্থক্ষেত্র সম্বন্ধে আবার তিনি লিখেছেন—"তথাপি কেউ কেউ হয়তো মনে করবেন—অদৃষ্টের এ কি বিড়ম্বনা যে, মৃন্ময় মাটীকে চিন্ময় মা-টি রূপে সাধনা ক'রতে গিয়ে যাঁরা এখানে এসেছিলেন, তাঁদের জন্য ই সেই মায়ের বুকের কলিজা কেটে ইট তোয়েরী ক'রে এই কারাগার বিনির্ম্মিত হয়েছিল। মায়ের দু' একজন অবিশ্বাসী ও অধীর সন্তানকে এজন্য এই সময় মাঝে মাঝে দুঃখ প্রকাশ ক'রতে শুনেছিলাম; কিন্তু ব'লতে আনন্দে হৃদয় নেচে উঠে—মায়ের অধিকাংশ সুসন্তান এই সময় বলাবলি ক'রতেন যে, বিশ্বাসই কর্ম্মের মূল ও ধৈর্য্যই কর্ম্মের পরম সাধনা। তাঁদের মুখে এ কথাও এই সময় শুনেছিলাম যে, যারা চোখ থাকৃতে অন্ধ এবং কাণ থাকতে বধির তারাই কেবল এ জায়গাটাকে কারাগার ব'লতো; কারণ তারা জানতো না যে, প্রাণময়

জগতের এই জীবন্ত ইটগুলির ভিতর ব'সে তাদের আরাধ্য দেবতা তাঁর ভাঙ্গা প্রাণের রক্তমাখা ফাটা বুকে তা'দিগকেই জেঁকে রেখেছিলেন। সৃষ্টির প্রত্যূষ থেকে বাইরের দিকে নজর দিয়ে ভিতরের এই ঘুমন্ত শক্তিটীর উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করেনি ব'লে, কোটী কোটী নরনারী আজ সত্যই তাদের অস্ফুটন্ত আত্মকোরকে যে সচ্চিদানন্দ মহাপ্রকৃতি চির-বিরাজিত র'য়েছেন, তাঁর সন্ধান খুঁজে পাচ্ছে না এবং তাদের সকল জেল ও কারাগারের কারণ হ'য়েছে এই অজ্ঞতা।"—স্রোতের তৃণ, ২য় সং, ১১৮ পৃঃ

সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নিজের সামাজিক জীবনকে সেই সভ্যতার বিকশিত রূপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গড়ে তুলতে চায়, কিন্তু মানুষের জীবনে সত্য প্রতিষ্ঠার প্রতি আকর্ষণ জন্মগত এবং সত্য প্রতিষ্ঠার আহ্বানে মানুষ ধীরে ধীরে বন্য জীবন থেকে সুসভ্য জীবনে উত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু এই সুসভ্য জীবনে উত্তীর্ণ হয়ে সভ্যতার যে সকল আয়তন মানুষ সৃষ্টি করেছে, সেইগুলি রক্ষা করতে গিয়ে অনেক সময় তাকে সত্যের প্রতি আনুগত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়, তখন সত্য ও অসত্যের দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়। কিন্তু এই দ্বন্দ্বেও মানুষ সত্যকে পরিহার করবার যতই চেষ্টা করুক না কেন অবশেষে কিন্তু মানুষের জীবনে সত্যেরই জয় হয়। এ সম্বন্ধে দেশপ্রাণ লিখেছেন,—"শ্রীভগবান্ মানুষ সৃষ্টি ক'রেছিলেন এইজন্য যে, তারা সত্যের অনন্ত অনুসন্ধানে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই ক'রতে ক'রতে যখন দেবত্বপ্রাপ্ত হবে, তখন আর তা'দিগকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে বাধ্য ক'রবেন না। প্রকৃতি দু'প্রকার—মানুষের নিজের আভ্যন্তরিক প্রকৃতি এবং এই জন্মমৃত্যুর অধীন শীত-গ্রীষ্মে ভরা বাহ্য প্রকৃতি। মানুষ যখন বনেজঙ্গলে থাকৃতো, সত্যের অনুসন্ধানে যখন তার হৃদয়মন সম্পূর্ণরূপে আকৃষ্ট হয়নি, তখন তাকে কেবল এই দুই প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই ক'রতে হ'তো—তার আর অন্য কোনও তৃতীয় শত্রু ছিল না। ক্রমে মানুষ যখন সনাতন সত্যের আবিষ্কারের জন্য ব্যাকুল হ'য়ে উঠলো, তখন সে

সমাজ ও সামাজিকতা সৃষ্টির জন্য কি জানি কেন বদ্ধপরিকর হ'য়েছিল। ফলে, তার নিজের হাতে গড়া সেই সমাজ ও সামাজিকতা রক্ষার জন্য তাকে ক্রমে আইন ও আইনবেত্তা, রাজা ও রাজনীতি, গভর্ণমেণ্ট ও গভর্ণমেণ্টের পরিচালক সৃজন ক'রতে হয়েছে; এবং তার পরিণতি আজ এই দেখ্‌তে পাচ্ছি—অধিকাংশ মানুষ তাদের হৃদিস্থিত দেবতাগণকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে খেলা ক'রতে চা'চ্ছে, তাদেরই সঙ্গে লড়াই ক'রতে এখন তারা মহাবিব্রত। নারায়ণ আশীর্ব্বাদ করুন, আমার এই লড়াই যেন আমার জীবনের চরম গম্য স্থানে পর্য্যবসিত না হয়—যেন আমারি স্মরণ থাকে যে, এই জিনিষটি আমার কেবল একটী উপায় বা পন্থা মাত্র। তা'হলে দিগন্তবিস্তৃত বিরাট আকাশ ও সীমাহীন অন্তহীন বিশাল মহাসমুদ্র দেখে, আমার মত নগণ্য ও অপদার্থ ব্যক্তিরও যে মাঝে মাঝে অনন্তের কথা মনে পড়ে, সেই স্বর্গীয় অপার্থিব অনুভূতি আমাকে ঘৃণা ক'রে আমার জীবনযাত্রার পথের পাশে আমাকে কোন দিন ফেলে দিয়ে পালাবে না। তা' হ'লে জীবনের সকল কর্ম্মের অবসানে একলাটি গিয়ে যখন তাঁর চরণপ্রান্তে লুটিয়ে প'ড়তে ইচ্ছা হ'বে, তখন যেন কেউ আমাকে মনে করিয়ে দিতে পারে না যে, আমি হতভাগা, আমার মলিন কন্থায় তাঁর চরণ দু'খানির অস্পষ্ট চিহ্নমাত্র কেবল একবারের জন্য দেখেছিলাম। কিন্তু তিনি যে সত্যসত্যই একদিন আমার পর্ণকুটিরে এসে আমার জরাজীর্ণ আসবাবগুলির অপবিত্রতাকে তাঁর পবিত্রতার পুণ্য সৌরভে আকুল ক'রে আমার শিয়রে ব'সে গিয়েছিলেন—সেকথা আমি একেবারেই জানি নে।"
—স্রোতের তৃণ, ২য় সং, ১২১-১২২ পৃঃ

আমাদের একটা প্রথা ও সংস্কারগত দুর্ব্বলতা আছে, তা হ'ল হাতের কাজমাত্রকেই আমরা সবসময় আনন্দ বা গৌরবের জিনিষ বলে মনে করতে পারি না। আমাদের এই ধারণা অজ্ঞতাপ্রসূত এবং উহা আমাদের সামাজিক উন্নতির পথে বিরাট বাধাস্বরূপ। হাতের কাজকে আমাদের সমাজপতিরা ছোটজাতের চিহ্ন বলে চিহ্নিত করে

দিয়েছেন—এই নিতান্ত ভ্রান্তধারণার বিরুদ্ধে দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ গর্জ্জে উঠেছিলেন। প্রবাসে থাকাকালীন একটি ঘটনা তাঁকে বিচলিত করেছিল। তা তিনি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করে বলেছেন—"তবে সত্য কথা ব'লতে হ'লে আমাকে একথা স্বীকার ক'রতে হ'বে যে, আমেরিকার যুক্তরাজ্যের কাছে আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবো।

"সে আজ প্রায় আঠারো বৎসর পূর্ব্বের কথা, বিলেতে ব্যারিষ্টারি প'ড়তে প'ড়তে মাস কয়েকের জন্য একবার যুক্তরাজ্যে বেড়াতে গিয়েছিলাম। নিউইয়র্ক সহরে তখন 'আউটলুক' নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বেরুত। আমি যে সময়ের কথা বলছি, সে সময় মিঃ হ্যামিল্টন্ ডব্লিউ, মেবী তার সম্পাদক ছিলেন; কিন্তু শুনেছি তাঁর অব্যহিত পূর্ব্বে যুক্তরাজ্যের তৎকালীন সভাপতি মিঃ থিয়োডোর্ রুজভেল্ট্ সে কাজ করতেন। মিঃ মেবীর সঙ্গে নিউইয়র্কের 'অথার্স ক্লাব' বা লেখক সমিতিতে আমার পরিচয় হয়েছিল। তখন সেখানকার 'কার্ণেগী হলে' লেখক সমিতির অধিবেশন হ'তো। তিনি একদিন তাঁর পঞ্চম য়্যাভিনিউর বাড়ীতে আমাকে চা খেতে নিমন্ত্রণ ক'রেছিলেন।

"আমি সবেমাত্র তাঁর ব'সবার ঘরে ঢুকে তাঁর সঙ্গে কথা কইতে স্থরু ক'রেছি, এমন সময় তাঁর একজন চাকর আমাদের জন্য চা ইত্যাদি নিয়ে সেখানে উপস্থিত হ'য়েছিল। মিঃ মেবী তৎক্ষণাৎ আমাকে অতি সহজ ও সরলভাবে জিজ্ঞেস ক'রেছিলেন—'মিঃ শাসমল, আপনার সঙ্গে আমার পোর্টারের পরিচয় ক'রিয়ে দিব কি?' যুক্তরাজ্যের অনেক জায়গায় চাকরকে পোর্টার বলে। আমি সহসা এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপারে একটু অপ্রতিভ হ'লেও মুহূর্ত্তের মধ্যে আপনাকে সাম্‌লে নিয়ে ভদ্রোচিত 'নিশ্চয়ই' বলে, মিঃ মেবীর চাকরের সঙ্গে আলাপ করতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছিলাম। বলা বাহুল্য যে, সে লোকটি তার প্রভুর সমুখেই তাঁর পাশের একখানা চেয়ারে ব'সে প'ড়েছিল। নূতন লোকের সঙ্গে এ সকল দেশে এমন সময় জলবায়ু ইত্যাদির কথাই সচরাচর হ'য়ে থাকে; তার সঙ্গে আমার সেই বিষয়ে গোটা কতক

কথা হবার পর সে যখন ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল তখন মিঃ মেবী হাসতে হাসতে আমাকে বলেছিলেন, 'মিঃ শাসমল, আমার ব্যবহারে বোধ হয় আপনি একটু আশ্চর্য্যান্বিত হয়েছেন। তা হবারই কথা, কারণ আমি শুনেছি আপনি যে দেশ থেকে আসছেন, সে দেশে মানুষের কাজের ভালমন্দ অনুসারেই মানুষকে ভাল কিম্বা মন্দ বলা হয়। এমন কি, আপনাদের দেশে না কি যে এক পুরুষ মেথরের কাজ করে, তার বংশের আর কেউ কখনো ব্রাহ্মণ হতে পারে না, আমাদের এ দেশে কিন্তু আমরা সকলে সকল কাজকেই আনন্দদায়ক এবং গৌরবের জিনিষ বলে মনে করে থাকি। এ দেশে আজ যে মুচির কাজ করছে, সে ভাল লোক হলে কাল সে এ দেশের প্রেসিডেণ্ট হতে পারে। আপনি বোধ হয় এব্রাহাম লিন্‌কলনের জীবনচরিত পড়েছেন। আমি আপনাকে জোর করে একথা বলতে পারি, আমার পোর্টারের মত একজন সৎলোক কোন দেশেই সচরাচর খুঁজে পাওয়া যায় না; সুতরাং আপনার সঙ্গে কেন, পৃথিবীর যে কোনও সম্রাট বা সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে তার পরিচিত হবার অধিকার আছে।'

"দু'লক্ষ বই পড়লে আমার যে জ্ঞান হতো না আজ এই সামান্য ঘটনায় আমার সেই জ্ঞান হয়েছিল, আমি মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলাম আমরা এতদিন ধরে কেবল কাগজেই মরে এসেছি এবং কলমেই কেঁদেছি কিন্তু প্রকৃত 'ডেমক্রেসী'র প্রতি আমাদের কারু যে হৃদয়ের খুব অনুরাগ আছে, এমন মনে হয় না। আমরা এখনও বড় বড় জায়গায় লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিয়ে এসে যখন নিজের বাড়ীতে নিজের চাকরের মাথায় টেড়ি, বুকে ঘড়ি ও হাতে ছড়ি দেখতে পাই, তখনই আমরা গভীর ঘৃণার সঙ্গে তার চওড়া কাছাটা এবং ছেঁড়া জুতো জোড়াটার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি। আমাদের অনেকের বিশ্বাস আছে, বই পড়ে ডেমোক্র্যাট হওয়া যায়। আমাদের সে বিশ্বাসকে আজ এই জাতি গঠনের দিনে জন্মজন্মান্তরের জন্য বিদায় দিতে হবে। আমরা যখন আমাদিগকেই কোন কালে ভাল করে

বুঝতে পারলাম না, তখন আমরা আমাদেরই লেখা পড়ে কি করে যে মানুষ হবো তা আমার সাধ্যসাধনা ও জ্ঞানবুদ্ধির অতীত। আমরা যদি আমাদের ভিতর ও বাহিরের প্রকৃতির মধ্যে আমাদিগকে একেবারে দীন হীন কাঙ্গালের মত হারিয়ে ফেলতে পারি, তবেই সে বিসর্জ্জনের ভিতর দিয়ে এম্নি করে এক বিরাট প্রতিষ্ঠার সূচনা হবে যে, তার কাছে যুগযুগান্তরের অন্ধবিশ্বাস ও দুর্ব্বলতা চিরদিনের জন্য কোথায় পালিয়ে যাবে।

"আমি কোন দিনই ভাল করে বুঝতে পারিনি, আমরা মেথর-মেথরানীদের এত ঘৃণা করি কেন, তাদের চোখ নাকের উপর দিয়ে ময়লার রস গড়িয়ে পড়ে সত্য, কিন্তু সে জন্য তো তাদের প্রতি আমাদের ভক্তিশ্রদ্ধা বৃদ্ধি হওয়াই উচিত; কারণ আমরা তো কই তাদের মত তেমনি ক'রে উদাসীন হয়ে কখন কোন ভাল কাজেও আমাদিগকে বিলিয়ে দিতে পারি না। আপন আপন কাজের মধ্যে যে শ্রেণীর লোক আপনাদিগকে এমনি করে ভালমন্দ-অবিচারে হারিয়ে ফেলতে পারে, তারা নিশ্চয়ই ঘৃণা বা অবহেলার পাত্র নয়—তারা অন্যপক্ষে সামাজিক ব্যক্তি মাত্রেরই আদর্শস্থানীয়। গত বৎসর একদিন আমি কাঁথির মেথরানীগণকে একটা সভায় 'মা-বোন' বলে সম্বোধন করতে পেরেছিলাম বলে, আমি যে হৃদয়ে কত গভীর আনন্দ উপভোগ করেছিলাম তা বলে বুঝাতে পারবো না।"—স্রোতের তৃণ, ২য় সং, ১৫৫—১৫৭ পৃঃ

মানুষের জীবনে সঙ্গীত ও সুরের প্রভাব যে কতখানি সে সম্বন্ধেও দেশপ্রাণ লিখে গেছেন, "গান গাওয়া যে মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তার প্রমাণ আমরা জলে স্থলে বনে জঙ্গলে শ্মশানে মশানে বহুকাল থেকে দেখে আসছি। আমি আজকালকার কুটিলপ্রাণ, জটিল ও ভেকধারী সুসভ্য মানব সম্প্রদায়ের কথা বলছি না—তাঁরা নানা কারণে অস্বাভাবিক হয়ে পড়েছেন; আমি বলছি আমাদের সনাতন সরলপ্রাণ তরলমতি অ-সুসভ্য জনসাধারণের কথা, যারা সংখ্যায়

অসংখ্য, ভাগ্যে অভাগা কিন্তু প্রাণে সত্যই ভগবানের শ্রেষ্ঠ প্রাণী। তাদের স্বভাবধর্ম্ম গান গাওয়া বই কি। ওই যে নৌকার মাঝি ও হাতীর মাহুত, গাড়ীর গাড়োয়ান ও বনের সাঁওতাল, মাঠের মজুর ও শ্মশানের চণ্ডাল—ওরা যে মনের সুখে অবাধে গান গায় বলে বেঁচে আছে, যে যার কাজ প্রাণ ভরে করতে পারে। ওদের আগমনের সময় আঁতুড় ঘরে ওদের ছেলেমেয়েরা উঁচু গলায় গান গেয়ে ওদের অভ্যর্থনা করে, আবার ওদের নির্গমনের দিনে মাঠের পথে ওদের আত্মীয়কুটুম্ব ও পাড়াপ্রতিবেশীরা হরিসংকীর্ত্তনে ওদের বিদায় দেয়। ওরা জীবনপ্রভাতে সরস্বতীর বন্দনায় প্রথম গান গাইতে শিখে, জীবনমধ্যাহ্নে ধানের ক্ষেতে বান ডাকলে ওদের সে গান স্তরে স্তরে স্তবকে জমাট বাঁধে এবং শেষে জীবনসন্ধ্যায় সকল কর্ম্মের অবসানে ঠাকুরঘরের সন্ধ্যা-আরতিতে শঙ্খঘণ্টা ও ধূপ-ধুনার মধ্যে চিরদিনের জন্য সে গান বিলীন হয়ে যায়। ভাঙ্গা-ফাটা ছোট বড় রংবেরংয়ের জপমালার সুতার মত, জগতের যাবতীয় জিনিষের ভিতর দিয়ে সকল জীব ও সকল জীবনকে সার্থক করে প্রতিনিয়তই সকল গানের আদ্যগান ওঁকার-ধ্বনি উঠছে; আমাদের হৃদয় নেই বলে আমরা অনুভব করিও কম।"

যথার্থ স্বাধীনতা কাকে বলে সে নিয়ে দেশপ্রাণ অনেক জায়গায় অনেক বার লিখে গেছেন। তিনি বার-বার বলেছেন, "স্বাধীনতা অন্তরের বস্তু এবং বাহ্যিক অবস্থার উপরে মানুষের সত্যিকার স্বাধীনতা কোনদিন নির্ভর করে না। যে অন্তরে স্বাধীন তাকে কোন ব্যক্তি বা বস্তু কোনদিন পরাধীন করতে পারে না; আর যে অন্তরে স্বাধীন হ'তে পারেনি স্বাধীনতার সবগুলি অধিকার তাকে দিলেও সে স্বাধীনতা লাভ করতে পারবে না।

"আমি মনে করি কোনও জাতিকে অন্য কোনও জাতি মেরে কেটে হটিয়ে দিয়ে তাদের জমিজায়গাসকল জোর ক'রে দখল ক'রে নিলেও, সে জাতি স্বাধীন থাকতে পারে এবং আজকালকার দিনে

যারা ধ্বংসনীতির পৃষ্ঠপোষকরূপে বড় বড় স্বাধীন জাতি ব'লে বড়াই ক'রে থাকেন, তাঁরা হয়তঃ সবার চাইতে বেশী পরাধীন। কারণ স্বাধীনতা অন্তরের বস্তু; ইতিহাস, দর্শন কিম্বা বিজ্ঞান প'ড়ে কিম্বা বৃহল্লাঙ্গুলগণের আস্ফালনে তার অনুভূতি সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। যুগ-যুগান্তরের সাধনার দ্বারা তাকে শুদ্ধ, শান্ত ও পবিত্রভাবে দেবতার রূপে হৃদয়ে ধারণ করতে হয়। আমরা আজকাল সচরাচর যে স্বাধীনতার নামে ক্ষেপে উঠি এবং লাখে লাখে কোটিতে কোটিতে যার নামে জীবন বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হই, তাকে স্বাধীনতার ব্যভিচার বলে এবং সেই জন্যই এত দেশ ও এত জাতি সেই স্বাধীনতা লাভ করা সত্ত্বেও, এ যুগ এমন ভীষণ বৈষম্য ও পার্থক্যের যুগে পরিণত হ'য়েছে। আজকাল যারা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্য ব্যস্ত এবং এমন কি, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের জন্যও বদ্ধপরিকর, তাঁরা সকলেই শুধু খণ্ড বা অংশকে পূর্ণ বা অখণ্ড ব'লে উপাসনা ক'রে আসছেন।

"আমরা স্বাধীনতা মানে কি, এখনো ভাল করে বুঝতে পারিনি। স্বাধীনতা মোটেই বাহিরের জিনিষ নয়, অথচ আমরা কেউ তাকে বাহিরের জিনিষ ছাড়া অন্য কোন আকারে কোনদিন উপলব্ধি ক'রেছি বলে মনে হয় না; আমরা ভিতরে বিলাসিতা, পরশ্রীকাতরতা ও স্বার্থপরতার দাস হয়ে, বাহিরে আমরা নির্ভীক, নিরহংকার, নিঃস্বার্থ, পরসেবাব্রতধারী সন্ন্যাসী ব'লে উচ্চ কণ্ঠে চিৎকার ক'রে থাকি। আমরা ভিতরে কত অকথ্য ও অবর্ণনীয় কুকার্য্যে জীবনপাত ক'রে, বাহিরে বলি যে, আমাদের মত সুসভ্য ও সুশিক্ষিত মানুষ এর পূর্ব্বে কখনো ছিল না এবং পরেও কখনো হবে না। স্বাধীনতাকে কিন্তু আজ আমাদের ভিতর বা অন্তরের জিনিষ বলে সোৎসাহে বরণ করে নিতে হ'বে। যেমন ঈশ্বরবিশ্বাসী মানব বিশ্বকে হৃদয়ের মধ্যে নানা ভাবে ও নানা রসে বরণ ক'রে নেয়, আমরা স্বাধীনতাকে আজ সেই ভাব ও সেই রসে হৃদয়ে বরণ ক'রে নেবো।

"প্রকৃত পক্ষে, যে স্বাধীনতা অন্যের স্বাধীনতাকে ঠিক নিজের স্বাধীনতার মতই সমানভাবে সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে শেখেনি, সে স্বাধীনতাকে স্বাধীনতা বলেই স্বীকার করা কোন মতে উচিত নয়। আবার, যে পরাধীনতা অন্যের পরাধীনতাকে ঠিক নিজের অন্তর দিয়ে নিজের পরাধীনতার মত হৃদয়ে অনুভব ক'রতে পারে না, সেই পরাধীনতাকে পরাধীনতা বলে ধ'রে নিলে ভুল করা হবে। কারণ স্বাধীনতার মতই পরাধীনতাও অন্তরের বস্তু। আমি হৃদয়ের হৃদয়ে পরাজয় স্বীকার না ক'রলে যেমন আমি পরাধীন নই, তেমনি অন্তরের অন্তরে আমি স্বাধীন হয়েছি, আমার এই অনুভূতি না এলে আমি স্বাধীন হ'তে পারি না।"

দেশপ্রাণস্মৃতি

শ্রীমন্মথনাথ দাস, এম্. এ.

মহাকাব্যের মোটা রেখার আদর্শ, বিশালায়তন একমুখী চরিত্র বর্ত্তমান সমাজে একান্তই বিরল। আমরা সকলেই পলকাটা হীরক খণ্ডের বিচিত্রমুখী দীপ্তির অধিকারী। আমরা গবেষণাপত্রে কুসংস্কারের মুণ্ডপাত করে' বিজ্ঞানের জয় ঘোষণা করি, বাড়ীতে পুত্রকন্যার কল্যাণে ঘটা করে' বগলামুখী কবচ ধারণ করি ; সভায় সত্য কথার মহত্ত্ব বিষয়ে ভাষণ দিই এবং বিষয়সম্পত্তি রক্ষাব প্রয়োজনে আদালতে সত্যকথা বলবার শপথ নিয়েও মিথ্যা বিবৃতি দিই। এই হীরকদীপ্তোজ্জ্বল সমাজে বিধাতার বিচিত্র বৈভবের সাক্ষ্য দিতে এখনও দু-এক ব্যক্তি স্ফটিকখণ্ডের মত স্ব-স্ব স্বাতন্ত্র্যে বিশিষ্ট হয়ে দেখা দেন। তাঁদের অন্তরে রহস্যঘন কিছুই থাকে না, তাঁরা প্রথম আবির্ভাবেই নিজদিগকে সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত করেন। তাঁদিগকে আমরা সমীহ করি, কিন্তু স্বীকৃতি দিই না, স্মরণ করি, কিন্তু অনুসরণ করি না। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল এমনি বিরল মহাকাব্যিক জ্যোতির্বলয়মণ্ডিত এক বিশিষ্ট চরিত্র।

পরাধীন জন্মভূমি ভারতবর্ষের মর্ম্মবেদনা দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথকে গৃহ-ছাড়া করেছিল। কংগ্রেসের অহিংসার আদর্শকে তিনি জীবনে আক্ষরিকভাবেই গ্রহণ করেছিলেন। তাই কখনও কোন প্রয়োজনেই হিংসার সঙ্গে কংগ্রেসের কোন প্রকার আপোষ তাঁর মতে ছিল আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। তাঁর নির্ভীকতার দৃষ্টান্ত খুঁজে দেখার প্রয়োজন নাই। তাঁর জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ নির্ভীকতার উজ্জ্বল উদাহরণ।

আগেই বলেছি, বীরেন্দ্রনাথ মহাকাব্যিক চরিত্র, তাঁর আত্ম-মর্য্যাদাবোধ যেমন দৃপ্ত, বিনয়ও তেমনি মহনীয়। তিনি স্বীকার

করেছেন, ভারতবর্ষে যুবরাজের আগমনকে কেন্দ্র করে তিনি কংগ্রেস সম্পাদকরূপে বাংলায় যে হরতালের ডাক দিয়েছিলেন তার সাফল্যের পিছনে ছিল প্রচার বিভাগের সম্পাদক সুভাষচন্দ্র বসু মশায়ের যোগ্য ভূমিকা। দেশপ্রাণের ভক্তিভাবনায় দেশজননী ও গর্ভধারিণী এক হয়ে গিয়েছিল। তাঁর ঈশ্বরবিশ্বাসও ছিল অতীব গভীর। তিনি নিজেকে তাঁরই ইচ্ছাস্রোতে ভাসমান 'স্রোতের তৃণ' রূপে গণ্য করেছিলেন।

বীরেন্দ্রনাথ স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেসনেতারূপে জাতীয় সংগ্রামের পুরোভাগে এলেও মানবমুক্তি ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব তাঁর ভাবনার শেষ কথা ছিল। তিনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে পাদরী সাহেবকে বলেছিলেন,—"পৃথিবীর জাতিসমূহ পরস্পর একযোগে এক সময়ে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ না হলে সমগ্র পৃথিবী ও মনুষ্যজাতির ভবিষ্যৎ ঘোর অন্ধকারে পরিপূর্ণ।" এই বিশ্বভ্রাতৃত্বের স্বপ্ন বয়ে বেড়ানোর ব্যাপারে বঙ্গদেশের বীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের আত্মীয়তা সম্ভবতঃ দুর্লক্ষ্য নয়। সেই একই উগ্র স্বাতন্ত্র্যবোধ, আদর্শের এক-মুখিনতা ও আপোষহীন অনমনীয়তা, শিক্ষার দ্বারা জাতীয় চরিত্রের নিষ্কৃতি অর্থাৎ কলুষ-অপনোদনের স্বপ্ন উভয় চরিত্রে প্রোজ্জ্বলভাবে পরিদৃশ্যমান। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষপূর্ত্তি উদ্‌যাপনের উপলক্ষ্যে আজ আমাদের দেশবাসীর নিকট প্রশ্ন: আমরা তাঁকে অন্তরে কতখানি গ্রহণ করতে পেরেছি এবং তাঁর গৌরবময় উত্তরাধিকারকে কতখানি মর্য্যাদা দিয়েছি।